উত্তরসূরী

NO 1 C/ UNIVERS

পঞ্চম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ কার্তিক-পৌষ ॥ ১৩৬৪

ছবি

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নবদ্বীপের ঘাট

প্রবন্ধ

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী : স্মৃতি বিচিত্রা। ১। বিনয় ঘোষ : নবজাগরণ ও হিউম্যানিজম্। ৪। রাজেশ্বর মিত্র : শ্রুতি প্রসঙ্গ। ২৩। অশোকানন্দ দাশ : বাংলা গদ্যরচনায় প্রবর্তন। ৪৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য : ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা। ৫৮। অচিন্ত্যেশ ঘোষ : দেবরহস্য (১)।

কবিতাবলী

জীবনানন্দ দাশ। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। বটকৃষ্ণ দাস। শোভন সোম। অরবিন্দ গুহ। রাম বসু। কৃষ্ণ ধর। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বটকৃষ্ণ দে। আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন। মানস রায়চৌধুরী। (৩১-৪৪) সঞ্জয় ভট্টাচার্য। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। জ্যোৎস্না ভড়। সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। কপিভূষণ আচার্য। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। সুশীল গুপ্ত। আলোক সরকার। চিত্ত ঘোষ। প্রকৃতি ভট্টাচার্য। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রতিমা পাল। সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। শামসুর রহমান। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। বংশীধারী দাস। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সুরজিৎ দাশগুপ্ত (৭২-৮৮)

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ

প্রফুল্লকুমার দাশ : রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম
আশ্‌রাফ্ সিদ্দিকী : ছেলে ভুলানো ছড়া (৯২-৯৫)

আলোচনা

নবেন্দু চক্রবর্তী : কবিতা প্রসঙ্গে (১০৯-১১৬)

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ক্তি, রাজা অপূর্বকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা ২

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

P29222

শিল্প ব্যবসায়ে বাঙালী • • •

ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের প্রথমভাগে বাঙালীরা ইংরেজীনবিশ হয়ে শিক্ষা সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিল। ভারতব্যাপী তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয়নি। এমনকি অন্ততম প্রধান দেশনায়ক বাঙালীকে অভিনন্দিত করেছিলেন এই বলে, বাঙালী আজ যা চিন্তা করে, সারা ভারত তা কাল চিন্তা করে।...

শিল্প জাগরণের প্রথম দিকে তাই বাঙালীরা চিন্তার খোরাক যোগালেও তাদের মানসিকতা অধ্যাপনায়, বিজ্ঞানের চর্চায় নিয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন রাষ্ট্রগঠনের গুরুদায়িত্ব এলো তখন বাঙালী নিশ্চেষ্ট থাকেনি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং আরো চিন্তাশীল মনীষীরা বাঙালীকে শিল্পপ্রেরণায় উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন। এমনি করে গড়ে উঠেছে একটি একটি ক'রে বাঙালীর নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান।...

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট এ্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ এর শতকরা একশত ভাগ মূলধন বাঙালীর—এর কর্মচারীদের শতকরা ৯৭ ভাগ বাঙালী, এর আদর্শের পেছনেও রয়েছে বাঙালীর বহুযুগ-সঞ্চিত চিন্তাধারা। আদর্শ ও অনুকূল পরিবেশে, শিক্ষা ও গঠনমূলক স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় কর্মীরা বাঙালীর ও বৃহৎ ভারতের পুনর্গঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন...

আমাদের তৈরী রং প্রায় সমস্ত রেলপথগুলি, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন, পোর্ট কমিশনার্স, কলিকাতা কর্পোরেশন, সিন্দ্রী সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্, আলীপুর মিন্ট ও অন্যান্য বহু সরকারী, আধা-সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে সন্তোষজনকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট এ্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ

॥ কলিকাতা ॥

NU

উত্তরসূরী

পঞ্চম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ মাঘ-চৈত্র ॥ ১৩৬৪

প্রবন্ধ

বুদ্ধদেব বসু : ভাষা কবিতা ও মনুষ্যত্ব। ১। সুধাকর চট্টোপাধ্যায় : প্রাগাধুনিক ভারত সংস্কৃতিতে বাংলার ভূমিকা। ২৮। জাতীয় শিক্ষা মাতৃভাষা ও রবীন্দ্রনাথ। ৪০ ভাষা কমিশনের মূল অর্থ ও তার প্রতিক্রিয়া। ৪৩। সি, রাজাগোপালাচারী : Hindi should not be imposed। ৪৯।

কবিতাবলী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় রাধারমণ প্রামাণিক। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। সামসুল হক। সন্তোষ গাঙ্গাপাধ্যায়। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলেশ চক্রবর্তী। উৎপলকুমার বসু। সুরজিৎ কুমার দাশগুপ্ত। পরিমল ঘোষ। প্রণব মিত্র। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। জ্যোৎস্না ভড়। দেবব্রত চৌধুরী। যশোদাজীবন ভট্টাচার্য (৫৭-৭০)

সমালোচনা সাহিত্য

চিঠিপত্র : ষষ্ঠ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দেবেশ রায়। রবীন্দ্রমানস : অরবিন্দ পোদ্দার। রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় : শচীন সেন। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ : অমল হোম। কার্তিক লাহিড়ী (৭১-৭৭)

বিদেশী কবিতা

হুগো ফন্ হফমানষ্টাল : সুরজিৎ দাশগুপ্ত ॥
হুয়ান র‍্যামন হিমেনেথ : ফখরুজ্জমান চৌধুরী (৭৯-৮০)

আলোচনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরবিন্দ পোদ্দার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার।

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬জি রাজা অপূর্বকৃষ্ণ লেন। কলকাতা ২

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

From the time, the first wheel went round, human progress has depended upon the development of power.

In this century power means Electricity. Coal, Oil, Water, and now Nuclear energy is converted into Electricity for the benefit of mankind. The peaceful uses of power have no limit. Every moment, someone somewhere is putting on a Switch to use the power of Electricity. For the last thirty-five years we have contributed our humble efforts towards that moment.

●

The Shillong Hydro-electric Limited.

170 03

উত্তরসূরী

পঞ্চম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ বৈশাখ-আষাঢ় ॥ ১৩৬৫

ছবি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ স্কেচ : শমীন্দ্রনাথ। ইন্দিরা দেবী

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নস্কৌ সহরে প্রদত্ত ভাষণ ॥ কানাই সামন্ত : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।৫। রাজ্যেশ্বর মিত্র : সঙ্গীত সাহিত্যে শার্ঙ্গদেব । ২১ কার্তিক লাহিড়ী বুদ্ধদেব বসুর কাব্য বিচার ৪২ আঁদ্রে জিদ্ সাহিত্যে প্রভাব ।

কবিতাবলী

অমিয় চক্রবর্তী। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য। দিলীপ কুমার সেন। শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। সুশান্ত ঘোষ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। সুনীলচন্দ্র সরকার। প্রকৃতি ভট্টাচার্য। রাম বসু। নবেন্দু চক্রবর্তী। বটকৃষ্ণ দাস। অরুণ ভট্টাচার্য (২৮-৪১)

বিদেশী কবিতা

ফেদেরিকো লোর্কা। রাইনর মারিয়া রিল্‌কে : সুরজিৎকুমার দাসগুপ্ত। ৬৮।

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলার সঙ্গীতে তানসেনের প্রভাব। ৭০।

স্বরলিপি

রবীন্দ্র-সঙ্গীত স্বরলিপি (তোরা যে যা বলিস্) : প্রফুল্ল দাশ

আলোচনা

তপন কুমার সেন : একাডেমিক আর্ট বনাম মডার্ণ আর্ট

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬জি, রাজা অপূর্বকৃষ্ণ লেন। কলকাতা ২

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে

সন্ন্যাস নিয়ে প্রেমাবেশে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন তখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে তাঁর ভোজনলীলার একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বিরচিত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

সম্মত-পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ ভরি ধরি॥
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ লকলকি।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি॥

(মধ্যলীলা)

খুব ঘন জ্বালের দুধ, অথবা দুধের পিঠে এই ছিল তৎকালীন বাঙালীর শ্রেষ্ঠ খাবার। আর এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ খাবার হোল

রসোমালাই

কে, সি, দাস প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা

আবিষ্কারক : রসোমালাই

উত্তরসূরী 4 No

পঞ্চম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ শ্রাবণ-আশ্বিন ॥ ১৩৬৫

প্রবন্ধ

শিবনারায়ণ রায় : সমকালীন বাঙালী কবিদের প্রতি। ১।

অরুণ ভট্টাচার্য : সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র কাব্যাদর্শ। ৯।

কবিতাবলী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরিমল চক্রবর্তী। শোভন সোম। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। সুশীল গুপ্ত। অনিরুদ্ধ কর। পূর্ণেন্দু বিকাশ ভট্টাচার্য। নবেন্দু চক্রবর্তী। প্রকৃতি ভট্টাচার্য। সুরজিৎ দাশগুপ্ত। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। অর্ণব সেন। অরুণ ভট্টাচার্য। আলোক সরকার। (২৭-৫০)।

আলোচনা

জেমস জয়সের পত্রাবলী : কমলেশ চক্রবর্তী। ৫১।

বিদেশী কবিতা

মনীশ ঘটক : নোগুচী ॥ ফখরুজ্জামান চৌধুরী : জ্যাঁ আর্থুর র‍্যাঁবো ॥ আবদুস্ সাত্তার : মা' রুফ আর্-রাসাফী

সমালোচনা সাহিত্য

বক্তব্য : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সুরজিৎ দাশগুপ্ত ॥ জনরব : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃণাল গুপ্ত ॥ বাংলা নাটক : দেবকুমার বসু। জয়ন্ত গোস্বামী ॥ ধূলিমুঠি সোনা : কপিভূষণ আচার্য। আষাঢ়ে শ্রাবণে : মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মনঝাউ : বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুলপি ড়ি : শচীন দত্ত। আজ চোখ মেলে : সুকুমার রায়। সমুদ্র শর্বরী : রঞ্জিত সিংহ। তিমির কান্না : শংকরলাল রায়। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ॥ আকাশ মাটি : শান্তি লাহিড়ী। অরুণ ভট্টাচার্য।

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ

কবিতা মেলা : নবেন্দু চক্রবর্তী।

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬জি, রাজা অপূর্বকৃষ্ণ লেন। কলিকাতা ১

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

The World's Leading Bicycles and Components

NOW MADE IN INDIA

RALEIGH ROBIN HOOD RUDGE

HUMBER SUN UNION PRODUCTS WITTKOP SADDLES

by

SEN-RALEIGH

Industries of India Limited

Calcutta

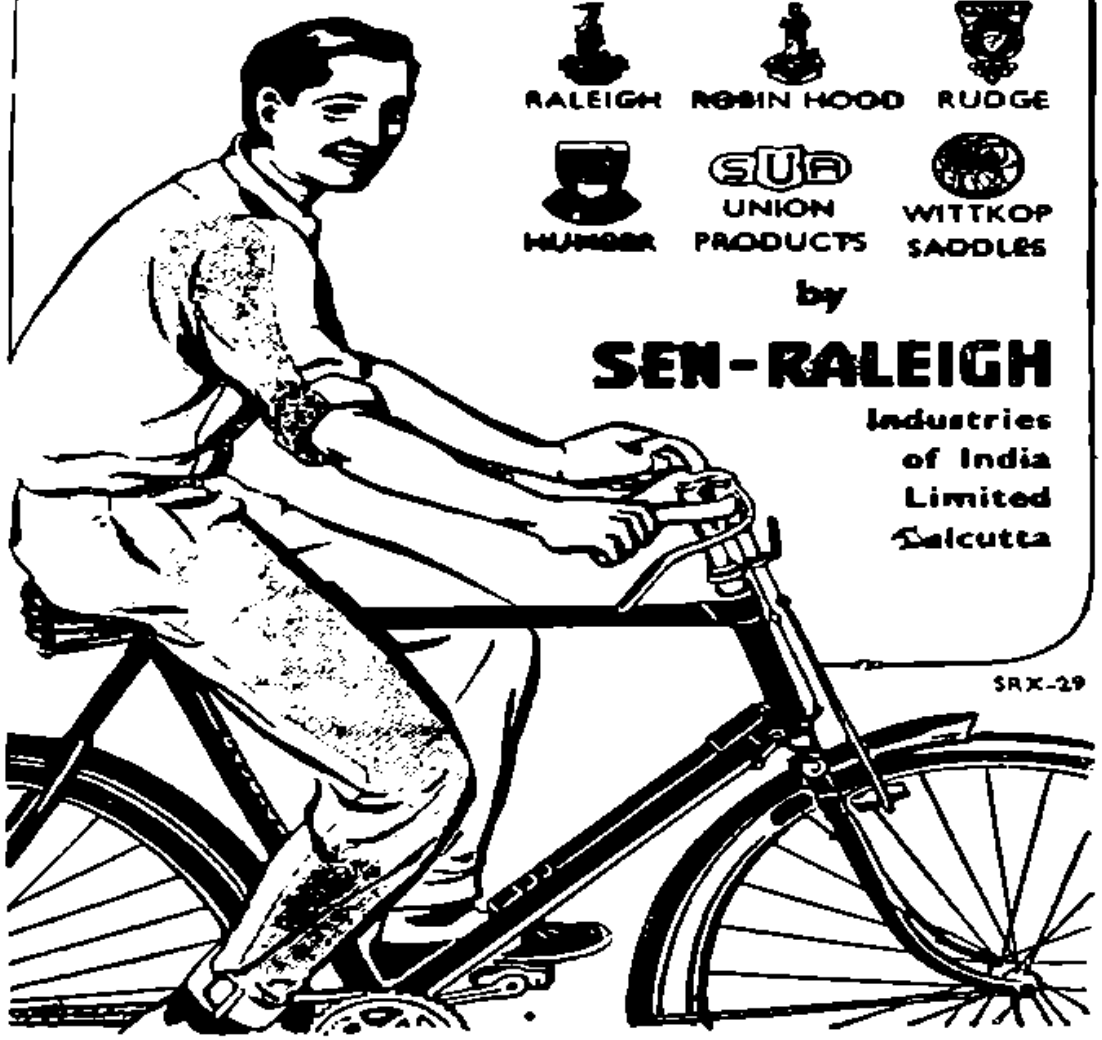

SRX-29

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বাংলার লেখক

বাঙালীর আত্মোপলব্ধির প্রধান উপায় সাহিত্য, তাহা ছাড়া যে বাঙালী জাতি ও বাংলার সংস্কৃতি লইয়া আমাদের গৌরব প্রীতি ও বেদনা তাহা অনেকাংশে বাঙালী সাহিত্যিকদেরই সৃষ্টি। ইঁহাদের অনেকের সৃষ্টি আজ অমনোযোগের প্রদোষচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে—লেখক সেইসব সাহিত্য-কীর্তির প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। জাতির জীবনের ইতিহাস আর মনের ইতিহাস পরস্পরের পরিপূরক বলা যায়। বাংলার মনীষার প্রতিনিধিস্থানীয় এই কয়জনের মনোজীবনী বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত—শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সচিত্র ॥ চার টাকা

●

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

এই গ্রন্থে লেখক বাংলা সাহিত্যের নরনারীর চিত্র রচনা করিয়াছেন। বাঙালীর শিল্পসৃষ্টির আয়তন সামান্য নয়। হাজার বছরের পুরাতন বৌদ্ধ গান ও দোঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃতি বড় কম দিনের নহে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বাঙালী লেখকগণ যেসব নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা অগণিত। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে শুরু করিয়া আধুনিকতম সাহিত্যিকের গল্প উপন্যাস পর্যন্ত কত বিচিত্র চরিত্রেরই-না সৃষ্টি হইয়াছে।

বাংলা দেশের সত্যকার ইতিহাস যিনি লিখিতে চাহিবেন তাঁহাকে ইঁহাদের জীবনচরিত লিখিতে হইবে। বাস্তব নরনারী কেবলমাত্র সংবাদ দিতে পারে, সত্যের সোনার কাঠি এই ভাবৈকরূপ নরনারীর আয়ত্তে।

মূল্য ২·৫০ টাকা। বোর্ড ৩·৫০ টাকা

বিশ্বভারতী

বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বিদ্যা

বাঙালীর গর্ব ও গৌরব

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে
বিরচিত যুগমানব বিদ্যাসাগরের তথ্য-বহুল ও
বহু-চিত্র সম্বলিত জীবনালেখ্য

॥ মণি বাগচির ॥

বি দ্যা সা গ র

জীবনী-সাহিত্যে এক মহৎ ও বৃহৎ সৃষ্টি

॥ দাম সাত টাকা ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কয়ার
কলিকাতা-১২

বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বিদ্যা

বই

দেশী বিদেশী
সাহিত্য বিজ্ঞান
কাব্য দর্শন
চিত্র চিত্রকলা
সম্পর্কীয় যাবতীয়
বই
বিদ্যোদয়ে সুলভ

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৯

ফোন ৩৯ • ৩১৫৭

সাহিত্যমেলা

১৯৪৭-৪২ স্বাধীনতা-উত্তর এই পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ ও অনুলিখিত ভাষণগুলি সংকলিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সম্পাদনা করেছেন কিতীশ রায়। দাম ৫·০০ টাকা ॥

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

বুদ্ধদেব বসু

চিন্তার সঙ্গে আবেগের দুর্লভ সংমিশ্রণ বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধকে এক অনন্য মর্যাদা দান করেছে। বিগত দশকে বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র বিষয়ের উপর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন করা হয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি'তে। দাম ২·৫০ টাকা ॥

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

হুমায়ুন কবির

শিক্ষা এমনই একটি সমস্যা প্রত্যেক সভ্য জাতিকেই যা নিয়ে ভাবতে হয়। ভারতবর্ষে আজ এ-সমস্যা ক্রমশ অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনার অভাব অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপকরূপে স্পষ্ট। সেদিক থেকে হুমায়ুন কবিরের এই গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। দাম ২·০০ টাকা ॥

অন্যান্য বই ●

অশোক মিত্রের **ভারতের চিত্রকলা** ১৫·০০ ॥ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্রের **পৃথিবীর ইতিহাস** (১ম খণ্ড) ৮·০০ ॥ প্রমথনাথ বিশীর **বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য** ৩·৫০ ॥ নারায়ণ চৌধুরীর **বাংলার সাহিত্য** ৩·০০ ॥

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

বিনয় ঘোষ

তিনখণ্ডে প্রকাশিতব্য

প্রথম খণ্ড ॥ ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালায়' ছয়টি রচনা বিদ্যাসাগরের সুবৃহৎ জীবনচরিতের 'ভূমিকা' রূপে প্রকাশিত হবে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ এ ॥ বিদ্যাসাগর জন্মদিনে ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৮২০-৫০

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সুবিস্তৃত পটভূমিতে রচিত বিদ্যাসাগর জীবনীর 'দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশিত হবে ২৩ জানুয়ারী ১৯৭৮এ। ১৮২০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইতিহাসের ধারায় বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের সূচনা পর্যন্ত এই খণ্ডের আলোচ্য ॥ 'যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর' নামে মাসিকপত্রে আংশিক প্রকাশিত।

তৃতীয় খণ্ড ॥ ১৮৫১-৯১

১৮৫১ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত, অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত, বাংলার সামাজিক নবজাগরণের বিস্তৃত ইতিহাসের পটভূমিতে বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কর্মজীবনের ধারা এই খণ্ডের আলোচ্য ॥ প্রতিখণ্ডেদুষ্প্রাপ্য চিত্র, ঐতিহাসিক দলিলের ফটোস্টাট কপি, প্রতিলিপি প্রভৃতি থাকবে

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ৭৩

যে-বই কোনদিন পুরনো হয় না এবং যত পুরনো হয় তত তার আকর্ষণ ও আবশ্যকতা বাড়ে

বিনয় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

আঠার টাকা

আটশত পৃষ্ঠা, রেক্সিনে বাঁধাই প্রচুর অপ্রকাশিত চিত্র ও দুষ্প্রাপ্য রেখাচিত্রের আর্টপেপার আছে

একখানা বই ঘরে বা পাঠাগারে রাখতে হলে যে-বই নিঃসন্দেহে নির্বাচন করা যায়।

খ্যাতনামা পণ্ডিত ও 'অখ্যাতনামা' অগণিত পাঠক, যে-বই নিয়ে সম্প্রতি সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' সেই বই। নীরস গতানুগতিক ভঙ্গিতে লেখা বাংলার ইতিহাস নয়। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের সঙ্গে অধীত তত্ত্বের সমন্বয়ে রচিত বাঙালীর বিচিত্র জনকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় এ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট। বাংলার গ্রামীণ সমাজ, বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উৎসবপার্বণ, ধ্যানধারণা, ধর্মকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, মঠ-মন্দির-মসজিদ, বাংলার জাতি-উপজাতি গোষ্ঠী-সম্প্রদায় ও প্রসিদ্ধ পরিবারের বিবরণের ভিতর দিয়ে সমগ্র বাঙালী জাতির এক নতুন রূপ ফুটে উঠেছে এই বইয়ে।

পুস্তক প্রকাশক ॥ ৮।১ বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ॥
কলিকাতা ১২

'নাভানা'র বই

গড় শ্রীখণ্ড
অমিয়ভূষণ মজুমদার
আট টাকা

'গড় শ্রীখণ্ড' উত্তরবঙ্গের এক বিস্তৃত অঞ্চলের নাম। 'গড় শ্রীখণ্ড'র মাটির নীচে সোনার খনি নেই—সেখানকার চাষীরা দেহের রক্ত ও মনের রস মিশিয়ে দিয়ে সোনা ফলায়।·· বৃহৎ উপন্যাসের অন্তর্পর্বটি যেন মুসলমির জীবন-জিজ্ঞাসার নির্ভুল জবাব। বিশাল পটভূমিতে বাংলার গণজীবনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও মহৎ উপন্যাস। ৮·· টাকা।

কঙ্কাবতী
বুদ্ধদেব বসু
তিন টাকা

'কঙ্কাবতী' চিরনতুন প্রেমের কাব্য। আবেগের গভীরতায়, অনুভবের সমগ্রতায়, ছন্দ-মিলের সম্মোহনে 'কঙ্কাবতী'র উপভোগ্যতা অফুরন্ত। কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কয়েকটি নতুন কবিতা এবং কবির বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত 'পৃথিবীর পথে'র বিশিষ্ট কবিতাগুলি 'কঙ্কাবতী'র নতুন নাভানা-সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। ৩·· টাকা।

বসন্তপঞ্চম
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
আড়াই টাকা

প্রেমের বিচিত্র লীলার অব্যাপিকা সুমিতা, পুরীর মনোমোহন হোটেলের কমলা দেবী, হেড মিস্ট্রেস অনীতা সেন আর বস্তির মেয়ে বকুল—সকলেই যেন বিভিন্ন মিশ্র রাগের বিমূর্ত মূর্ছনা। বাংলা ছোটোগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যে একজন প্রধান শিল্পী 'বসন্তপঞ্চম'-এর গল্পগুচ্ছ তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ২·৫০ টাকা।

নাভানা

॥ নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশনী বিভাগ ॥
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশিত হ'ল

কালিদাসের মেঘদূত

ভূমিকা, অনুবাদ ও টীকা :
বুদ্ধদেব বসু

আঠারোখানি উৎকৃষ্ট চিত্র সংবলিত। স্বর্ণাঙ্কিত প্রচ্ছদ। মজবুত সুদৃশ্য বোম্বিনে বাঁধাই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। দাম—৫·৫০ টাকা
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

পরশুরাম
আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
পৌরাণিক অভিধান

মৈত্রেয়ী দেবী
ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ

প্রতিভা বসু
মধ্যরাতের তারা (উপন্যাস)

দীপক চৌধুরী
এই গ্রহের ক্রন্দন (উপন্যাস)

প্রাণতোষ ঘটক
রাজায় রাজায় (উপন্যাস)

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের

রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা ৬৲

নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার

৩য় খণ্ড ৬৲ ৪র্থ খণ্ড ৫৲

নাটক ও নাটকীয়ত্ব ২৷৷০

অধ্যাপিকা কল্যাণী কালেকর-এর

ভারতের শিক্ষা

প্রাচীন ও মধ্যযুগ—২৲ বর্তমান যুগ—৩৷৷০

অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী প্রথম কবিতার বই

ভারত সংস্কৃতি—৩৲ ছেঁড়া তাঁবু ১৲

জিজ্ঞাসা ॥ ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা ॥ শাখা কেন্দ্র :—৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

দেবেন্দ্র স্মৃতি সঙ্গীত বিদ্যালয়

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নিয়মনিষ্ঠ চর্চা ব্যতীত কোন গানই যথারীতি শেখা যায় না। সম্প্রতি বাংলাদেশে শিক্ষার্থীসমাজ একথা অনুভব করছেন। আমরা সেই বিরাট ঐতিহ্যকেই যথাসম্ভব রূপ দেবার প্রচেষ্টা করছি।

স্বল্প বেতনে কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যকলা ও তবলা (থিওরেটিক্যাল ও প্রাকটিক্যাল) যত্ন সহকারে শেখানো হয়।

ক্লাশ : প্রতি বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও রবিবার

শিক্ষকমণ্ডলী :

ওস্তাদ নাসির হোসেন খান, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাগ (সঙ্গীতবিশারদ), প্রঃ মদনমোহন দাস (বেতার শিল্পী), শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায়।

খোঁজ করুন : ১৫৯, কাশীনাথ দত্ত রোড, বরানগর, কলকাতা-৩৬

। বিমল চন্দ্র সিংহের।

সা হি ত্য ও সং স্কৃ তি

গ্রন্থে কয়েকটি পাঠযোগ্য প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে :

॥ সংস্কৃতির রূপান্তর ॥ সাহিত্যের মেজাজ ॥ কবিকৃতি ও সমালোচনা ॥ কাব্যের ব্যাকরণ ॥ প্রবন্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ ॥ ক্রান্তি ॥ বাংলায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ধারা ॥ অবনীন্দ্রনাথের ছবি ॥ কবিসঙ্গম ॥ = চার টাকা =

। রাজ্যেশ্বর মিত্রের।

বা ং লা র গী ত কা র

বাংলাদেশের গীতকার কবিদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় এ গ্রন্থ মূল্যবান, এতে রয়েছে :

॥ রামপ্রসাদ ॥ নিধুবাবু ॥ দাশরথী রায় ॥ গোপাল উড়ে ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ অতুলপ্রসাদ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল ॥ রজনীকান্ত সেন ॥ নজরুল ॥ কৃষ্ণধন বন্দ্যো ॥ হিমাংশু কুমার ॥ রাধিকা গোঁসাই ॥ লালচাঁদ বড়াল ॥ গিরিজাশংকর চক্রবর্তী প্রভৃতি ॥ = সাড়ে তিন টাকা =

॥ নূতন প্রকাশিত বই ॥

অনুরূপা দেবীর
রাঙ্গা শাঁখা
। আড়াই টাকা।

নিরুপমা দেবীর
আমার ডায়েরী
। আড়াই টাকা।

অচিন্ত্যেশ ঘোষের
এ কালের চোখে
। তিন টাকা।

সুব্রতেশ ঘোষের
কয়েকটি রঙ
। দু' টাকা।

মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

ভারতের নিত্যসঙ্গী • • •

বার্মা-শেল

উত্তরায়ণ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৪

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ

মধুময় হউক আমাদের জীবন, আনন্দময় হউক শারদীয় দিনগুলি

পূর্ব রেলওয়ে

ERIPA/C

ভারতে সাইকেল-শিল্পের পথপ্রদর্শক

ইণ্ডিয়া সাইকেল

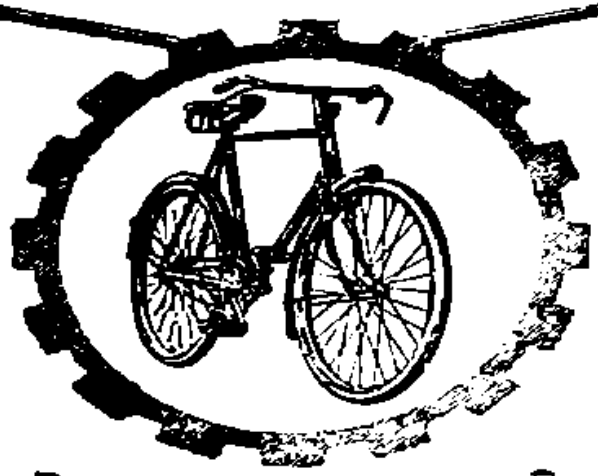

রোডস্টার .. সুপার ডি-লুক্স

সামিট ...

ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড, কলিকাতা-১৮

ক্যালকেমিকোর

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

বিশুদ্ধ অলিভ অয়েল ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈল সংমিশ্রণে এবং ক্যান্থারাইডিস্ সহযোগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। স্নিগ্ধ সুমধুর গন্ধে সুরভিত।

কেশবর্দ্ধনে সহায়ক ও মস্তিষ্ক নিবারক।

• আটল স্বদেশ আমাদের পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

উত্তরেত্তরা কার্তিক-পেঁষ

শারদীয় সম্ভাষণ

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড

আহারের পর
দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট (৩ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার খাদ্যের জন্য উদ্ভূত হবে। পুরাতন মহা-দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী করে সর্দ্দি, কাশি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং বয়সকে কাল ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ১১, গোবিন্দ সাহা রোড, কলিকাতা-৩১

স্বনামধন্য ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

দীপাবলীর সাদর-সম্ভাষণ

গ্রহণ করুন

ন্যাশনাল কারবন কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিঃ,

বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

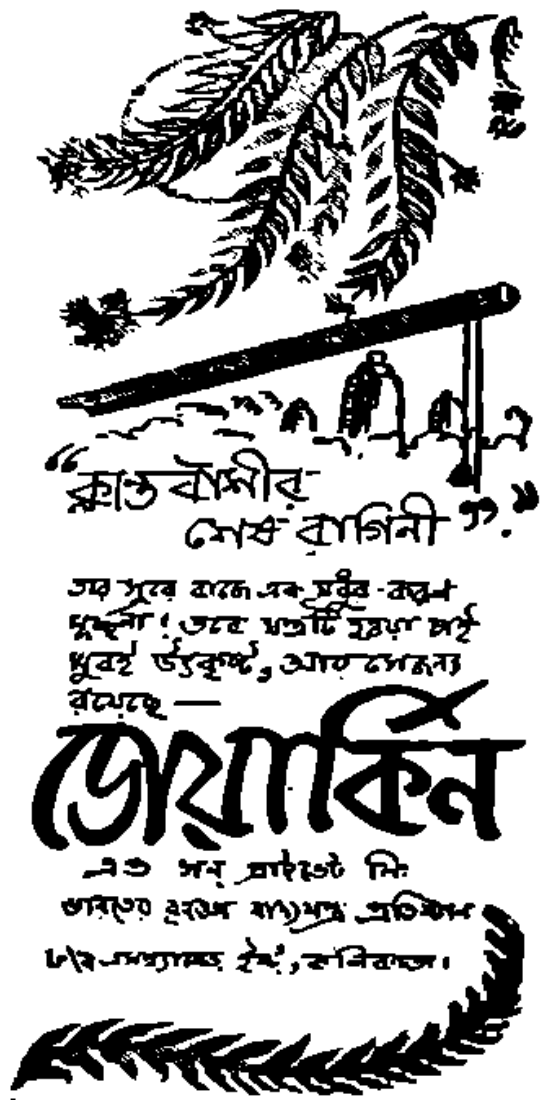
"ক্লান্ত বাঁশীর
শেষ রাগিনী"
তার সুরে রাঙে এক মুকুর-বরণ
ধূম্রলা ! তবে যন্ত্রটি সুরা সই
খুবই উচ্চকৃষ্ট, আর সৌন্দর্য্য
রয়েছে —
ডেয়ার্কিন
এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ
ভারত্তের বৃহত্তম যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠান
৮৯ এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

নিত্য স্নানে ও প্রসাধনে
বাথগেটের
বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল

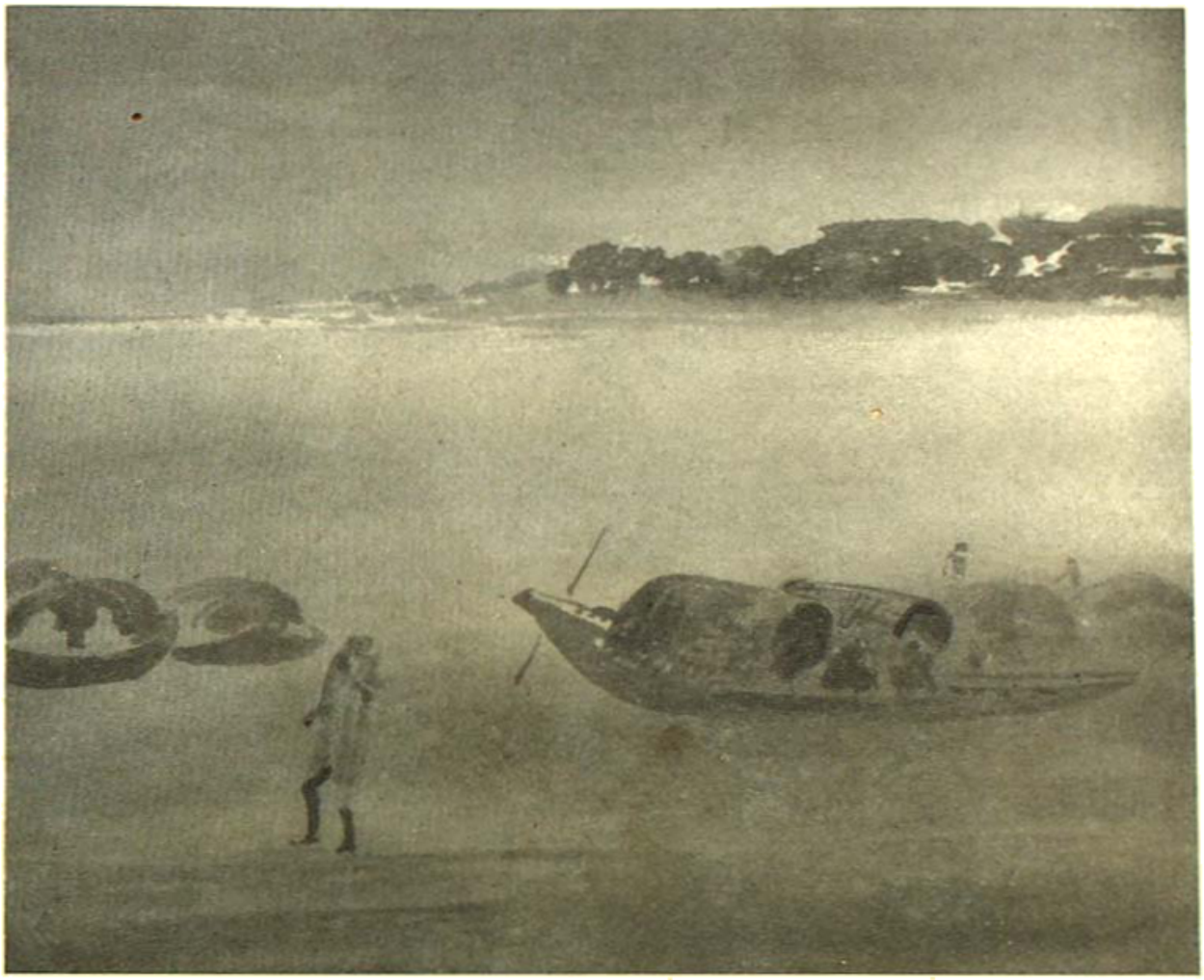

নবদ্বীপের ঘাট

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

উত্তরসূরী

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ॥ কার্তিক-পৌষ ॥ ১৩৬০

স্মৃতি বিচিত্রা

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

নববর্ষে ওঁর কাছে একটা কথা শিখেছি—উপেক্ষা। কথা অর্থে কাজের কথা, ভাবের কথা,—শুধু ভাবা নয়। কোন বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ করায় উনি বল্লেন—জীবনে অনেক জিনিষ উপেক্ষা করতে শেখ, ওসব ছোট জিনিষকে আমি ত আমলই দিইনে। কথাটা আমার মনে লাগল। কোন্ ক্ষণে কি লেগে যায় বলা যায় না। সত্যই ত। কত সময় কত জিনিষ মনে লাগে,—সব মনে করে' রাখতে গেলে কি চলে?—উপেক্ষা কর। কেউ তোমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা কয়নি? উপেক্ষা কর। কেউ তোমার আত্মীয়তার দাবি পূর্ণ করে না?—উপেক্ষা কর। এর সঙ্গে নিজে আর একটা কথা জুড়েছি,—অপেক্ষা। অপেক্ষা কর, এমন যে দুর্দ্দম্য শোক, তাও কালে মন্দীভূত হয়। অপেক্ষা কর, যে পারিবারিক সমস্যা তোমার চেষ্টার অসাধ্য মনে হচ্ছে, কাঁটার মত মনে বিঁধে রয়েছে—কালের চক্র পরিবর্ত্তনে আপনিই সে জটিল সমস্যার সমাধান হবে, সে ব্যথার তেজ কমে আসবে। অপেক্ষা ও উপেক্ষা,—দেখা যাক্ এ বৎসরে এই মন্ত্র কতদূর ফলদায়ক হয়।···

তাই যেন বিশ্বাস করতে পারি, অন্ততঃ আশা করতে পারি যে এই নির্ম্মম রূঢ় বিচ্ছেদের পর কোনো কালে কোথায়ও একটা সান্ত্বনার প্রলেপ ও পুনর্মিলনের শান্তি আছে। যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা, এত নিকট আত্মীয়তা,

কেবলমাত্র দেহক্ষয়ের সঙ্গে সে সুদৃঢ় বন্ধন কি একেবারে ছিন্ন হতে পারে, সে সুমিষ্ট পরিচয় কি অজানার অন্ধকারে চিরকালের মত লুপ্ত হতে পারে? এও কি সম্ভব?—অন্যান্য সাংসারিক নিত্য দুঃখ রোগ, জরা, দারিদ্র্য অনেকরকম মনের অসুখও মনে হয় অধিকাংশ সময় আমাদেরই অজ্ঞান ও পাপের ফল—কালে জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ক্রমে তিরোহিত হতে পারে। যদিও ধীরে, অতি ধীরে। কিন্তু মৃত্যুরূপ ভগবানের যে মার, এর আর কোন প্রতিকার কোন উপায় দেখা যায় না। অথচ এলোকে চিরজীবনও বর্ত্তমান অবস্থায় বাঞ্ছনীয় মনে হয় না। অগত্যা পারলৌকিক অসারতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবেই হবে। অদৃষ্ট, অচিন্ত্য, দুর্জ্ঞেয় এমন কোন রহস্য আছে, যার উপর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার ভার চাপাতে না পারলে দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে জীবন দুর্ব্বহ। আর ঐ অদম্য বাঁচবার ইচ্ছা, অত শত না ভেবে চিন্তেও কেবল তারই জোরে জীবনযাত্রা চলছে, চলতেই হবে, এই ত সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা মনে হয়,—সুস্থতায় অসুস্থতায়, রোগে, ভোগে, যেন তেন প্রকারেণ। জীবনরক্ষা হোক না হোক, সৃষ্টিরক্ষা হওয়া চাইই, তারই জন্য এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, এত অকাট্য নিয়ম। কবি বলেন—'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা'। কিন্তু অন্ধকার যখন ছেয়ে আসে, যখন কোথায়ও একটু আলোর ক্ষীণ রেখাও দেখা যায় না—আলোয় বিশ্বাস রাখা বড় শক্ত কথা। তবু অন্ধকারের পর আলো আসেই। এবং এই চক্রবৎ পরিবর্ত্তনে আস্থা রাখা ভিন্ন উপায় নেই। তা ছাড়া মাথা খুঁড়ে মরলেই বা কি লাভ? আপাত দুঃখনিবৃত্তি। বুদ্ধদেব ও ভগবানের এই স্থায়ী মার, অবশ্যম্ভাবী—একান্ত দুঃখ নিবারণ করবার উদ্দেশ্যেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ দিয়েছেন। কিন্তু তাহলেও যে শূন্যতায় নির্ব্বানে পৌছতে হয়; তাতে মনও সরে না, বুদ্ধিও তৃপ্ত হয় না। যুক্তি অকাট্য হতে পারে, কিন্তু সকল যুক্তির বাড়া কি এক অন্তর্যামী আছে, তার সায় তার সই না পেলে কোন রায় সিদ্ধ হয় না। জীবনের আনন্দ ত অস্বীকার করবার জো নেই। দুই বিরোধী অথচ প্রবল পক্ষের দ্বন্দ্ব সামঞ্জস্য করবার বৃথা চেষ্টাই ত' প্রায় সকল ধর্ম্মই অস্ত্রিমান ও অর্দ্ধজরৎ,—দুই বিপরীত ও প্রায় সমকক্ষ দেবতার কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছে। পারি না পারি এ রহস্য ভেদের চেষ্টা চিরকাল চলেছে ও চলবে বলেই দুঃখের ছায়াতলে ও মানুষের

জীবনে গতি, হৃদয়ে বল ও বুদ্ধিতে ধার থাকে। শেষ কথা জানতে পারলে ত' সব চুকে গেল, আমার কথাটি ফুরোলো। অধিকাংশ মানুষই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতেই এত ব্যস্ত থাকে যে, অত সূক্ষ্ম বিষয় মাথা খেলাবার অবসর, ইচ্ছা বা ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু একদল লোক—কবি, ভাবুক, লেখক,—আবহমান কাল ছিল আছে এবং থাকবে, যাদের কাছে বর্ত্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতের, প্রত্যক্ষের চেয়ে অপ্রত্যক্ষের, স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের, কালের চেয়ে অনন্তের আকর্ষণ বেশী। আর তাদের সঙ্গে সব মানুষের অজ্ঞাতসারেও নাড়ীর যোগ আছে বলে' সব দেশে কালে তাদের এত সম্মান, এত আদর, এত উচ্চ আসন। সেই কবিই বলেছেন :

বুঝি বা এই বজ্ররবে,
নূতন পথের বার্ত্তা কবে,
কোন পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি।

নবজাগরণ ও হিউম্যানিজম্

বিনয় ঘোষ

• এক-একটি 'শব্দ' প্রত্যয়ের প্রতিমূর্তি এবং এই প্রত্যয়গুলি হল ইতিহাসের চাবিকাঠি। বেহিসেবী ব্যবহারের জন্য সেগুলি যদি ক্ষয়ে আকারহীন হয়ে যায় তাহলে তা দিয়ে আর ইতিহাসের দ্বারোদ্‌ঘাটনের কাজ চলে না। কুয়াশাচ্ছন্ন ঝাপ্‌সা প্রত্যয়ের অপব্যবহারে আলোচ্য বিষয় আলোকিত না হয়ে ক্রমে বিভ্রান্তির অন্ধকারে ঢেকে যায়। আধুনিক যুগের বাংলার নবজাগরণ সম্বন্ধে আলোচনা এরকম অনেক বিভ্রান্তিতে ভরে গেছে বলে মনে হয়। তার কারণ, 'রেনেসাঁস' ও 'হিউম্যানিজম্', প্রধানত এই দুটি শব্দকেন্দ্রিক প্রত্যয়ের আসল ঐতিহাসিক অর্থ সম্বন্ধে সজাগ না হয়ে তার চলতি মৌখিক অর্থটাকেই আমরা বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছি। তার ফলে, যে-কোন বিষয়ের অতিসরলীকরণের জন্য যতরকমের দোষত্রুটি ঘটা সম্ভবপর, তাই ঘটেছে। 'রেনেসাঁস' কেবল 'জাগরণ' নয়, কারণ জাগরণেরও প্রকারবৈচিত্র্য আছে। ঘুমন্ত সমাজ ও মানুষ নানাভাবে নানাকারণে জেগে ওঠে। পরিপার্শ্ব ও পরিবেশের জন্য সে জেগে উঠতে পারে, আবার ঘুমের নির্দিষ্ট প্রহরান্তেও তার পক্ষে জাগা সম্ভব। ঘুমেরও রকমভেদ আছে। গভীর ঘুমে অসাড় অচৈতন্য হয়ে থাকাও ঘুম, আবার আধ-ঘুম আধ-জাগরণের আলো-অন্ধকারে অর্ধচেতন হয়ে থাকাও একরকমের ঘুম। যে-কোন ঘুম ভাঙাকেই জাগরণ বলা যায়। কিন্তু ঘুমের রকমের গুরুত্ব ইতিহাস-বিচারে উপেক্ষণীয় নয় বলে, সেই ঘুম ভাঙার বা জাগরণের বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্যও গভীর। অচৈতন্য ঘুমের যুগ বলে কোন যুগ ছিল কি না, অথবা আদিকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত কোন কালে মানুষ বাস্তবিকই কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমিয়েছিল কি না, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ যথেষ্ট আছে। যুগে যুগে অনেকবার ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষ এবং অনেকবার

• গত সংখ্যায় প্রকাশিত (উত্তরসূরী ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) আমার "বাংলার রেনেসাঁস ও হিন্দু ঐতিহ্য" প্রবন্ধের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। উক্ত প্রবন্ধে উত্থাপিত বিষয়বস্তুর বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে করবার চেষ্টা করা হয়েছে।—বি. ঘো

জেগে উঠেছে। কেবল আধুনিক যুগের উষাকালে সর্বপ্রথম মানুষ জেগে ওঠেনি। তাই 'জাগরণ' অর্থে রেনেসাঁসের নামকরণ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। মানুষের ঘুমও নতুন ঘুম, জাগরণও 'নব-জাগরণ'। 'রেনেসাঁস' নব-জাগরণ, নতুন করে জাগা। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়ে 'নবজন্ম' বা 'পুনর্জন্ম' বলাই সঙ্গত। পূর্বেও যে জন্ম হয়েছিল বা জাগরণ হয়েছিল, রেনেসাঁস কথার মধ্যেই তার স্বীকৃতি রয়েছে। বিস্মৃত অতীতকে বর্তমানে পুনরাবিষ্কার করার নামই 'রেনেসাঁস'। মানুষের ও সমাজের অগ্রগতির স্বার্থেই এই পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজন হয়েছিল, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে, তাই 'রেনেসাঁস' কথার সঙ্গে প্রগতি-চেতনাও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। সেটা 'রেনেসাঁস' কথার সম্প্রসারিত ভাবার্থ। কিন্তু কেবল সেই ভাবার্থ দিয়ে কোন দেশের নবজাগরণযুগের ইতিহাস ব্যাখ্যা করলে নানারকমের ভুলভ্রান্তি ঘটতে পারে। সুতরাং 'রেনেসাঁসের' ঐতিহাসিক অর্থ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েই বাংলাদেশের নবজাগরণের ধারা ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা উচিত।

রেনেসাঁসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 'হিউম্যানিজম্' কথার যথার্থতাও এই কারণে অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন। 'হিউম্যানিজমের' সঙ্গে মানবপ্রীতি, মানবপ্রেম বা মানবতাবোধের সম্পর্কও দূর জ্ঞাতিসম্পর্কের মতন। আসলে 'হিউম্যানিজম্' একটা নতুন জীবনদর্শন, যার প্রধান উৎস 'মানুষ', মানবোত্তর বা মানবেতর কোন বিষয় নয়। হৃদয়বৃত্তির চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গেই তার আত্মীয়তা গভীরতর। মধ্যযুগের 'God-ism' বা ঈশ্বরদর্শনের সঙ্গে তুলনা করলে 'Human-ism' মানবদর্শন বলা যায়। এও দার্শনিক ব্যাখ্যা। ঐতিহাসিক অর্থে 'হিউম্যানিস্ট' তাঁদেরই বলা হয় যাঁরা ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা অনুশীলন করতেন এবং গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। আজও সেইজন্য ইয়োরোপের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ল্যাসিক্যাল বিদ্যাকে 'humanities' বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে 'হিউম্যানিটিজ' কথা মানববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রয়োগ করতেও বাধা নেই। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের যুগে এই অর্থে যাঁরা 'হিউম্যানিস্ট' ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিতের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। অথচ নবজাগরণের প্রায় সমস্ত আলোচনায় এই সব বাঙালী পণ্ডিত ও স্কলারদের দানের গুরুত্বের কথা অনুক্ত রয়ে গেছে। তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত লেখা হয়েছে, কিন্তু নবজাগরণের ঐতিহাসিক 'spirit'-এর সঙ্গে

তাঁদের প্রাচীন পুথি-পাণ্ডুলিপি তল্লাসের এবং সংস্কৃতবিদ্যা অনুশীলনের অপরিসীম আগ্রহের সাযুজ্য যে কত গভীর তা বোঝবার বা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়নি। এই বিস্ময়কর বিচ্যুতির প্রধান কারণ, হিউম্যানিজম্ ও হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঐতিহাসিক কালের বন্দর ছেড়ে অনেক দূরে ভেসে গেছে এবং কেবল সামাজিক সংস্কারকর্মের প্রবণতার সঙ্গে আমরা তাকে অভিন্ন করে দেখেছি। সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনা উদ্বুদ্ধ করতে প্রথমে মানবমনের পতিত জমিতে যে হলকর্ষণের প্রয়োজন হয়েছিল, ক্ল্যাসিক্যাল বিদ্যানুরাগীরা রেনেসাঁসের প্রথম যুগে তাতে হলধরের কাজ করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে, নবজাগরণের প্রথম যুগে, সেই ঐতিহাসিক কর্তব্যই পালন করে গেছেন, কিন্তু সামাজিক সংস্কারকর্মীদের মতন স্তুতি স্বীকৃতি তাঁরা পাননি, আমাদেরই বিচারের ধোঁয়াটে দৃষ্টির জন্য। 'রেনেসাঁস' ও 'হিউম্যানিজম্'—এই দুটি কথা আশ্রয় করে যে প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার ঐতিহাসিক নোঙর ছিন্ন হলে যে পরবর্তী ইতিহাস-বিচারে কত রকমের বিভ্রান্তির প্রশ্রয় পাওয়া সম্ভব, এগুলি তারই দৃষ্টান্ত।

'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের মৌলিক ঐতিহাসিক অর্থ থেকেই আলোচনা শুরু করা বাঞ্ছনীয়। এই আলোচনায় 'হিউম্যানিজম্' কথার তাৎপর্যও পরিষ্কার হয়ে যাবে, কারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে 'রেনেসাঁস' ও 'হিউম্যানিজম' যমজ প্রত্যয় বলা যায়। নবজাগরণের প্রেরণায় নির্মিত হল নতুন জীবনদর্শন এবং সেই জীবনদর্শন হল মানবকেন্দ্রিক (anthropo centric), ঈশ্বরকেন্দ্রিক (theo-centric) নয়। তারই নাম 'হিউম্যানিজম'।

'রেনেসাঁস' কি? একথা যদি শিল্পীদের জিজ্ঞাসা করা যায়, তাঁরা বলবেন, প্রাচীন শিল্পকীর্তি পুনরাবিষ্কারের ফলে স্থাপত্যে, চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে যে নতুন ধারার প্রবর্তন হল, তারই নাম রেনেসাঁস। সাহিত্যিক ও দার্শনিকেরা বলবেন, প্রাচীন পুথি পাণ্ডুলিপি পুনরাবিষ্কারের ফলে, অতীতের লুপ্ত জ্ঞান পুনরুদ্ধারের অনুসন্ধিৎসার জন্য, ক্ল্যাসিক্যাল বিদ্যায় যে সম্যক জ্ঞানলাভ সম্ভব হল, সাহিত্য ও কাব্যের রসাস্বাদনের যে তৃষ্ণা জাগল, যে মার্জিত রুচিবোধের

বিকাশ হল, নতুন যে চিন্তাধারা প্রবর্তিত হল, মানুষের বিবেক ও যুক্তিবুদ্ধির যে মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিল, তাকেই এক কথায় 'রেনেসাঁস' বলা যায়। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলবেন, মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আধুনিক যুগের ধনিক-বণিকতন্ত্রের বিকাশের সন্ধিক্ষণের নামই হল 'রেনেসাঁস'। এই সন্ধিক্ষণের আবির্ভাব হয়েছিল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ফ্লোরেন্স ভেনিস প্রভৃতি কয়েকটি ইতালীয় শহরে, তাই রেনেসাঁসের 'typological model' এই সময়কার এই ইতালীয় শহরগুলিতে আমরা দেখতে পাই। বণিকযুগ ও ধনিকযুগের এই অভ্যুদয়ের ফলে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের অগ্রগতির পথ সুগম হল, জাতীয় ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ হল। জড়পিণ্ডের মতন চেতনা-হীন বিশাল রোম মানব-পরিবার ছোট ছোট 'নেশন স্টেট' বা আত্ম-সচেতন 'জাতি'তে পরিণত হল। বৈজ্ঞানিকেরা বলবেন, কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওর সৌরজগৎ আবিষ্কার, ভেসালিয়াসের অ্যানাটমি এবং হার্ভের রক্তসংবহনতত্ত্বের ফলে চিন্তাজগতে যে বিপ্লবের সূচনা হল, তারই নাম রেনেসাঁস। টেকনোলজিস্ট বা যন্ত্রবিদ্‌রা প্রাথমিক যন্ত্রপাতির ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের সুদীর্ঘ তালিকা দেখিয়ে বলবেন, যন্ত্রযুগের এই শৈশবকালকে, মামফোর্ডের ভাষায়, Eotechnic Phase-কেই রেনেসাঁস বলে। এই সব যন্ত্রই নবজাগরণের অগ্রদূত, যেমন ওয়াটার-মিল উইণ্ড-মিল মুদ্রণযন্ত্র, কামান গোলাবারুদ ইত্যাদি। অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রযুগের ঊষাকালই রেনেসাঁস।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এইভাবে রেনেসাঁসের বিচার করা সম্ভব হলেও, তার ভিতর থেকে একটি অভিন্ন চিন্তাসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সূত্রটি হল, মানুষের নতুন বিচারভঙ্গি ও দৃষ্টির সঙ্গে রেনেসাঁসের সম্পর্ক। মধ্যযুগে এই দৃষ্টি মানুষের ছিল না। আধুনিক যুগের সূচনাকালে নতুন সামাজিক পরিবেশে মানুষ এই দৃষ্টিশক্তি অর্জন করল। নতুন চেতনা, রুচি ও বিচারবুদ্ধির এই উন্মেষই রেনেসাঁসের মর্ম। সিমণ্ডস্ রেনেসাঁসের এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে বলেছেন : [১]

> The history of the Renaissance is not the history of arts, or of sciences, or of literature, or even of nations. It is the history of the attainment of self-conscious freedom to the human spirit manifested in the European races. It is no more political mutation, no new fashion in art, no restoration of classical standards of taste. The arts and the

inventions, the knowledge and the books, which suddenly became vital at the time of the Renaissance, had long lain neglected on the shores of the Dead Sea which we call the Middle Ages. It was not their discovery which caused the Renaissance ; but it was the intellectual energy, the spontaneous outburst of intelligence, which enabled mankind at that moment to make use of them.

রেনেসাঁস হল নবজন্ম বা পুনর্জন্ম, এবং সেটা কেবল সাহিত্য শিল্পকলা বা যন্ত্রবিজ্ঞানের নবজন্ম নয়, সমগ্রভাবে মানুষেরই নবজন্ম। সুতরাং রেনেসাঁসের ইতিহাস কেবল শিল্পকলা সাহিত্য বিজ্ঞান বা স্বাধীন জাতির ইতিহাস নয়। মানুষের আত্মসচেতন স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসই রেনেসাঁসের প্রকৃত ইতিহাস। কেবল রাজনৈতিক কোন বিবর্তন, বা শিল্পকলার কোন নতুন ফ্যাশান, অথবা ক্ল্যাসিকাল সুরুচির পুনরাস্বাদনই রেনেসাঁস নয়। রেনেসাঁসের যুগে যে সব শিল্পকলা, জ্ঞান বিদ্যা ও গ্রন্থের আবিষ্কার নবজীবনের প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, তা দীর্ঘকাল ধরে মধ্যযুগের মৃতসাগর-তীরে উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল। তাদের পুনরাবিষ্কারের ফলেই যে রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল তা নয়। যে স্বতঃস্ফূর্ত বুদ্ধিদীপ্ত কর্মপ্রেরণা ও উদ্দীপনা সেই সব পুনরুদ্ধৃত লুপ্তরত্ন ও সম্পদ মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিল, সেই বন্ধনমুক্ত বুদ্ধি ও উৎসাহের জন্যই রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল।

সিমণ্ডসের এই উক্তির তাৎপর্য গভীর এবং রেনেসাঁসের মর্মোদ্ভেদ করাই তাঁর লক্ষ্য। প্রসঙ্গত সিমণ্ডস 'the Dead Sea which we call the the Middle Ages' বলেছেন, কিন্তু মধ্যযুগের ঐতিহাসিক দানের কথা তিনি অস্বীকার করেননি। মধ্যযুগ ভিন্ন নবযুগের অভ্যুদয়ও সম্ভব হত না। মধ্যযুগের আগাগোড়া 'অন্ধকার যুগ' মনে করে আধুনিক যুগকে 'আলোকের যুগ' বলে অভিনন্দিত করাও অর্থহীন। হিউম্যানিজমের বিকাশের আগেও রোজার বেকনের ((Roger Bacon) মতন হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন। মধ্যযুগের আধ্যাত্মিক তন্দ্রার ঘোরেও মানুষ জীবনের স্বপ্ন দেখেছে এবং অনেক অজ্ঞেয় ও দুর্জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে তার মনে। ধর্মের উৎপীড়নের মধ্যেও মানুষের মন বারংবার মুক্তির আলোবাতাসে ডানা মেলতে চেয়েছে। অসীম রহস্যাবৃত এই পৃথিবীর অসংখ্য দেবদেবী ও বিচিত্র অলৌকিক শক্তির দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে মধ্যযুগের ধর্ম ও ঈশ্বরদর্শন মানুষের মনকে

একেশ্বরের চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই আধ্যাত্মিক চিন্তানিয়ন্ত্রণে মানুষের মানসিক নৈরাজ্যের শেষ হয়েছে এবং অদ্বৈতচিন্তা ঐশ্বরিক হলেও, তাই থেকে সুসংহত কার্যকারণ যোগসন্ধানী বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ হয়েছে। যন্ত্রের আবিষ্কারও মধ্যযুগে কম হয়নি। 'ইউনিভার্সিটি' বা বিশ্ববিদ্যালয়েরও উদ্ভব হয়েছে মধ্যযুগে। সুতরাং মধ্যযুগের সবটুকু অন্ধকার নয়। সব যুগেরই অন্তিমকালে যেরকম সর্বগ্রাসী সঙ্কট দেখা দেয় এবং সমাজে নতুন শক্তির বিকাশের ফলে বিরোধের মধ্যে সেই সঙ্কট যেমন গভীর হয়ে ওঠে, মধ্যযুগেও ঠিক তাই হয়েছিল। আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক চিন্তা মানুষের মনকে এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল যে কোনরকম ঐহিক ও আত্মচিন্তা করাকে সে পাপ বলে মনে করত। জ্ঞানবিস্তার চর্চা, সামাজিক ও বাক্তিক উন্নতির পথ এই সময় থেকে বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার ঘনিয়ে এল তখন, যখন ধর্ম কেবল কৃত্রিম প্রাণহীন আচারে ও নেশায় পরিণত হল। সেইটাই হল মধ্যযুগের 'Dead Sea,' যার তীরে, সিমণ্ড্স বলেছেন, মানুষের চিন্তার অনেক ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের সম্পদ অবজ্ঞাত অবস্থায় ছড়িয়ে রইল। নবযুগের বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ সেই অনাদৃত ভাবসম্পদ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কুড়িয়ে নিয়ে এল 'মৃতসাগরের' তীর থেকে। কিন্তু কেন কুড়িয়ে আনল? কেন আধুনিক যুগের উদ্বোধন-কালে প্রয়োজন হল ক্ল্যাসিকাল যুগের দিকে ফিরে তাকাবার? সুদূর অতীতের তীর থেকে বিস্মৃত ঐতিহ্য ও অবহেলিত ভাবসম্পদ কুড়িয়ে এনে যাঁরা নবযুগের মানুষের সামনে তুলে ধরলেন এবং তার সৌন্দর্য ও তাৎপর্য নতুন করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরাই হলেন 'হিউম্যানিস্ট' বুদ্ধিজীবী। কেন তাঁরা এই কর্মে ব্রতী হলেন এবং তার প্রেরণাই বা পেলেন কোথা থেকে?

সামন্তযুগের অবসান এবং ধনিক-বণিকযুগের অভ্যুদয়ের সন্ধিক্ষণকে 'রেনেসাঁস' বলা হয়। একথা আগে বলেছি। অর্থনীতির ভাষায় এই ধনিক-বণিকশ্রেণীকে 'বুর্জোয়াশ্রেণী' বা 'ক্যাপিটালিস্ট-শ্রেণী' বলা যায়। রেনেসাঁসের ও আধুনিক যুগের রঙ্গমঞ্চের প্রধান নায়ক এই 'বুর্জোয়াশ্রেণী,' হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবী বা পণ্ডিতেরা নন। তাঁরা নবযুগের নায়কদের বিবেকরক্ষী, বুদ্ধিদাতা

ও মন্ত্রণাদাতা। অর্থাৎ যজ্ঞের পুরোহিত তাঁরা, কর্তা নন। যুগে যুগে সমাজের প্রধানশ্রেণীর একদল হোতার প্রয়োজন হয়েছে। এই হোতারা তাঁদের যুগোপযোগী আদর্শের ও নীতির বাহক ও প্রচারক। আদিকালে তাঁদের বলা হত 'ম্যাজিশিয়ান', মধ্যকালে যাজক ও পুরোহিত, আধুনিককালে হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবী। যে-যুগে যে-শ্রেণী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করেন, সেই যুগে সেই শ্রেণী তাঁদের অগ্রগতি ও কর্তৃত্ব রক্ষার স্বার্থে নতুন জীবনদর্শন, নতুন নীতি ও সামাজিক মূল্যায়নের মানদণ্ড তৈরি করেন এবং ধীরে ধীরে সেই দর্শন নীতি ও মনোভাব সমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। বণিকশ্রেণীর প্রাধান্যের প্রথম যুগে ব্যবসায়ীরা তাদের বাস্তব-হিসেবী মনোভাব এইভাবে সমাজমানসে সঞ্চালিত করেন। মধ্যযুগে যেমন নাইটরা করেছিলেন ঠিক তেমনি। এ যুগের একজন বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট ও অর্থনীতিবিদ্ জোসেফ শুম্পিটার 'রেনেসাঁস' সম্বন্ধে এইকথাই বলেছেন। "বণিকের মনোবৃত্তি সামাজিক মনোবৃত্তিতে পরিণত হবার ফলে যে সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সূচনা হল, শুম্পিটার বলেছেন যে ভুল করে তারই নামকরণ করা হল রেনেসাঁস :

> Results burst forth in the epoch of cultural transformation that has been so curiously misnamed 'Renaissance'.

বণিকের চিন্তা কি? বণিকের মনোভাব কি? পারত্রিক চিন্তা বা ঈশ্বরচিন্তা নিশ্চয় বণিকের জন্য নয়। মনকে ঈশ্বরমুখী ও অকর্মণ্য করে রাখাও বণিকের স্বার্থবিরোধী। সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যদি বণিকশ্রেণীকে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করতে হয়, তাহলে সবার আগে যেমন তার বাণিজ্যিক ও আর্থিক সমৃদ্ধি প্রয়োজন, তেমনি তার মনোভাব ও চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাও প্রয়োজন। সেই মনোভাব হল ঐহিক মনোভাব, বাস্তব হিসেবী মনোভাব। সেই চিন্তা ও জীবনদর্শন হল মানবচিন্তা ও মানবদর্শন (অর্থাৎ 'হিউম্যানিজম্'), ঈশ্বরচিন্তা বা ঈশ্বরদর্শন নয়। কারণ স্বর্গলোক থেকে ঈশ্বর নেমে এসে মর্ত্যলোকে মজুর হয়ে বণিকের স্বার্থে কারখানা চালাবে না। বণিকের স্বার্থে যারা কারখানা চালাবে, যন্ত্র চালাবে, পণ্য উৎপাদন করবে, তারা মর্ত্যের মানুষ, স্বর্গের দেবতা নয়। আধ্যাত্মিক বা পারত্রিক চিন্তায় বিভোর মানুষ দৈহিক মেহনতের কর্মে অনুপ্রাণিত

হতে পারে না। আত্মচিন্তা ও ঐহিক চিন্তা করতে হবে, ভোগের লালসায় উদ্দীপ্ত হতে হবে, ত্যাগের আদর্শে বৈরাগী হলে চলবে না। ইহলোকের পার্থিব 'লাভের' (বণিকদের 'মুনাফা') আশায় অনুপ্রাণিত হতে হবে, পরলোকের অপার্থিব 'পুণ্যের' মোহে অন্ধ হয়ে থাকা চলবে না। সবই উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে প্রয়োজন এবং তার জন্য নতুন 'set of values' তৈরি করা এবং নতুন যুক্তির সিংহাসনে তাদের মহাসমারোহে অধিষ্ঠিত করা আবশ্যক। এই সব জীবনাদর্শের সংঘাতে সমাজ-জীবনে যে নতুন সাড়া জাগল, সর্বক্ষেত্রে যে কর্মপ্রেরণা উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা দেখা দিল, উঁচুগলায় তাকেই 'রেনেসাঁস' বলে ঘোষণা করা হল। যেন তার আগে মানুষ আর কখন জাগেনি, যেন সে চিরকালই ঘুমিয়ে ছিল, যেন যুক্তি ও বুদ্ধি বলতে কোন কিছুই ছিল না আগে মানুষের। বিরোধটা মূলত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নয়। সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে বণিকশ্রেণীর বিরোধ মূলত রাজনৈতিক বলে, মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের পার্থক্যকে সাদাকালো রঙের বৈসাদৃশ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছিল। সর্বকালে রাজনৈতিক বিরোধিতার স্বরূপ একই, বিরোধী পক্ষের সবই মন্দ, স্বপক্ষের সব ভাল। রেনেসাঁসের যুগেও তাই মধ্যযুগের সবই মন্দ ও হেয় এবং আধুনিক যুগের সবই মহৎ ও সুন্দর, এইরকম একটা ধারণা প্রথম তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং হিউম্যানিস্টরা তাতে অনেকখানি ইন্ধনও যুগিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁরা অপরিসীম উৎসাহে অতীতের সব লুপ্ত আদর্শ পুনরাবিষ্কার করেছিলেন, ক্ল্যাসিকাল জ্ঞানবিদ্যার চর্চায় ও ব্যাখ্যানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কোন বন্ধন, কোন শাসন ও সংস্কার মানেননি। রেনেসাঁসের যুগের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর এই মনোভাব সম্বন্ধে মার্টিন বলেছেন : [৩]

> It is the attitude of a type of individualistic intellectual entrepreneur which truly corresponded to the new capitalist attitude in economic matters.

কিন্তু 'attitude' বা মনোভাব যাই হোক না কেন, শ্রেণীস্বার্থে তার বিকাশ হলেও শেষ পর্যন্ত সমাজের সর্বশ্রেণীর মনে তা সঞ্চারিত হয়। সঙ্কীর্ণ শ্রেণীসীমা লঙ্ঘন করে জীবনাদর্শেরও অবশেষে সামাজিক পরিব্যাপ্তি ঘটে। স্বশ্রেণীর স্বার্থে উদীয়মান বণিকশ্রেণী ও হিউম্যানিস্টরা যে সব মহৎ আদর্শের প্রচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে আত্মমর্যাদাবোধ মানুষের মনে জাগিয়ে

তুলেছিলেন, সেই শক্তিশালী আদর্শের হাতিয়ার নিয়েই মানুষ জীবনের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং সংস্কৃতির ভাণ্ডার অনেক সম্পদে ভরে তুলেছে। এমনকি সেই আদর্শই শেষে 'বুমেরাং' হয়ে প্রচারকদের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে। হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব বা আদর্শ যতই সীমাবদ্ধ হোক, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই জন্যই অনস্বীকার্য এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের অগ্রগামী মানুষের পথপ্রদর্শক। একথা না ভুলেও যদি রেনেসাঁসের যুগের হিউম্যানিস্টদের উদ্ভবের সামাজিক তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার কারণটি স্মরণ রাখা যায়, তাহলে পরবর্তীকালে, আধুনিক যুগের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের পূর্ণবিকাশের ফলে, তাঁদের শেষ পরিণতি কেন ট্র্যাজিক হল, তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। হিউম্যানিস্টদের আবির্ভাবের রহস্য জানা থাকলে তাঁদের পরিণতির রহস্যও সহজে ভেদ করা যায়।

এইবার ক্ল্যাসিকাল যুগের দিকে দৃক্‌পাতের কারণটিও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে মনে হয়। প্রথম কারণ, প্রধানত 'পলিটিক্যাল' বা রাজনৈতিক—

The laical intellectuals.....were often opposed to the Church as a political power (Schumpeter).

এই রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্য মধ্যযুগের সামন্ত-পুরোহিততন্ত্রের পোষকতায় লব্ধ সমস্ত জ্ঞানবিদ্যা ও মানস-সম্পদ অনেকটা চোখ বুজে নাকচ করতে হয়েছে। মধ্যযুগ পার হয়ে স্বভাবতঃই তাই ফিরে যেতে হয়েছে ক্ল্যাসিক্যাল যুগে। দ্বিতীয় কারণ, 'tradition' ও 'authority'-র আবশ্যকতা। মানুষ তখনও মধ্যযুগের ঐতিহাশ্রয়ী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত এবং ঋষিবাক্য আর্ষ হলেও তাতে বিশ্বাসী। কেবল যুক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করে কোন জীবনদর্শন বা নীতি মেনে নিতে তার মন চায় না। মন চায় 'ট্রেডিশানের' উপর ভর দিয়ে চলতে। রেনেসাঁসের যুগের হিউম্যানিস্টরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষের অভ্যস্ত চিন্তাপ্রণালীর হঠাৎ খাতবদল সম্ভব নয়। তাই নবযুগের জীবনদর্শন ও নীতি তাঁরা 'ট্রেডিশন' ও 'অথরিটি'র জোরে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। 'ট্রেডিশান' যত প্রাচীন হয়, তত সাধারণ মানুষের কাছে তার আবেদন ও আকর্ষণ বাড়ে। মধ্যযুগের চেয়ে ক্ল্যাসিকাল যুগের ঐতিহ্য আরও বেশী দৃঢ়মূল এবং তার আকর্ষণও বেশী। সেইজন্যও ক্ল্যাসিকাল যুগের দিকে হিউম্যানিস্টরা ফিরে তাকিয়েছিলেন। তৃতীয় কারণ, সিমণ্ডসের ভাষায় বলা যায় :

নবজাগরণ ও হিউম্যানিজম্

Men found that in Classical as well as Biblical antiquity existed an ideal of human life, both moral and intellectual, by which they might profit in the present.

যুগোপযোগী আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল মানুষ ক্ল্যাসিকাল যুগে। মধ্যযুগ হাতড়ালে তার কোন সন্ধান যে পাওয়া যেত না তা নয়। কিন্তু অনেক আগাছার জঙ্গল কেটে তা খুঁজে বার করতে হত। অথচ ক্ল্যাসিকাল যুগে সেই সব জীবনাদর্শ হীরকের মতন ছ্যুতিমান। মানবচিন্তা, মানবদর্শন, অর্থাৎ "anthropo-centric humanism" কেবল গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের "Man is the measure of all things"-এর প্রতিধ্বনি নয়। প্রোটাগোরাসের উক্তি—"Of the gods I cannot say whether they exist or not, nor of what nature they are"—হিউম্যানিস্টদেরও উক্তি। কেবল প্রোটাগোরাস নয়, বহু গ্রীক ও রোমান দার্শনিক সাহিত্যিক কবি শিল্পী রেনেসাঁসের যুগের উপযোগী নীতি ও জীবনাদর্শ হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের যুগিয়েছেন। আবার শুম্পিটারের কথাতেই বলছি —*

> The 'revival' of interest in the thought Rome was so powerful a factor in the *only because ancient forms ided and meanings.*

আধারের প্রশ্ন যখন মানুষের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল—'ট্রেডিশনের' আধার—তখন পুরাতন ক্ল্যাসিকাল পাত্রে রেনেসাঁসের যুগের পানীয় মানুষকে দান করাই বুদ্ধিমান হিউম্যানিস্টরা সমীচীন বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু রেনেসাঁসের আসল সংস্কৃতির বিকাশ হল যখন, তার নতুন হর্ম্য যখন গড়ে উঠল, তখন আর তার ক্ল্যাসিকাল যুগের মেরামত-চুনকাম-করা প্রাচীন গড়ন রইল না:—"The real cultural achievement of the period did not consist in reconditioning old heirlooms" (Schumpeter). সম্পূর্ণ এক নতুন সংস্কৃতির মিনার তৈরি হল। ভাষায় সাহিত্যে চিত্রকলায় স্থাপত্যে ভাস্কর্যে, শিক্ষায় ও বিদ্যাচর্চায়, নব নব আবিষ্কারের ও উদ্ভাবনের ঔজ্জ্বল্যে, জীবনদর্শনে ও সমাজনীতিতে সমুজ্জ্বল এক নতুন সংস্কৃতি। জীবনের আকাশ থেকে হঠাৎ যেন বিলীয়মান যুগের সমস্ত পুঞ্জীভূত মেঘ ও অন্ধকার এক নিমেষে কেটে গেল। মনে হল, আর কোনদিন হয়ত মেঘ জমবে না সেখানে। অতি-উৎপন্ন 'ক্যাপিটালিস্ট'দের তাই মনে হল, এবং নতুন আদর্শের

সুধাপানে বিভোর 'হিউম্যানিস্ট'দেরও তাই মনে হল। সমাজে যখন তাঁদের প্রভাব বাড়ল তখন তাঁদের এই মনোভাবের অনেকটা তাঁরা সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হলেন। সকলেরই তাই মনে হল, রেনেসাঁসের স্বপ্নসূর্য অস্ত যাবে না কোনদিন। ভোরের প্রথম জাগরণে চোখ মেলে উদীয়মান সূর্যের দিকে চেয়ে হয়ত তাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক। যুগে যুগে মানুষের তাই মনে হয়েছে, নতুন আদর্শ ও অঙ্গীকারের রামধনুর দিকে চেয়ে। ভোরের স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলে তাই মনে হয়, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়, একবারও তখন মনে হয় না সায়াহ্নের অন্ধকারের কথা। রেনেসাঁস তো আধুনিক যুগের ভোরবেলা। কর্ম ও কল্পনা, দুয়েরই প্রেরণা তখন মানুষের কাছে অফুরন্ত। দৃষ্টি তখন মধ্যাহ্নের কেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত এবং পশ্চিমের দিগন্ত দৃষ্টিপথে একেবারে অপসারিত।

বাংলার বা ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে ইয়োরোপের সঙ্গে যে বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তা দুই দেশের সামাজিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য। ইয়োরোপেও রেনেসাঁসের তরঙ্গ সর্বত্র একটানে এক খাতে প্রবাহিত হয়নি। ইটালিতে ফ্রান্সে জার্মানিতে, পশ্চিম ও পূর্ব ইয়োরোপে, বা ইংলণ্ডে তার তরঙ্গভঙ্গি ও স্রোতের খরতায় তারতম্য ছিল। বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে থাকা খুবই স্বাভাবিক। প্রথমত, ইয়োরোপীয় মধ্যযুগ ও ভারতীয় মধ্যযুগের দৃঢ়তা ও ব্যাপ্তি এক নয়। সমাজে ও মানসলোকে তার আদর্শ ও অভ্যাসের আলগ গভীরতা এদেশে অনেক বেশি। সামাজিক রূপেরও ভিন্নতা আছে। তবু ইয়োরোপীয় বণিকদের সংস্পর্শে সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই এদেশের বণিক-দের মনে নবযুগের বণিগ্‌বৃত্তির ক্ষীণ জাগরণ শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশ প্রধান কর্মক্ষেত্র হওয়াতে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে একদল বাঙালী এই মনোবৃত্তি নিয়ে বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির বেশে দেখা দিলেন। অর্জিত ও সঞ্চিত মূলধন নিয়ে ইয়োরোপীয় অর্থে 'ক্যাপিটালিস্ট' বা 'বুর্জোয়া' হয়ে ওঠার পথে তাদের বাধা ছিল অনেক। সবচেয়ে বড় বাধা, বৃটিশ শাসকব্যবসায়ী-দের। তা সত্ত্বেও, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামদুলাল দে, মদন দত্ত এবং আরও অনেকে 'কমার্সিয়াল এন্টারপ্রাইজ' বা বাণিজ্যক্ষেত্রে দুঃসাহসিক

অভিযান করেছিলেন। যন্ত্রপাতিও কলকারখানার জন্ত আমদানি হতে আরম্ভ হয়েছিল, উনিশ শতকের গোড়া থেকে। মূল ভিত্তিতে আঘাত পড়ছিল ঠিকই এবং বিদেশী শাসকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় গ্রাম্য কৃষি-কুটির-শিল্প-নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোটি নতুন নাগরিক অর্থনীতির ঘাত-প্রতিঘাতে ভেঙে পড়ছিল। সুতরাং ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ রুদ্ধ হলেও, তার প্রাথমিক কালীন উদ্‌যোগ আয়োজন বা প্রস্তুতির অভাব হয়নি বাংলাদেশে। রেনেসাঁসের বা নবজাগরণের পক্ষে উনিশ শতকে এই প্রস্তুতিটুকুই পর্যাপ্ত ছিল বললে বোধ হয় ভুল হয় না। কারণ ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের রেনেসাঁসের ব্যবধান প্রায় তিন-চারশ বছরের। তার মধ্যে যে প্রবল চিন্তাস্রোত বয়ে গেছে মানুষের মনে, বিভিন্ন নীতি ও আদর্শের যে কঠিন পরীক্ষা ও ব্যাপক প্রচার হয়েছে, যে কোন দেশের মানুষের মনে, যোগসূত্র থাকলে, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব অকিঞ্চিৎকর হবার কথা নয়। তা হয়ও নি। বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে অন্তত নবজাগরণের সূচনায় আদর্শগত (idelogical) প্রভাব অর্থনৈতিক ও বাস্তব প্রভাবের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ইতিহাস কেবল অর্থনৈতিক শক্তির টানে এগিয়ে চলে এবং অন্যান্য শক্তির বিকাশ তার পরে হয়, এরকম যান্ত্রিক যুক্তি সব সময় সত্য নয়। 'আইডিয়া' বা ভাবাদর্শের শক্তিও কম নয়, দেশকালপাত্রভেদে তার টানেও ইতিহাসের চাকা নড়ে ও এগিয়ে চলে। কালের বা যুগের প্রশ্ন এখানে খুব বড় প্রশ্ন। একসময় চলাচলের অক্ষমতার জন্ত, অর্থাৎ উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে, মানুষের 'material tool'-এর যেমন বিস্তার হত না, তেমনি ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে 'ideological tool'ও আবদ্ধ থাকত, তার প্রসার (diffusion) হত না। আইডিয়ার বা ভাবাদর্শের প্রভাবও সবযুগে সব মানুষের উপর সমান ছিল না। অর্থনৈতিক 'ডিটারমিনিজম' বা নির্ধারণীয়তা ত্রিশ বছর আগে যতটা সত্য ছিল, একশ বছর আগে ততটা সত্য ছিল না, এখন তার সত্যতা আরও অনেক কম। কারণ ভাবের প্রসার ও প্রচারের যান্ত্রিক কলাকৌশল (মুদ্রণ-যন্ত্রের পরে রেডিও) এত উদ্ভাবিত হয়েছে এবং তা গ্রহণের ক্ষমতাও মানুষের এত বেড়েছে যে আজ ভাবরাজ্য থেকে শুরু হয়ে 'বিপ্লব' সমাজ-জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হতেও পারে। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সূচনায় 'আইডিয়ার' প্রভাব ছিল বেশি, যদিও অর্থনৈতিক ও সামাজিক

পরিবর্তনের লক্ষণও দেখা দিয়েছিল। সেইজন্য বাংলার রেনেসাঁসের যুগে 'হিউম্যানিজম' দর্শনের বা 'হিউম্যানিস্ট' বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইয়োরোপের মতন ধনতন্ত্রের প্রাণহীন যান্ত্রিকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। মধ্যযুগের মানবপ্রীতি ও মানবপ্রেম, দয়া দাক্ষিণ্য করুণাবোধ, ভক্তি ও ভাবালুতা, সবই তাঁদের নবযুগের কঠোর যুক্তিবাদী মানবদর্শনের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল এবং যখনই সুযোগ এসেছে তখনই সেগুলি তাঁদের ব্যক্তিচরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় যদি ধনতন্ত্রের অগ্রগতি অবরুদ্ধ হবার জন্য তাই হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ভাগ্যে শাপে বরলাভ হয়েছে বলতে হবে। কারণ মানবপ্রেমবর্জিত মানবদর্শন বা হিউম্যানিজম ইয়োরোপে অবশেষে 'individuality cult' বা 'তালকাণা' ব্যক্তিত্ববাদে রূপ নিয়েছে এবং তার ফলে রেনেসাঁসের প্রথমযুগের সমস্ত সোণালি আদর্শ প্রাণহীন নীরেট পাথরে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে তা হয়নি।

কেবল 'ব্রাহ্মধর্মের' দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে মনে হয়। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের যুগে 'ব্রাহ্মধর্ম' ও 'ব্রাহ্মসমাজ' অনেকটা ইয়োরোপের 'Protestant Church' ও 'Protestant Religion'-এর মতন গড়ে উঠেছিল বললে ভুল হয় না, কিন্তু ওয়েবার (Max Weber) বা টনির (Tawney) মতন সমাজবিজ্ঞানীরা 'প্রটেস্টাণ্ট' নীতি (Ethics) আর 'ক্যাপিটালিস্ট' মনোবৃত্তির বা 'Spirit'-এর মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখেছিলেন, ব্রাহ্মধর্মের বা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তা দেখা যায় না। একদিক থেকে তার সাদৃশ্য কেবল এইটুকু দেখা যায় যে ব্রাহ্মসমাজের সভাস্থলে তখন (অন্তত রামমোহনের যুগে) যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই নতুন নাগরিক উচ্চশ্রেণীভুক্ত এবং সঙ্গতিপন্ন বণিক-ব্যবসায়ীও ছিলেন অনেকে। তাঁদের বাস্তব জীবনের নীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের বা ধর্মাচরণের কোন বিরোধ ঘটেনি ব্রাহ্মমন্দিরে। রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদিতা, সত্যানুরাগ ও 'হিউম্যানিজম্' (যদিও তিনি নাস্তিক ছিলেন না এবং নাস্তিকাদর্শনের সঙ্গে মানবদর্শনের সম্পর্কও নেই) একেবারে ভাবালুতা-বর্জিত ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলার ও ভারতের এরেজমুজ (Erasmus) রামমোহনই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সময়ে, নানা ধর্মের সংঘাত ও 'ধর্মনাশের' তীব্র কোলাহলের মধ্যে, চারিদিকের অধর্মের পঙ্কস্রোতের আবর্তে,

ব্রাহ্মধর্মের ও সমাজের গোড়াপত্তনকালে কঠোর সংযম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন ছিল। দেবেন্দ্রনাথের সময়ে এই মানসিক কঠোরতা ভক্তিরসে একটু তরল হল। কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের সময়ে বাঁধ ভেঙে ভক্তি ও ভাবালুতার বন্যা বয়ে গেল ব্রাহ্মধর্মে। অবতারের কল্পনাতেও কেশবচন্দ্র আকৃষ্ট হলেন। অথচ কেশবচন্দ্রের মতন বিশ্বমানবধর্মী, যুক্তিবাদী, নির্ভীক তীক্ষ্ণধী 'হিউম্যানিস্ট' এদেশেও কেন, ইয়োরোপেও খুব বেশি জন্মাননি। রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্রের কাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ছায়াতলে বাংলার শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্টরা নির্ভয়ে দাঁড়াতে দিধা করেননি। রামমোহনের অটল অদ্বৈতবাদের হিমালয় থেকে ভক্তি-ভাবালুতার বহু ঝরণাধারা নেমে এসেছে বাংলার মাটিতে। সমাজের ও মানুষের প্রয়োজনে নেমে এসেছে, ধর্মের সঙ্গে জীবনের সংযোগের টানে। নেমে এসেছে বলেই সেই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের মতন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বতোমুখী 'হিউম্যানিস্ট' প্রতিভার বিকাশও সম্ভব হয়েছে, প্রায় একশ বছর পরে। ইয়োরোপের মতন বাংলার 'হিউম্যানিজম্' যান্ত্রিকতার বালুচরে হারিয়ে যায়নি, অথবা উগ্র ব্যক্তিবাদের পর্বতশৃঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ হয়ে যায়নি।

ব্রাহ্মধর্মের জের টেনে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি সন্ধানী দৃষ্টিনিক্ষেপের কারণের কথাও বলা যায়। বাংলার রেনেসাঁসের প্রবর্তক ধারক ও বাহকরা কেন প্রাচীন ভারতসংস্কৃতি বা হিন্দুসংস্কৃতির ঐতিহ্যের দিকে দৃক্‌পাত করেছিলেন? এ-প্রশ্ন অনেকের মনে জেগেছে, আবার অনেকের মনে একেবারেই জাগেনি। বোধ হয় বাংলার নবজাগরণের সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ এইটি। অনেকের যুক্তিবুদ্ধি ও উদার দৃষ্টি এই প্রসঙ্গের ঘূর্ণাবর্তে দিশাহারা হয়েছে। তার একটা কারণ, সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের প্রশ্ন ওতপ্রোত এবং ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে হিন্দু ও ইসলাম, এই দুই আচারবিরোধী ধর্মের প্রাধান্য ও পাশাপাশি অবস্থান, রেনেসাঁসের এই লক্ষণটির প্রকৃত ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত করেছে। তার উপর বাংলাদেশে, অর্থাৎ ভারতের অন্যতম নবজাগরণকেন্দ্রে, ইসলামধর্মীরা নানা ঐতিহাসিক কারণে রেনেসাঁসের প্রেরণায় গোড়ার দিকে উৎসাহিত হননি। সুতরাং খুব সরল যুক্তিতেই তাঁরা রেনেসাঁসের হিন্দু উদ্যোক্তাদের 'প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির ভাবসম্পদ পুঞ্জ-

রাবিষ্কারের মধ্যে তাঁদের আচরিত ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের আভাস পেয়েছেন। প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত হবার বা এড়িয়ে যাবার দ্বিতীয় কারণ, রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক প্রত্যয় সম্বন্ধে বিভ্রান্তি। এই প্রত্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনার আলোকে বাংলার নবজাগরণের এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা যেতে পারে।

ইয়োরোপে রেনেসাঁসের যুগের হিউম্যানিস্টরা যেকারণে ও যে-প্রয়োজনে 'ক্ল্যাসিকাল অ্যান্টিকুইটির' দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন, বাংলার ও ভারতের নবজাগরণ-যুগের হিউম্যানিস্টরাও ঠিক সেই কারণেই প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির দিকে দৃক্‌পাত করেছিলেন। তাঁদের মনোভাবের মধ্যে এক্ষেত্রে দেশকালভেদে কোন পার্থক্য ছিল না। যে অর্থে ইয়োরোপে নবযুগের আদর্শবাদীদের হিউম্যানিস্ট বলা হত, ঠিক সেই অর্থে এদেশের নবযুগের আদর্শপন্থীদের হিউম্যানিস্ট বলা যেতে পারে। বাংলার হিউম্যানিস্টরাও 'Man is the measure of all things' বলে মনে করতেন, ধর্মের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কারণ ছিল না, হয়ও নি। ধর্মসংস্কার সমাজসংস্কার ও মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁরা যে জীবনদর্শন ও সমাজনীতি এদেশের মানুষের মেধাচ্ছন্ন দৃষ্টিপথে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তার জন্য বা তার সমর্থনে 'tradition' ও 'authority'-র প্রয়োজন তাঁদেরও হয়েছিল। সেই ট্রেডিশন বা ঐতিহ্য নিশ্চয় ইসলাম-সংস্কৃতি ভারতবর্ষে ততটা গড়ে তুলতে পারেনি, যা হিন্দুসংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। তা ছাড়া ইসলামের ঐতিহ্যের আবেদন ভারতের বেশির ভাগ মানুষের মনে কোন সাড়া জাগাত না। তার বাস্তব কারণ, অধিকাংশ ভারতবাসী হিন্দুধর্মী। আরও একটা প্রশ্ন ছিল সেই সময় এবং সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হিন্দু বা ইসলামধর্ম ও সংস্কৃতি ছাড়াও খৃষ্টধর্ম ও সংস্কৃতি তার বিরাট ঐতিহ্য নিয়ে ভারতের দ্বারে হানা দিয়েছিল। ইসলামধর্মের চেয়ে তার ঐতিহ্য আরও প্রাচীন এবং আবেদনও প্রবল। সুতরাং ঐতিহ্য ও 'অথরিটির' সন্ধানে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির বা হিন্দুসংস্কৃতির গঙ্গোত্রীতে যাত্রা করা ছাড়া এদেশের হিউম্যানিস্টদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। তাঁদের এই প্রয়োজন ইয়োরোপীয় হিউম্যানিস্টদের ক্ল্যাসিকাল আদর্শের পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজনের চেয়ে একদিক থেকে আরও অনেক বেশি তীব্র ছিল মনে হয়; কারণ

একাধিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সম্মুখীন হতে হয়নি তাঁদের। বাংলার ও ভারতের হিউম্যানিস্টদের তাই হতে হয়েছিল। তাঁরা তাই যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন যে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির লুপ্ত ও বিস্মৃত ঐতিহ্য বা ভাবসম্পদ পুনরুদ্ধার করে, এদেশের আত্মচেতনাহীন ঘুমন্ত মানুষকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। ভারতের 'ক্ল্যাসিকাল' ও তার চেয়েও প্রাচীন যুগের দিকে ভারতীয় ও বাঙালী হিউম্যানিস্টরা 'যুগোপযোগী' আদর্শের সন্ধানে ফিরে তাকিয়ে ঐতিহাসিক যুগসম্মত কর্তব্যই পালন করেছিলেন। মৃত 'কাল্ট', মৃত আদর্শ বা নীতি, আধুনিক যুগে অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য। কেবল ধর্মের বা প্রাচীনতার খাতিরে, তার দিকে তাঁরা ফিরে তাকাননি, অথবা তাকে পুনরুজ্জীবিত করে আবার মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করেননি। নবযুগের মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রেরণা দিতে পারে, এমন সব আদর্শ ও নীতি তাঁরা প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং তার জন্য মধ্যযুগের সনাতন ও শাস্ত্রীয় ধর্মের অনেক সঞ্চিত আবর্জনাস্তূপ তাঁদের পরিষ্কার করতে হয়েছিল। হিন্দুধর্মের বা হিন্দুসংস্কৃতির তথাকথিত 'পুনরভ্যুত্থানের' সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। রামমোহন তাই একেশ্বরবাদ, নিরাকার ঈশ্বর ও ব্রাহ্মধর্মের উৎস সন্ধানে প্রাচীন ভারতের বেদ-উপনিষদের যুগে ফিরে গিয়েছিলেন এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের হাতিয়ার দিয়েই তিনি সহমরণের মতন শাস্ত্রীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কেবল নিজে এই ঐতিহ্য আবিষ্কার করেই তিনি সন্তুষ্ট হননি। বেদান্ত উপনিষদ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে, ছাপাখানায় ছাপিয়ে পুস্তকাকারে তিনি বিনামূল্যে বিতরণও করেছিলেন। ছাপাখানার দৌলতে ইয়োরোপের হিউম্যানিস্টরাও পুরোহিত-যাজক-শাস্ত্রকারের কুক্ষিগত পুথিবন্দী জ্ঞানভাণ্ডার ও ধর্মের গোপন বাণীর সমস্ত রহস্য সাধারণ মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পেত্রার্ক বা এরেসমুসের মতন বিখ্যাত হিউম্যানিস্টরা তাঁদের কালে 'মাতৃভাষাকে' শ্রদ্ধা করতে শেখেননি। বাংলার হিউম্যানিস্টরা ক্ল্যাসিকাল ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেও সর্বদাই মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। গোড়া থেকেই মাতৃভাষার বাহনে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির ভাবসম্পদ সকলের কাছে পরিবেশন করার দুরূহ সঙ্কল্প গ্রহণ করে, বাংলার হিউম্যানিস্টরা নবজাগরণের যে ঢেউ তুলেছিলেন, ইয়োরোপের হিউম্যানিস্টরা তাঁদের 'proud latinity'-র (Huizinga) জন্য প্রথম দিকে তা পারেননি।

বাংলার এরেজমুস রামমোহন, 'Erasmus of Rotterdam'-এর চেয়ে আরও বেশি দূরদর্শী ও মানবমুখী হিউম্যানিস্ট ছিলেন, কারণ এরেজমুস আর রামমোহনের যুগের মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক।

রামমোহনের মতন বিদ্যাসাগরও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের হাতিয়ার দিয়ে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছিলেন। মাতৃভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধি বিদ্যাসাগরের জপতপধ্যান ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রের ও সাহিত্যের পাণ্ডিত্যে গর্ববোধ করে তিনিও মাতৃভাষাকে অনাদর করেননি। তার সাহিত্যিক সম্পদ আহরণ করে তিনি মাতৃভাষার সকলের রসাস্বাদনের উপযোগী করে বিতরণ করেছেন। এমনকি মাতৃভাষার সংস্কৃত ব্যাকরণ পর্যন্ত অভিনব রীতিতে রচনা করে তিনি তার চাবিকাঠি সকলের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছেন। বিদ্রোহী ডিরোজীয়ানদের অগ্রগণ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনও সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রসাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচীন সংস্কৃতির সম্পদ মাতৃভাষায় পরিবেশন করার আগ্রহ তাঁরও যথেষ্ট ছিল। দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করে তিনি মাতৃভাষার 'বিদ্যাকল্পদ্রুমের' মতন বিশ্বকোষ রচনারও চেষ্টা করেছিলেন। বাংলার প্রথম সার্থক কথাশিল্পী ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রও একই আদর্শে ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতি ও হিন্দুসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। তার মধ্যে 'গোঁড়া হিন্দুয়ানি'র মনোভাব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 'তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ' ('আধুনিক সাহিত্য') বলেছেন। জানি না, বর্তমান যুগে কজন কথাশিল্পী এই 'বিশেষণ' দাবি করতে পারেন। 'তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ' যিনি তিনি কেবল শিল্পী ছিলেন, চিন্তাশীল মনীষী ছিলেন না, অথবা চিন্তার ভাণ্ডারে তাঁর কোন দান ছিল না, এমন কথা কারও মনে ভুলেও জাগা উচিত নয়। প্রাচীন হিন্দুধর্ম বা হিন্দুসংস্কৃতিকে কি দৃষ্টি দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন তা তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :*

> বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পণ্ডিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ ও কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।

বাংলার নবজাগরণের প্রয়োজনে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির ও হিন্দুসংস্কৃতির

বিস্মৃত ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কারের ঐতিহাসিক তাৎপর্য না বুঝলে বঙ্কিমচন্দ্র কেন, বাংলার অনেক হিউম্যানিস্ট-শ্রেষ্ঠকেও কেবল 'হিন্দু' বলে মনে করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকেও সেই কারণে কেউ-কেউ কেবল 'হিন্দুই' মনে করেছেন। বাংলার রেনেসাঁসকালীন হিউম্যানিজমের এই বিচিত্র ধারাই রবীন্দ্রপ্রতিভার মহাসমুদ্রে গিয়ে মিশেছে এবং সাহিত্যে শিল্পকলায় মানবচিন্তায় ও বিশ্বমানবিকতায় তার সার্থক প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভাও তার অফুরন্ত প্রেরণার উৎস পেয়েছিল কোথায়? সেই প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির গঙ্গোত্রীতে। তাই রবীন্দ্রনাথ কেবল শ্রেষ্ঠ শিল্পী বা কবি নন, শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্টও।

বাংলাদেশের এই বিখ্যাত হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে আর একশ্রেণীর হিউম্যানিস্টদেরও নাম করতে হয়। তাঁরা হলেন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিত ও স্কলার, যাঁরা যথার্থ হিউম্যানিস্ট-সুলভ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন পুথি-পাণ্ডুলিপির পুনরনুসন্ধানে সোৎসাহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং যাঁদের সেই অসীম উদ্দীপনা, অনুসন্ধিৎসা, ধৈর্য ও শ্রমের নিদর্শন বাংলার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ও বিদ্যায়তনে (এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিশ্বভারতী) স্তূপীকৃত অবস্থায় দেরাজ-বন্দী হয়ে আছে। বাংলার নবজাগরণের আলোচনায় সাধারণত তাঁরা উপেক্ষিত হয়েছেন এবং প্রকৃত হিউম্যানিস্ট বিদ্যাজীবী হওয়া সত্ত্বেও যোগ্য সমাদর বা স্বীকৃতি পাননি। অথচ ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের বিরাট অধ্যায় জুড়ে রয়েছে এই 'manuscript-hunting'-এর কাহিনী, এইসব পণ্ডিত ও স্কলারদের কীর্তিকথা। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়েও এঁরা স্থান পাননি। তারও কারণ একই মনে হয়, রেনেসাঁস ও হিউম্যানিজম সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রত্যয়গত বিভ্রান্তি। রেনেসাঁসের ইতিহাসে এর গুরুত্ব কতখানি তা সিমণ্ডসের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়:[৭]

Manuscripts were worshipped as reliques from the Holy Land had been worshipped a few generations before. What is most remarkable about this age of scholarship is the enthusiasm which pervaded all classes. Popes and princes, captains of adventure and peasants, noble ladies and the leaders of demi-monde, alike became scholars The Aldi, the Stephani, and Froben toiled by night and day, employing scores of scholars, men of supreme devotion and of mighty brain, whose work it was to ascertain the right reading of sentences, to

P29222.

accentuate, to punctuate, to commit to the press, and to place beyond the reach of monkish hatred or of envious time that everlasting solace of humanity which exists classics

সিমণ্ড্‌স যে 'men of supreme devotion and of mighty brain'-এর কথা বলেছেন, উনিশ শতকের বাংলাদেশে তার অভাব ছিল না। তাঁরা অনেক হয়ত স্বল্পবিত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু বিত্তের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁরা বিদ্যাসাধনায় যে শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা রেনেসাঁসের যুগের আদর্শের জন্যই সম্ভব হয়েছিল, এযুগে সম্ভব নয়। তাঁদের নাম করে বিস্তারিত আলোচনা করার, অথবা তাঁদের আবিষ্কৃত পুথি-পাণ্ডুলিপির বিবরণ, সম্পাদনার ও মুদ্রণের কাহিনী বর্ণনা করার অবকাশ নেই এখানে। শুধু এইটুকু বলা যায়, যে কোন দুঃসাহসিক পর্যটকের অভিযানের তুলনায় এই সব পণ্ডিত ও স্কলারদের বিদ্যাভিযানের ইতিহাস বেশি ছাড়া কম রোমাঞ্চকর নয়। সেই দুর্গম বিদ্যাসাধনার অভিযানে তাঁরা যদি কৃতকার্য না হতেন, যদি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে কাব্য নাটক দর্শন শিল্পকলাশাস্ত্র ইত্যাদি আহরণ করে, মাতৃভাষার বাহনে, টীকা-টিপ্পনিসহ মুদ্রিত পুস্তকাকারে আমাদের কাছে পরিবেশন না করতেন, তাহলে আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য সাহিত্যশিল্পরস কিছুই জানতে বা উপভোগ করতে পারতাম না। ইতিহাস না জানলে আমাদের জাতীয় গৌরববোধ ও আত্মচেতনা জাগ্রত হত না এবং প্রাচীন সাহিত্য শিল্পকলার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হলে আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টিও সম্ভব হত না। তা না হলে কেবল ইয়োরোপীয় যন্ত্র কলকারখানা বা ভাবাদর্শের স্পর্শে বাংলার ও বাঙালীর বা ভারতের নবজাগরণও সম্ভব হত না।

---

১ J. A. Symonds A Short History of the Renaissance in Italy (London 1893). Pp. 2-3.
Joseph A. Schumpeter History Economic Analysis (London 1955). P. 79.
Alfred Von Martin Sociology of the Renaissance (London 1945). P. 21.

২ Symonds Op. Cit. P. 6. Italics লেখক-কৃত

৩ Schumpeter Op. Cit. P. 79, footnote (2). Italics লেখক-কৃত

৪ রবীন্দ্রনাথ : আধুনিক সাহিত্য, ২য় সং, পৃঃ ৮—

৫ Symonds Op. Cit. Pp. 9-10.

শ্রুতি প্রসঙ্গ

রাজ্যেশ্বর মিত্র

"শ্রবণাৎ শ্রুতয়ো মতাঃ"—রত্নাকর-রচয়িতা শার্ঙ্গদেবের উক্তি, শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ধ্বনি হচ্ছে শ্রুতি। সঙ্গীতের পরিধি অনুযায়ী বাইশটি শ্রুতিই যথেষ্ট বলে পরিগণিত হয়েছে। এই বাইশটি শ্রুতি সাতটি স্বরে বিস্তৃত হয়ে আছে। কিন্তু এই বাইশটি শ্রুতি গলায় পর পর দেখানো অসম্ভব, সুতরাং বীণার সাহায্যে এই শ্রুতিগুলিকে পরিস্ফুট করা হয়েছে।

এই উপলক্ষ্যে দু'টি বীণার পরিকল্পনা করা হয়েছে—একটি ধ্রুববীণা আর একটি চলবীণা। দুটি বীণার আকার সমান হতে হবে এমন কথা নয় কিন্তু নাদসাম্য হওয়া চাই। তবে আকারে সদৃশ হলেই বোধহয় জিনিষটা বোঝবার পক্ষে ভালো হয়। প্রত্যেকটিতে বাইশটি করে তন্ত্রী স্থাপন করতে হবে। তার মধ্যে প্রথম তারটি খুব নিচু সুরে বাঁধতে হবে যাতে একটা সুর সুপরিস্ফুট হয় বা তার সাঙ্গীতিক ধ্বনিটুকু বজায় থাকে। তদপেক্ষা নিচু হলে তার কোন সাঙ্গীতিক মূল্যই থাকবে না, অতএব সাঙ্গীতিক শ্রুতিবিচারে তার কোন সার্থকতা নেই। তারপরে একটু একটু চড়িয়ে বাইশটি তার বাঁধা হবে অর্থাৎ প্রথম তার থেকে দ্বাবিংশতম তার পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর চড়ে যাবে; কিন্তু এই ক্রমতার গতিটি যেন যথাযথভাবে বজায় থাকে অর্থাৎ দু'টি তারের মধ্যে তৃতীয় ধ্বনির অবকাশ না থাকে। এই এক একটি তারের শব্দকেই একটি শ্রুতি বলা হয়।

দু'টি বীণা তো শ্রুতি হিসেবে বাঁধা হ'ল; এখন পর্দ্দা অর্থাৎ সপ্তক নির্ণয় করতে হবে। প্রথম তার থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ তারটি হল ষড়জ অর্থাৎ সা; ষড়জ স্বর চতুঃশ্রুতিক, ষড়জের পর থেকে তৃতীয় তার হ'চ্ছে ঋষভ বা রে। বীণার সপ্তম তারটি হ'চ্ছে রে। ঋষভ ত্রিশ্রুতিক। রে'র পর থেকে দ্বিতীয় তারটি অর্থাৎ বীণার প্রথম থেকে নবম তারটি হ'চ্ছে গান্ধার। গান্ধার দ্বিশ্রুতিক। গান্ধারের পর থেকে চতুর্থ তারটি অর্থাৎ প্রথম থেকে তের নম্বরের তারটি হ'চ্ছে মধ্যম। মধ্যম চতুঃশ্রুতিক। মধ্যমের পর থেকে চতুর্থ তারটি অর্থাৎ প্রথম থেকে সতেরো নম্বরের তারটি হ'ল পঞ্চম। পঞ্চমও

চতুঃশ্রুতিক। পঞ্চমের পর থেকে তৃতীয় অর্থাৎ কুড়ি নম্বরের তারটি হ'ল ধৈবত বা ধা। ধৈবত ত্রিশ্রুতিক। ধৈবতের পর থেকে দ্বিতীয় তার অর্থাৎ বাইশ নম্বরের তারটি হ'ল নিষাদ নি। নিষাদ দ্বিশ্রুতিক।

দুটি বীণাই এখন একরকমভাবে বাঁধা হ'ল। এর মধ্যে যে বীণাটি এই-ভাবেই সুর বাঁধা অবস্থায় রইল সেটি হচ্ছে ধ্রুববীণা অর্থাৎ এর আর নড়চড় নেই এবং শ্রুতিনির্ণয় করবার জন্য এই বীণাটিই আদর্শ বলে গণ্য করা হবে। অপর বীণাটির নাম দেওয়া হয়েছে চলবীণা কেননা এই বীণায় সুর নামানো যায়। এতে পর্দা স্থাপন করে সাতটি সুরের অবস্থান নির্ণয় করতে হবে।

চলবীণার যে সাতটি স্বর স্থাপন করা হয়েছে সেগুলিকে কথঞ্চিৎ শিথিল করে তাদের ঠিক আগের তারের সঙ্গে মিলিয়ে প্রথম সারণাটি (পর্দা) স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ "সা" স্বরটি চার নম্বর তারে স্থাপিত হয়েছে। এই চার নম্বর তারটিকে নামিয়ে তৎর অব্যবহিত পূর্বের অর্থাৎ তিন নম্বর তারের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। এইরূপে সাতটি স্বরকে তাদের অব্যবহিত পূর্বের তারের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে প্রথম সারণাটি স্থাপন করতে হবে। অথবা সারণা স্থাপন করবার পরও তারগুলিকে এইভাবে বাঁধা যেতে পারে। এতে যদি সুবিধা হয় তবে এতেও দোষ নেই। তাহলে দাঁড়ালো এই ধ্রুববীণায় যে তারটি "সা", চলবীণায় সে তারটি একশ্রুতি কম হবে সারণা স্থাপনের সময়। এইভাবে দুটি করে শ্রুতি কমালে চলবীণায় আমরা ধা এবং রে অবিকৃতভাবে পাব, তিনটি কমালে পা এবং সা এবং চারটি কমালে মধ্যম, গান্ধার এবং নিষাদ; তাহ'লে চারটি সারণায় মোটমাট আমরা ধ্রুববীণায় বাইশটি শ্রুতিই পাচ্ছি, কিন্তু চারটি শ্রুতি পর্য্যন্ত তারের অপকর্ষ করা সম্ভব, তার চেয়ে নিচে হ'লে তার রঞ্জকত্ব বজায় থাকবেনা, অতএব এইটিই চলবীণার তার নামানোর সীমারেখা।

এইখানে টীকাকার সিংহভূপাল মতঙ্গের উল্লেখ করে বলছেন—"দ্বিতীয় সারণায়াং শ্রুতিচতুষ্টয়লাভঃ। তৃতীয়ায়াং ষট্‌শ্রুতিলাভঃ। চতুর্থ্যাং দ্বাদশশ্রুতি-লাভঃ।" এইভাবে বাইশটি শ্রুতি লাভ হ'ল।

এটা কি ভাবে হ'ল সেটা বোঝা দরকার। দ্বিতীয় সারণা যখন স্থাপন করা হ'চ্ছে তখন দুই শ্রুতির অপকর্ষ হচ্ছে অর্থাৎ বাইশ নম্বরের তারকে কমিয়ে কুড়ি নম্বরের সঙ্গে মেলানো হচ্ছে। এই কুড়ি নম্বর হ'চ্ছে ধৈবত। এইখানে নিষাদ

থেকে ধৈবতে যে দুটি শ্রুতি রয়েছে সে দুটিকে লাভ করা গেল। এরপর ধা, পা এবং মা থেকে দুই শ্রুতি কমিয়ে আমরা আর কোনো শুদ্ধ স্বরে পৌঁছোচ্ছি কিন্তু গান্ধারটি দুই শ্রুতি নিচে নামবার পর শুদ্ধ রে-তে আসছে। এইখানে গান্ধার এবং রে-র মাঝামাঝি আরও দুটি শ্রুতিকে আমরা পাচ্ছি। এইভাবে দ্বিতীয় সারণায় আমাদের শ্রুতিচতুষ্টয় লাভ হচ্ছে। একইভাবে তৃতীয় সারণা স্থাপনকালে তিনটি শ্রুতির অপকর্ষ ঘটিয়ে আমরা শুদ্ধ পঞ্চম ও ষড়জ পাব। এই অপকর্ষের ফলে ধৈবত এবং পঞ্চমের মধ্যবর্তী আরো তিনটি শ্রুতি আর ঋষভ এবং ষড়জের মধ্যবর্তী আরো তিনটি শ্রুতি অর্থাৎ ছ'টা শ্রুতি লাভ করছি। এইভাবে তৃতীয় সারণায় ষটশ্রুতি লাভ হচ্ছে। অনুরূপভাবে চতুর্থ সারণা স্থাপনকালে চারটি শ্রুতির অপকারের ফলে আমরা শুদ্ধ মধ্যম, গান্ধার এবং নিষাদ পাচ্ছি। পঞ্চম এবং মধ্যমের মধ্যে চারটি শ্রুতি বর্তমান; আরো চারটি শ্রুতি রয়েছে মধ্যম এবং গান্ধারের মধ্যে। এই চারে চারে আটটি হ'ল আর ষড়জ থেকে নিষাদের মধ্যে চার শ্রুতির ব্যবধান। অতএব এক্ষেত্রে আমরা বারোটি শ্রুতি লাভ করছি। এইভাবে চারটি সারণার দ্বারা দিয়ে সম্পূর্ণ বাইশটি শ্রুতিই পাওয়া যাচ্ছে।

এই শ্রুতি থেকেই ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতটি স্বরের উৎপত্তি হয়েছে। সংকেতে এদের সা, রে, গা, মা, পা, ধা এবং নি বলা হয়। এই ব্যাপারটুকু নিয়ে বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ কিঞ্চিৎ বাগ-বিস্তার করেছেন। নৈয়ায়িকের যুক্তি অনুসারে তিনি পঞ্চপক্ষের সম্ভাবনার উল্লেখ করে কোনটি গ্রাহ্য তার বিচার করেছেন। মোদ্দা কথা হ'ল এই যে ক্ষীর যেমন দধিরূপে অবস্থান করে তেমনি শ্রুতিগণ স্বররূপে অবস্থান করছে এবং অন্ধকারে অবস্থিত ঘটাদির যেমন প্রদীপ থেকে অভিব্যক্তি ঘটে তেমনি শ্রুতি থেকে স্বরের অভিব্যক্তি ঘটছে। কল্লিনাথ এবং সিংহভূপালও এই বিচার তাঁদের টীকায় উদ্ধৃত করেছেন।

এই যে শ্রুতি থেকে উৎপন্ন স্বর এর লক্ষণ কি? স্বর এবং শ্রুতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে শ্রুতির অনন্তর যা পাওয়া যাচ্ছে সেটিই স্বর। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে আগে শ্রুতি কি তাই বল, তার পরে তার অনন্তর কি হচ্ছে তার কথা। প্রথমটা বলি। তারে আঘাত করবার সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্বনি বা রণনা উত্থিত হ'ল তা হচ্ছে শ্রুতি। তারপরে যে অনুরণনটুকু হ'চ্ছে

সেটিই স্বর। এই অনুরণনটি প্রথমোত্থিত রণনের চেয়ে স্নিগ্ধ। এই অনুরণনটি স্বতই শ্রোতৃচিত্তকে রঞ্জন করছে বলেই এর নাম স্বর।

বাইশটি শ্রুতির মধ্যে যে যে শ্রুতিতে স্বর স্থাপন করা হয়েছে সেগুলি রঞ্জকত্ব গুণসম্পন্ন। কিন্তু যদি স্বরের স্বতই রঞ্জন করবার ক্ষমতা থাকে অর্থাৎ তারা স্বাধীনভাবেই স্বীয় সত্তাকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে এই শ্রুতিগুলির প্রয়োজনীয়তা কি? অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম, পঞ্চম, এইগুলি চতুঃশ্রুতিক, ঋষভ ধৈবত ত্রিশ্রুতিক এবং গান্ধার, নিষাদ দ্বিশ্রুতিক, এই রকম হবার সার্থকতা কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে পূর্বশ্রুতির অপেক্ষা রেখেই চতুঃশ্রুতিক বা ত্রিশ্রুতিক প্রভৃতি স্বর নির্ণয় করা হয়। যদি পূর্বে কোন শ্রুতি না থাকে তাহলে কিসের অপেক্ষায় এই চতুর্থ্যাদির ব্যবহার হবে? যে কোন একটি শ্রুতি অন্যান্য একটি স্বর নয়, কিন্তু একটি স্বরান্তর বটে। এই স্বরান্তরগুলি ক্রমে একটি নির্দিষ্ট স্বরে পূর্ণতা লাভ করছে এবং তারপর আবার কথঞ্চিৎ উচ্চতা ঘটলে আবার একটি শ্রুতির প্রয়োজন হ'চ্ছে। এইভাবে পুনরায় স্বরান্তরের উৎপত্তি হ'চ্ছে। এই নিয়মে বাইশটি শ্রুতিতে গঠিত চতুঃশ্রুতি, ত্রিশ্রুতি এবং দ্বিশ্রুতির গোষ্ঠিগুলি একটি সপ্তকে স্বরবৃত্তকে সম্পূর্ণ করছে। শ্রুতি এবং স্বরের সমন্বয়ের কথা ভেবেই মতঙ্গ পঞ্চপক্ষের অবতারণা করে বলেছেন যে শ্রুতি থেকেই স্বরের অভিব্যক্তি ঘটছে।

শ্রুতির পাঁচটি জাতি—দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু, এবং মধ্যা। ষড়জস্বরে চারটি জাতির অবস্থিতি, দীপ্তা, আয়তা, মৃদু এবং মধ্যা, ঋষভে তিনটি অবস্থান করে—করুণা, মধ্যা এবং মৃদু, গান্ধারে দুটি—দীপ্তা, আয়তা। মধ্যমে চারটি—দীপ্তা, আয়তা, মৃদু, মধ্যা, পঞ্চমে চারটি—মৃদু, মধ্যা, আয়তা, করুণা। ধৈবতে তিনটি—করুণা, আয়তা, মধ্যা। নিষাদে দুটি—দীপ্তা এবং মধ্যা। এইভাবে বাইশটি শ্রুতিতে পাঁচটি জাতি পর পর সাজানো রয়েছে।

এই সব জাতিরও আবার অন্তর জাতি আছে। সেগুলি এইরকম—

দীপ্তা—তীব্রা, রৌদ্রী, বজ্রিকা, উগ্রা।

আয়তা—কুমুদ্বতী, ক্রোধা, প্রসারিণী, রোহিণী।

করুণা—দয়াবতী, আলাপিনী, মদন্তিকা।

মৃদু—মন্দা, রতিকা, প্রীতি, ক্ষিতি

মধ্যা—ছন্দোবতী, রঞ্জনী, মার্জনী, রক্তিকা, রম্যা, ক্ষোভিনী।

এই অন্তরজাতিগুলি কি ভাবে সাতটি স্বরে বর্ত্তমান সেটি এইভাবে দেখানো হয়েছে :

ষড়জ—তীব্রাজাতীয় দীপ্তা, কুমুদ্বতীজাতীয় আয়তা, মন্দাজাতীয় মৃদু এবং ছন্দোবতী জাতীয় মধ্যা

ঋষভ—দয়াবতীজাতীয় করুণা, রঞ্জনীজাতীয় মধ্যা, রতিকাজাতীয় মৃদু

গান্ধার—রৌদ্রজাতীয় দীপ্তা, প্রসারিণীজাতীয় আয়তা

মধ্যম—বজ্রিকাজাতীয় দীপ্তা, প্রসারিণীজাতীয় আয়তা, প্রীতিজাতীয় মৃদু, মার্জনী জাতীয় মধ্যা

পঞ্চম—ক্ষিতিজাতীয় মৃদু, রক্তিকাজাতীয় মধ্যা, সন্দীপনীজাতীয় আয়তা, আলাপনী জাতীয়া করুণা

ধৈবত—মদন্তীজাতীয় করুণা, রোহিণীজাতীয় আয়তা, রম্যাজাতীয়া মধ্যা

নিষাদ—উগ্রাজাতীয় দীপ্তা, ক্ষোভিনীজাতীয় মধ্যা

এই সব নামকরণের উদ্দেশ্য কি বোঝাবার জন্য সিংহভূপাল বলছেন যে এই সব নামের শ্রুতি শুনলে মনে সেই রকম বিকার ঘটবে। এইটি সূচনা করবার জন্যই শ্রুতি জাতির নিরূপন করা হয়েছে। যেমন দীপ্তাজাতীয় শ্রুতি কর্ণগোচর হলে মনে প্রদীপ্তভাবের উদয় হবে। এই রকমভাবে অপরাপর জাতি অনুসারে মনে সেই রকম ভাবান্তর উপস্থিত হবে।

স্বরাদির রসব্যঞ্জনা উপলক্ষ্যে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু এই উক্তির বহুক্ষেত্রে মিল নেই। যেমন গান্ধার এবং নিষাদে দীপ্তাজাতীয় শ্রুতি বিদ্যমান কিন্তু এদুটি স্বর করুণ রসে প্রযুক্ত হচ্ছে। এই সব ব্যাপারের তেমন প্রতীতি হবার মত ব্যাখ্যা নেই।

এই সব ষড়জাদিস্বর মন্দ্র-মধ্য-তার স্থানভেদে তিন প্রকার। এই ভেদ কিন্তু তাত্ত্বিক অর্থাৎ মূল প্রকৃতির দিক থেকে নয়, ভেদটি স্থানকল্পিত। যেমন দেবদত্ত ত্রিতল প্রাসাদের একতলা, দোতলা এবং তেতলার অবস্থান কালে সেই দেবদত্তই থাকে কিন্তু স্থান পরিবর্তনে তার অবস্থানভেদ হয় তেমন স্বরগুলিও আসলে পরিবর্তিত হয় না কিন্তু অবস্থানের ভেদ হতে পারে। অতএব মন্দ্রসপ্তকে যে ষড়জ, মধ্যসপ্তকে বা তার সপ্তকে তার প্রকৃতি একই কিন্তু যেটুকু তফাৎ তা ঐ স্থানপরিবর্তনে।

শুদ্ধ স্বর নিরূপনের পরে বারটি বিকৃত স্বরের আলোচনা আবশ্যক।

ষড়জাদি স্বর এবং শ্রুতির যে বিন্যাস পূর্বে দেখানো হয়েছে সেইটি হ'চ্ছে ষড়জ-গ্রাম। এইটিই মুখ্যগ্রাম বলে স্বীকৃত।

ষড়জ "চ্যুত" এবং "অচ্যুত"-এই দুইভাবে বিকৃত হয়। সাধারণভাবে ষড়জ হ'চ্ছে চতুঃশ্রুতিক। এর প্রথম শ্রুতি তীব্রা, দ্বিতীয় কুমুদ্বতী, তৃতীয় মন্দা এবং চতুর্থ ছন্দোবতী। ষড়জ এরই চতুর্থ শ্রুতিতে অর্থাৎ ছন্দোবতীতে স্থাপিত। এই ছন্দোবতী থেকে প্রচ্যুত হলেই ষড়জকে চ্যুত বলে গণ্য করতে হ'বে। ষড়জ যখন এইভাবে প্রচ্যুত হয়ে তৃতীয় শ্রুতি মন্দায় অবস্থান করে এবং ষড়জের প্রথম শ্রুতিকে অধিকার করে তখন তাকে বলে ষড়জ-সাধারণ, ষড়জ-সাধারণে ষড়জ স্বস্থান অর্থাৎ চতুর্থ শ্রুতি ছন্দোবতী থেকে প্রচ্যুত হয়ে তৃতীয় শ্রুতি "মন্দা"য় অবস্থিত হওয়ায় তার বিকৃতি ঘটল। এই বিকৃত ষড়জ হ'চ্ছে "চ্যুত ষড়জ"।

ষড়জের চারটি শ্রুতির মধ্যে প্রথম দুটি শ্রুতি নিষাদ আশ্রয় করলে সেই নিষাদকে কাকলী বলা হয়। নিষাদ দ্বিশ্রুতিক। এই দুটি শ্রুতি হ'চ্ছে উগ্রা এবং ক্ষোভিনী। এই দু'টির সঙ্গে ষড়জের প্রথম দুই শ্রুতি তীব্রা এবং কুমুদ্বতীর যোগ হয়ে নিষাদ কুমুদ্বতীতে অবস্থিত হলে নিষাদের কাকলীত্ব ঘটে। এই অবস্থায় ষড়জ তার চতুর্থ শ্রুতি অধিকার করে থাকলেও তাকে বিকৃত বলে গণ্য করতে হ'বে। এই রকম ষড়জকে "অচ্যুত-ষড়জ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ষড়জ তার আসল স্থান অর্থাৎ ছন্দোবতী থেকে চ্যুত হয় নি, অচ্যুত অবস্থাতেই আছে এবং ধ্বনির বিকারও ঘটছে না। তাহলে কিভাবে বিকৃত হল? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে যদিও পূর্বশ্রুতি-হীনত্বে তৎস্থানস্থিতিত্বহেতু ধ্বনিবিকার ঘটছে না তথাপি নিষাদ স্বাভাবিক ভাবে দ্বিশ্রুতি অধিকার করে থাকলে চতুশ্রুতি হেতু ষড়জের আয়তত্ব বজায় থাকে। যখন কাকলীত্ব হেতু নিষাদ ষড়জের দ্বিতীয় শ্রুতিতে অবস্থান করে তখন ষড়জের দ্বিশ্রুতিত্ব ঘটে এবং এতে অনায়তত্ব প্রতীয়মান হয়। এই কারণে "অচ্যুতষড়জ"ও বিকৃত বলে গণ্য করতে হবে।

অতএব ষড়জের দু'টি বিকৃতি ঘটে—চ্যুত এবং অচ্যুত।

এর পর ঋষভের বিকৃতি,—ষড়জ সাধারণে ঋষভ ষড়জের অন্তিম শ্রুতি গ্রহণ করে। ঋষভ ত্রিশ্রুতিক, কিন্তু ষড়জের শেষ শ্রুতি ছন্দোবতীকে আশ্রয় করায় এটি চতুঃশ্রুতিক হয়ে গেল অথচ ধ্বনির দিক থেকে কোন বিকার ঘটল না,

—

কেননা ঋষভ তার স্বস্থান অর্থাৎ শেষশ্রুতি "রক্তিকা"কে অধিকার করে আছে। তথাপি এই চতুঃশ্রুতিত্বের জন্য ঋষভ এক্ষেত্রে বিকৃত বলে পরিগণিত হচ্ছে।

অতএব ঋষভের একটি বিকৃতি আমরা পাচ্ছি।

এরপর গান্ধারের বিকৃতি। গান্ধার দ্বিশ্রুতিক। এই দু'টি হচ্ছে রৌদ্রী এবং ক্রোধা। এর সঙ্গে যদি মধ্যমের প্রথম শ্রুতি "বজ্রিকা"র যোগ হয় তাহলে মধ্যমের সাধারণত্ব ঘটে। মধ্যম-সাধারণ হ'লে গান্ধার দ্বিশ্রুতিকের স্থলে ত্রিশ্রুতিক হওয়ায় বিকৃত হয়। গান্ধারের আরও একটি বিকৃতি ঘটে। গান্ধার যখন মধ্যমের আদি শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করে তখন তার চতুঃশ্রুতিত্ব ঘটে। এই বিকৃতি হ'লে গান্ধারকে "অন্তর গান্ধার" নামে অভিহিত করা হয়। অতএব গান্ধারের দুটি বিকৃতি—একটি মধ্যম সাধারণের, অপরটি অন্তর গান্ধারে।

অতঃপর মধ্যমের বিকৃতি। মধ্যম চতুঃশ্রুতিক। ষড়জের যেমন চ্যুত অচ্যুত বিকৃতি ঘটে মধ্যমেরও সেই রকম দু'টি বিকৃতি হয়। মধ্যম সাধারণ হ'লে অর্থাৎ গান্ধার কর্তৃক মধ্যমের শ্রুতি অধিকৃত হলে মধ্যমের ত্রিশ্রুতিত্ব-হেতু বিকৃতি ঘটে। গান্ধার হ'লে মধ্যম দ্বিশ্রুতিক হবার দরুণও একটি বিকৃতি ঘটছে। এটি হ'চ্ছে অচ্যুত মধ্যম। অতএব এক্ষেত্রেও মধ্যমসাধারণ এবং অন্তর গান্ধার হবার দরুণ মধ্যমের দুটি বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—চ্যুত মধ্যম এবং অচ্যুত মধ্যম।

এরপর পঞ্চমের বিকৃতি। পঞ্চম চতুঃশ্রুতিক। এগুলি ক্রমান্বয়ে হচ্ছে ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী এবং আলাপিনী। পঞ্চম, দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রুতি অর্থাৎ সন্দীপনীতে অবস্থান করলে সম্পূর্ণ স্বরগ্রামকে মধ্যমগ্রাম বলা হয়। এই মধ্যমগ্রামে পঞ্চম ত্রিশ্রুতিক হওয়ায় বিকৃত হয়। এই ত্রিশ্রুতিক পঞ্চমের সঙ্গে মধ্যমের অন্তিম শ্রুতির যোগ হলে এই চতুঃশ্রুতিত্বও একটি বিকৃতি বলে পরিগণিত হয়। অতএব পঞ্চমের দুটি বিকৃতি পাওয়া গেল ; একটি মধ্যমগ্রামে অপরটি মধ্যমের অন্তিম শ্রুতিগ্রহণে।

এর পর ধৈবতের বিকৃতি। মধ্যমগ্রামে পঞ্চমের তৃতীয় শ্রুতিতে অবস্থিতি হেতু পঞ্চমের অন্তিম শ্রুতি ধৈবতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ধৈবত চতুঃশ্রুতিক হচ্ছে। এটি একটি বিকৃতি ; কেননা স্বাভাবিকভাবে ধৈবত ত্রিশ্রুতিক। অতএব ধৈবতের একটিই বিকৃতি ঘটছে।

অতঃপর নিষাদের বিকৃতি। পূর্বেই বলা হয়েছে ষড়জ সাধারণে নিষাদ ষড়জের প্রথম শ্রুতিতে অবস্থান করে। নিষাদ স্বাভাবিকভাবে দ্বিশ্রুতিক। ষড়জ সাধারণে এর ত্রিশ্রুতিত্ব ঘটায় বিকৃতি হচ্ছে আবার ঋষকলীয়ের কথাও পূর্বে উক্ত হয়েছে। এদিক থেকেও নিষাদের আর একটি বিকৃতি ঘটছে। অতএব নিষাদের দুটি বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে সবশুদ্ধ বারোটি বিকৃতির কথা বলা হ'ল। এর সঙ্গে সাতটি শুদ্ধ স্বরও রয়েছে। অতএব শুদ্ধ সপ্ত এবং বিকৃত দ্বাদশ সমেত উনিশটি স্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

স্বরের বিষয় অবশ্য আরো অনেক আছে, কিন্তু শ্রুতি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। অনেকে শ্রুতির বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে বলে বিদ্রূপ করেন, অনেকে একে কুসংস্কার বলেন কিন্তু নামকরণের পিছনে যুক্তি রয়েছে বৈকি। প্রত্যেক শ্রুতির নাম না থাকলে স্বরে বিকৃতিগুলি দেখানো সম্ভব হ'ত না। বরঞ্চ এমন সুন্দর নামকরণের জন্য সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই নামকরণ আদৌ কুসংস্কার-জনিত নয়।

বর্তমান যুগে এই গ্রাম বা শ্রুতি প্রসংগের আলোচনা হয়তো না করলেও চলে, কিন্তু তা বলে এর প্রয়োজনীয়তা নেই এমন নয়। স্বর এবং স্বরান্তর আজও রয়েছে কিন্তু আজ আমরা এই স্বরগ্রামকে পূর্বের মত বিচার করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। আজকের সাঙ্গীতিক শিক্ষা কারিগরি শিক্ষার মত "মেকানিকাল" ভাবেই চলেছে; তত্ত্বানুসন্ধান আমরা করি না। করলে তার আবশ্যকতা বিশেষভাবেই বোঝা যেত।

আজকের যুগে শ্রুতিনির্ণয়ের জন্য বহু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হয়েছে, কিন্তু সে যুগে সেটি ছিল না। সম্পূর্ণ কানের ওপর নির্ভর করে বাইশটি তার বাঁধা হ'ত এবং তা থেকে স্বর সপ্তক নির্ণয় করা হ'ত। এ কাজটির জন্য যে বিরাট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সেটা বোধ করি, বলাই বাহুল্য।

ইতিবৃত্ত

জীবনানন্দ দাশ

এক দিন কোনো এক আশ্বিনগাছের ডালে সকালের রোদের ভিতর
সোনালি সবুজ এক ডোরাকাটা ব্রাহ্মসে মাকড়কে আমি
একটি মিহিন সুতো নিয়ে দুলে নির্জন বাতাসে
দেখেছি স্বর্গের থেকে পৃথিবীর দিকে এল নেমে,
পৃথিবীর থেকে ক্রমে চ'লে গেল নরকের পানে ;
হয়তো সে উর্ণনাভ নয়,
অগস্ত্যের মতো নানা আমুর সন্ধানে
চোখে তার লেগে ছিল ব্রহ্মার বিস্ময় ।

ঢের আগেকার কথা এই সব—তখন বালক আমি পৃথিবীর কোণে :
অশ্বত্থের ত্রিকোণ পাতায় যেন মনে হত বালিকার মুখ
মিষ্টি হয়ে নেমে আসে হৃদয়ের দিকে,
নদীর ভিতরে জলে যেন তার করুণ চিবুক
স্থিরতর কথা ভাবে—সমস্ত নদীর ঘ্রাণ আরো
অধিক উদ্ভিদ মাটি মাংস—ধূসর হয়ে থাকে ;
যেন আমি জলের শিকড় ছিঁড়ে একদিন হয়েছি মানুষ ;
কাতর আমোদ সব ফিরে চায় আবার আমাকে ।

পৃথিবীর ঘরে তবু ফিরে গিয়ে—অভিভাবনায়
সেগুন কাঠের শক্ত টেবিলের 'পরে

উত্তরসূরী

নীরবে জেলেছি আলো ছিপছিপে ধূর্ত মোমের,
তবুও যখন চোখ নেমে এল বইয়ের ভিতরে
এক—আধ—দুই ইঞ্চি ঘুমের ভিতরে ডুবে গেল,
কঠিন দানব এক দাঁড়াল মুখের কাছে এসে—
যেন আমি অপরাধে বিবর্ণ বালক
উলঙ্গ পরীর চুল—কিংবা তার ঘোটকীর লেজ ভালোবেসে।

তবুও আকাশ থেকে পুনরায়—ধীরে
জলপাই-ধূম্র এক ভোরবেলা উদ্গীরিত হলে
সকলের আগে ক্ষুদ্র জাগরূক বর্তুল দোয়েল
তখনো বাতাস পেয়ে জাগে নাই ব'লে
নদীর কিনার দিয়ে শঙ্খচূড় সাপের মতন
আমার এ-শরীরের ছায়াকে বাঁকিয়ে নিতে গিয়ে
সহসা দেখেছি তুমি কর্কচের মতন আলোকে
খেতকায়া সাপিনীর মতন দাঁড়িয়ে।

রচনাকাল : ১৩৪৩
পরে কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত

রুরুর উক্তি

[Ballade à Double Refrain]

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

Ballade-এ সচরাচর আট লাইনের তিনটি স্তবক থাকে এবং শেষে এতদতিরিক্ত একটি চার লাইনের Envoy স্তবক যোগ করার বিধি আছে। তবে কচিৎ কখনো দশ লাইনের তিনটি স্তবকও লক্ষ্য করা যায় এবং সে রকম ক্ষেত্রে Envoy-টি পাঁচ লাইনের হয়ে থাকে। যেখানে আট লাইনের স্তবক করা হয় সেখানে প্রতিটি স্তবকের বিন্যাস হয় (ক খ ক খ খ গ খ গ)। Ballade à Double Refrain-এ নামেই বোঝা যায় যে, এ বিশেষ এক ধরণের Ballade যার ধুয়া দু'টি। এ কর্মে দু'টি সমগ্র পংক্তিকে ধুয়া হিসেবে ব্যবহার করতে হয় প্রতি স্তবকের চতুর্থ ও অষ্টম লাইনে পারম্পর্যক্রমে। এবং এ দুই ধ্রুবপদপংক্তিকেই সমপ্রভাবে ব্যবহার করতে হ'বে চার লাইনের Envoy অংশেও। সমগ্র কবিতাটির মিলের বিন্যাস এই রকম :

	১ম ধুয়া	২য় ধুয়া
১ম স্তবক—	ক খ ক খ	খ গ খ গ
	১ম ধুয়া	২য় ধুয়া
২য় স্তবক—	ক খ ক খ	খ গ খ গ
	১ম ধুয়া	২য় ধুয়া
৩য় স্তবক—	ক খ ক গ	খ গ খ গ
	১ম ধুয়া	২য় ধুয়া
Envoy—	খ গ	গ গ

১. কে তুমি প্রাচীন ছায়া কৃষ্ণ অক্ষরাথার আড়ালে
অহিফেন-কটু হাত লুব্ধকের মতো পেতে রাখো ?
চেনার চমক নেভে, ছায়া পড়ে দিকের দেয়ালে
সমগ্র সঞ্চার পথ অত্র থেকে পরত্রের সাঁকো—
কে আছে আড়াল ক'রে প্রমদরা চোখ মেলে স্থাখো
সংজ্ঞার বিলুপ্তি-মন্ত্র তোমাকে কি ক'রে দিলো ধ্যানী ?
যতদিন আছি আমি আকাঙ্ক্ষার সুধা নিয়ে থাকো ;
প্রেমের প্রণব, এসো, আজীবন করি কানাকানি।

২. সুপ্তির বনানী-পারে পা দু'খানি যেখানে বাড়ালে
প্রমদরা, আমাকেও সেখানেই 'এসো' ব'লে ডাকো ;
ঘুমের অতীত দেশ, ছায়া-ছায়া কখন ছাড়ালে
সমগ্র সঞ্চারপথ অত্র থেকে পরত্রের সাঁকো ?
অজানা উদ্ভাসে দীপ্ত হ'লো যার গূঢ়তম বাঁকও।
অচেনাকে চিনি চলো ; আমাকেও সঙ্গী করো, রাণী,
নয়তো এ-যৌবনের লীলাকুঞ্জে রূপ-রেণু মাখো !
প্রেমের প্রণব, এসো, আজীবন করি কানাকানি।

সাপ কি শয়তান কোনো জানি নে কে কে ঘুম পাড়ালে
নিয়তিনির্দেশক্রমে কতো সাধ্বী মরে লাখো লাখো
শব কি সুন্দর হয় (অলৌকিক !) নিঃশ্বাস হারালে ?
সমগ্র সঞ্চারপথ অত্র থেকে পরত্রের সাঁকো—

উত্তরসূরী

সাধ্য কি যে আয়ুষ্মতী অমৃততা দিয়ে ভ'রে রাখো ?
তোমাকে করিনি ভোগ এ আক্ষেপ ঘুচবে না জানি
তাই তো অর্ধায়ু-পনে বাঁচিয়েছি দুঃখ করি নাকো।
প্রেমের প্রণব, এসো, আজীবন করি কানাকানি।

সয়ো মৃত্যু মিছে প্রিয়া-মুখচন্দ্রে কালো ছায়া আঁকো
সমগ্র সংসারপথ অত্র থেকে পরত্রের সাঁকো
জুড়ে ওৎ পাতো নিয়ে জুর ছায়া, জীবনের গ্লানি—
প্রেমের প্রণব, এসো, আজীবন করি কানাকানি।

•

মেয়েটি

বটকৃষ্ণ দাস

প্রেমিক যাবার পর সে-মেয়েটি টুনটুনি পাখি
পুষেছে, কারণ
কিছুতে সময় তার কাটে না একাকী
এবং বিষণ্ণ তার মন।

টুনটুনি গান গায়, তালে তালে নাচে শিস দিয়ে
নিজের স্বভাবে,—
বেতের খাঁচায় কাছে মেয়েটি দাঁড়িয়ে
দুচোখ আকাশে মেলে ভাবে।

কী ভাবে এবং কাকে ? সারা বেলা কে তাকে ভাবায় ?
কে এসে নিয়ত
জীবন ছুঁয়ে তার কথা ব'লে যায়
অবিরল বাতাসের মতো ?

দুপুর গড়িয়ে যায়। বিকেলের আলো হয় ফিকে।
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়
আকাশ কেবল খোঁজে গানের পাখিকে
চাঁদের লণ্ঠন জেলে তার।

টুনটুনি ঘুমিয়েছে। প্রতিধ্বনি নিয়ে ঘুরে মরে
আকুল বাতাস ;
সে জলে নক্ষত্র হ'য়ে সারা রাত নিজের ভিতরে—
শিশিরে সবুজ হয় ঘাস ॥

মৈহারে অরণ্যরাত

শোভন সোম

স্পট লাইটে বিঁধে গেল চিত্রল হরিণ
গুলির নিষ্ঠুর শব্দ পাহাড়ের গায়ে বেজে বেজে
হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, কিছু ধোঁয়া, গন্ধ বারুদের—
আশ্চর্য অব্যর্থ লক্ষ্য মিষ্টার ঘোষের
তারপর ফ্লাস্কের কফি টিনের বিস্কিটে আয়োজন।

এমন অরণ্য রাতে হতে চাই নক্ষত্রের মন—
পাতার ফিস্‌ফিস্ শব্দে ঘুরে-ঘুরে-শেষ-হওয়া-অন্ধকারে যার
দুঃখ নেই, ব্যথা নেই তিক্ত যন্ত্রণার
যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া দিন—
শ্রাবণে মৃদঙ্গ বাজে বিদ্যুচ্চুড়ে মেঘের মিছিলে,
চৈত্র-বৈশাখের লু-তে আগুনের লোল-জিহ্বা গিলে
নেয় যে-অরণ্য, যার নিঃশ্বাসেও শ্বাপদের ত্রাণ
সেখানে হবনা আমি নির্লিপ্ত বিশাল ছায়া-বট।

—'জানেন, মিষ্টার সোম, শিকারের এ-হেন আরাম

ধারে কাছে আর নেই, কিন্তু এরই খোঁজ রাখে কে-কে·
আপনি এলেন তবু! আমি বড়ো আনন্দ পেলাম।
আসবেন নিশ্চয়ই ফের ছুটিছাটা যখনি পাবেন
চলুন এবার নামি।'—লাল পথে দ্রুত জীপ ছোটে।

সে-রাত নিয়েছে ছুঁয়ে চৈতন্যের গভীর অতল—
—ভোরের চরণ নামে—আলোকের রক্তপদ্ম ফোটে·
ছাপিয়ে তমসাবৃত অরণ্যের স্তব্ধ-হাহাকার—
আরেক চিত্রের জন্যে তৈরি হয় পুরাতন পট

এই খণ্ডে আমি এক চিত্রল হরিণ
কোন্ সে ব্যাধের শরে আতঙ্কিত দিন
যেখানে আলোর মোহে থামি
সেখানে অলক্ষ্য মৃত্যু ভয়ের নিশ্চিত অনুগামী

তাই জীবনের দাবি নক্ষত্রের চোখে সমুজ্জ্বল॥

সম্রাটের দূত

অরবিন্দ গুহ

তুমি অতন্দ্রিত থেকো। ক্ষমাহীন সম্রাটের দূত
আসতে পারে দ্বারপ্রান্তে মধ্যরাত্রে—তার অভ্যর্থনা
যথাযোগ্য করা চাই। তুমি তাই নির্জনে প্রস্তুত
হ'তে থাকো। তার বেশি আর কোনো সংবাদ দেবো না।

মধ্যরাত্রে দ্বারপ্রান্তে তরঙ্গের দূত কোন ভাষা
ব'য়ে আনবে? কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাসঘাতক

সম্রাটের দূত

হবো না যেহেতু জানি রক্তাশোকলিপ্ত ভালোবাসা
থেকে সে বঞ্চিত ; পরিণামে অনুতাপদগ্ধ শোক।

সুন্দরী, দূতের প্রতি নির্দয় হ'য়ো না। আগে শোনো
তার বার্তা। ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণী, ভূমিকম্প, কুটিল কুয়াশা
ইত্যাদির ভয়াবহ বর্ণনা সে দেবে না কখনো
এ কথা বলি না ; হয়তো সে তার বিপরীত ভাষা

ব্যবহার করবে—আর্দ্র বায়ু, রম্ভ, মুক্তা, মেঘশ্রেণী,
শস্যশালী প্রান্তরের উন্মুক্ত স্বর্ণের সমাচার ;
সে তোমাকে যা শোনাবে তার কণামাত্র সে ভোলেনি—
নিঃসংশয়ে জানি, তুমি অবিলম্বে সম্মুখের দ্বার

আপন হৃদয়তুল্য ক'রে রেখো সজ্জিত, প্রস্তুত
মধ্যরাত্রে আসতে পারে সর্বজয়ী সম্রাটের দূত ॥

তোমার অগোচরে

রাম বসু

সাপলার গন্ধে মন ভরে গেছে
ফড়িং এর ভারে ঘাস ধনুকের মত
কচি কচি হোগলার ডগা সবুজ তীর
সাদা সাদা মেঘের মত বক এখানে ওখানে
কালচে সবুজ পাতার ওপর জ্যোৎস্না
রূপসীর ভিজে চোখের চেয়েও নম্র
বিলের জলে ছোট ছোট হাজার হাজার ঢেউ
হাজার হাজার সাপ আর সাপিনী
হাজার হাজার বছরের পুরোণো প্রেম আর হিংসা
আমি তার ভেতর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি যে পাখীকে মানুষ করেছি এতদিন
এতদিন যাকে ঢেকেছি মমতার মুকুলে পল্লবে
যে শাবকের কান্নায় রোমাঞ্চিত আমার শিকড়
মেঘের কোন প্রান্তে সংগিনীর গলার শব্দ শুনে
কোমল পাখায় দুস্তর মেঘ কেটে উড়ে গেল
তার চাপা গলায় আকাশের বিস্তীর্ণ পরিধি
কতদূর বিস্তীর্ণ অভিসারের বাসর তাদের
দিগন্তের দুধ রং কুয়াশায় আমি তাদের ডুবে যেতে দেখছি।

ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়ে এল পরিণত পৃথিবী
ঢেউ এর মত গর্বিত বীরেরা ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ
হাওয়ার মত সাহসী ঘোড়ারা ঘাসে মুখ ডুবিয়ে
বোঁটা ছেড়া ফুলের মত আহতেরা আস্তে আস্তে নিরুত্তেজ
অন্ধকারে জন্মে আবার অন্ধকারে মিশে যাবে বলে
তারা সবাই অপেক্ষা করছে পরিণত পৃথিবীর বুকে
হাজার হাজার নক্ষত্রের অবিচল অনুকম্পার নীচে
তাদের যাওয়া আসার পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

শুষ্কতার আশ্চর্য্য সন্ধ্যা সহ্য হল না তোমার
ছাদের সিড়ির ওপর বসে ফুলে ফুলে কাঁদছো
হাঁটুর ভেতর মুখ গুজে শ্রান্ত তীর্থযাত্রীর মত
তোমার সিড়ির এক মুখ পাতালের দিকে
অন্য মুখ কোথায় উঠে গেছে জানো না নিজেই।

শুষ্কতার ভেতর থেকে আমি তোমার দিকে তাকিয়ে
আমার পাতায় পাতায় লাখ লাখ জোনাকির আলো
সেই নীল আলো খেলা করছে তোমার চুলে
হাজার হাজার বছরের পুরোণো প্রেম আর ব্যর্থতার মত
তুমি জানতে পারোনি কোনদিন, কোনদিন পারবে না।

সারনাথে সন্ধ্যা

কৃষ্ণ ধর

আজ ইতিহাসের ডানায় সন্ধ্যা এলো সারনাথে।
মূলগন্ধকুঠিবিহারে ধ্বনি উঠছে স্তব্ধ গম্ভীর,
শূন্যে তারা-ছড়ানো আকাশের দিকে।

প্রিয়দর্শী দেবপ্রিয় অশোকের শিলাস্তূপ দাঁড়িয়ে আছে
মহামৌন ধ্যান তন্ময়তায়,
প্রতীক্ষার জপমালাটি হাতে ধরে

আসছে তিব্বতী লামা, লাডাকের ভিক্ষু সন্ন্যাসী,
শিয়ং ইয়াং-এর তীরতযাত্রী তরুণ বৌদ্ধ,
একই মহাতপস্যার একাগ্র আহ্বানে।
সেই তন্ময় সন্ধ্যায়, রক্তলাল শাড়িতে
বনকেতকীর গন্ধ ছড়ানো পথে তোমায় দেখলাম।
বারাণসী থেকে তুমি আসছিলে,
আমার এই অজ্ঞাতবাস সারনাথে।

মূলগন্ধকুঠিবিহারে এক হৃদয়হরণ সুরভি
আমায় তখন আচ্ছন্ন করেছে।
আমি ফিরে গেছি সেই মৌন অতীতে,
যখন এক মহাশান্তির বাণী উদ্গীত হয়েছিল এই সারনাথে।

সেদিনও মৃত্যু ছিল।
কিসা গোতমীর কান্না হৃদয় দ্রব করেছিল
সেই অবলোকিতেশ্বর মানুষটির।

উত্তরসূরী

আজকের নিরীশ্বর চেতনায় আমিও দেখছি
তুমি এলে সব কান্নাকে ভুলে,
এক আনন্দের প্রাণোজ্জ্বল উৎসব বাসরে।

তোমাকে ভালবাসলাম সুতপা,
তুমি কাছে এসে আমার অস্থির হৃদয়কে
ঢেকে দিলে এক গভীর তন্ময়তায়—
অশ্রুলবণাক্ত সময়ের উর্দ্ধে,
সহস্র মানুষের চরণ চিহ্নিত তীর্থে।
আমি নতুন করে মানুষকে জানলুম—
সে অনন্ত, অপরাজিত॥

আংটি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

দূরে দৃশ্যের একাকার সংসারে
ভরে ঝরে যায় তোমার চোখের মায়া,
উপমাউৎস নিসর্গ শুধু বাড়ে—
অনর্গলের অভিশাপে আব্‌ছায়া।

তবু, মাঝে মাঝে, দরজা এড়িয়ে, আড়ালে,
বন্দী দেয়াল ছুঁয়ে, মাথা ঠুকে ঠুকে,
জাদুকর আলো সারাদিন চুল খোলে—
সেই ভরে ঘর : পালংকে, সিন্দুকে।

তখন তোমার গোপন চোখের ভাষা
আর নয় কোনো দূরাভাস, ভুলে-যাওয়া,
মুহূর্ত যেন আংটি, আমার আঙুলে
একফোঁটা ঘিরে, অঙ্কিত ভালোবাসা॥

তিমির বলয়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আর আমি আসবো না আর কখনো তোমার চোখে চোখ
থমকাবো না, অসম্পূর্ণ সান্নিধ্যের নির্বোধ অস্বস্তি
শরীরে নেবো না ; তার চেয়ে অন্ধ হৃৎপিণ্ডের ঝড়ে
শূন্য পার্কে ব'সে থেকে কান্নার আকাশ দেখা ভালো।

সেই ভালো, পৃথিবী থেকে দূরে বহুদূরে ক্লান্তি থেকে
আরেক ক্লান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো ; বিবর্ণ ভাবনা নিয়ে
খেলবো আমি, তারপর শ্রান্ত হ'য়ে শুয়ে থাকবো একা,
অন্ধকারে থেমে যাবে, মুছে যাবে যদিও হৃদয়।

আর আমি জাগবো না আর দেখবো না পৃথিবী এলোমেলো
একটি মুখের কুয়াশায় ; রক্তে নেবো না বিস্বাদ
না পাওয়া চুমুর হাহাকার, দুই চোখের তুষার
মুহূর্তেই জীবন যায়, সে জীবনে কোন্ কাজ আমার !

এক তিমির থেকে তুমি আরেক তিমির হ'য়ে দূরে
ব'সে আছো ; সমুদ্রের মতো আমি, ঘুমুবো এবার ॥

সংগীতের জন্ম

বটকৃষ্ণ দে

আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ, সৌম্যমূর্তি ; হাস্যভরা মুখ ;
শান্তময় শুক্লপক্ষ মেঘের নৃত্যালী ;—তারপর ?
বিদ্যুৎ ! প্রতিদ্বন্দ্বী স্পর্শের মিলনে সে কী সুখ !
সে কী সুখ, বৃষ্টি, আহা, সৃষ্টির চাতক স্থিতস্বর !

ভোরবেলা প্রথম পাখীর রাগে ঘুম ভাঙে ; সোনা-
রোদ ঘাসে-ঘাসে, ফুলের কিনারে, তরিতে জড়ানো,—
আনন্দিত প্রজাপতি, ব্যাকুল বসন্তে তুমি আনো,—
চোখ-মেলা-মুকুলের স্মিত মনে প্রাণের স্তোতনা !

সংসারে সেদিন গান ! পৃথিবীর মৃত্যু-দুঃখ-জয়া,
সমস্তের শেষে নব-অস্তিত্বের উত্তরপুরুষ
আহ্বানে নিজের প্রাণে আনে উপলব্ধির প্রত্যুষে,—
তখন দিগন্তে সুরু সংগীতের অনন্ত লহরী।

আনন্দ যজ্ঞের তীর্থে তবু সে কী নিরন্ত তিয়াসা !
হৃদয় মরুর মূলে নদী হয়, ফল্গু ভালোবাসা ॥

দুটি কবিতা

আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন

সে, তার কথা :

বিলাসী কটির নির্জনতায় মগ্ন সে
জানে বিভ্রম চিত্তের চির রাত্রিতে,
এবং প্রাচীন সুন্দরতায় বদ্ধ সে
জানে এ জীবন এলোমেলোতায়, সম্ভোগে ;

দীপ্ত শ্যামল ঈশ্বর সম নগ্ন যার
তনুমন, আর ভ্রূভঙ্গীতে মত্ততা—
সে চায় আমাকে দেহের সীমিত আলস্যে
স্তন যুগলের রহস্যময় বন্ধনে।

মায়াবী অমায় যেখানেই যাও, দীপ্ততর
সে আসে নিত্য বর্ষায় আর বসন্তে ;
প্রকৃতির নীরব নিখিল ছায়ার মর্মরে
সে জানে হৃদয় : ভ্রূভঙ্গীতে, সম্ভোগে।

এবং তুমি :

এবং তোমার শরীরের ভীরু নদী
মাঝে মাঝে জানি উদ্দাম হয়ে ওঠে
জঘনে, বক্ষে, বাসনার মরজ্বালা
এবং অন্ধ লালসায়া কটিতটে।
তুমি অস্থির চুম্বনে রূপবতী
সম্মোহনের বহ্নিতে নিষ্ঠুরা,
অলস, চপল ; জানেনাতো সংগতি
তুঙ্গ তোমার মোহিনী বুকের চূড়া।

•

গোপনচারিণী, ইন্দ্রধনুর ছটা
তোমার নগ্ন অঙ্গে, এবং তুমি

•

পাখি ওরা কোন বর্ষাদিনের মত
ভুরুর নৃত্যে আনো লালসার ঘটা।

শরীরে তোমার ইচ্ছার দীপশিখা
একা, নিসঙ্গ, জ্ব'লে আর নেভে জ্ব'লে
এবং হৃদয়ে, ময় অন্ধকারে
আলগু কাঁপে উলঙ্গ কোলাহলে।

তুমি দুরন্ত বিদেশী নদীর ঢেউ
তবু তুমি ছাড়া নেই আর কোন গতি
এবং তোমার তনুর অন্ধকারে
অভিসারী কোন রাত্রির প্রস্তুতি।

নিজেকে

মানস রায়চৌধুরী

প্রতিকূল বৃষ্টি ঝড়ে মাটির ভীরুতা যায় শতগুণ বেড়ে,
অনুভব করে' নিত্য মনে হয় নিরন্তর স্নিগ্ধ ছায়া নয়।
দু-একটি বজ্রপাত, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে আহত হৃদয়
ভয়ের মুখোস নেয় কেড়ে।

ভয়ের স্বরূপ তাই জানা চাই। দুর্বলতা তার করধৃত
সাহসী কৃপাণ রাখো হাতে মেলে—বিভীষিকা হবে অপসৃত।
প্রশান্ত রৌদ্রের তেজে নীলাম্বরে লুপ্ত হবে শঙ্কার কালিমা
ঝলসাবে দিগন্তের সীমা।

দুঃখ সেতো অবিশ্রাম। অহরহ ঢেকে ফেলে আনন্দের বিভা
অসতর্ক হও যদি অশ্রুজলে, লালসায় লুব্ধ ঘৃণ্য শিবা
মহাসুখে আঙিনায় দোলাবে লাঙুল তার। অতএব চোখে
রাখো দীপ্তি অন্তহীন শোকে।

বাংলা গদ্য-রচনার প্রবর্তন

অশোকানন্দ দাশ

নিজের মতামত মুখের ভাষায় অন্যের কাছে ব্যক্ত করা প্রায় কোনো স্বাভাবিক লোকের পক্ষে কঠিন নয়। সে ভাষা সাধারণতঃ গদ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু মুখের ভাষাও যে সাহিত্যের ভাষা হতে পারে এবং গদ্য ভাষাতেও যে সাহিত্য রচিত হতে পারে, কয়েক শতাব্দীর সাহিত্য সাধনার পর এ সত্য আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন সাহিত্যমাত্রই পদ্য সাহিত্য। বাংলা পদ্য সাহিত্যের এই প্রাচীনত্বায় বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু অনুসন্ধানী পাঠক যখন উনিশ শতকের পূর্বে লিখিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিশেষ কোনো পরিচয় লাভ করতে অক্ষম হন, তখন সাহিত্যের এই বিভাগ কেন যে এতদিন অবহেলিত ছিল, এ বিষয়ে কৌতূহল হয়। এর কারণ হয়তো এই যে প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ জনপ্রিয় ছিলনা এবং কালক্রমে এ সব পুস্তক প্রচারের অভাবে পুনর্লিখিত না হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে। সে কালের লোকদের মনে এসব গদ্য-পুস্তক যদি আঁচড় কাটতে পরতো, তাহ'লে হয়তো এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা হ'ত। সুতরাং এ কথা মনে করবার কারণ আছে যে স্মরণযোগ্য গদ্যপুস্তক থেকে থাকলেও, তার সংখ্যা বেশি ছিল না। অনেকে বিশ্বাস করেন যে উনিশ শতকের হাজার বছর পূর্ব থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, বাংলা সাহিত্য শুধু পদ্যেই রচিত হয়েছে। একথা স্বীকার্য যে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হবার পূর্বে বাংলা সাহিত্যকে প্রচারের জন্য সঙ্গীত অথবা আবৃত্তির উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। সুতরাং এটা স্বাভাবিক এই বাংলাভাষী লেখকগণ পদ্য রচনা করতেই বিশেষভাবে উৎসাহী হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'লুপ্তরত্নোদ্ধার-এর ভূমিকায় লিখেছেন, 'আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখেছেন, বাংলার রচনা ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে

বাংলাভাষার গৌরব ; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারী সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এ গ্রন্থকর্তারা জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক দুর্বোধ্য সংস্কৃত বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার যে দুটি অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার থেকে অনুমান করলে বোধহয় অন্যায় হবেনা যে উনিশ শতকের পূর্বেও বাংলা গদ্যরচনা পণ্ডিতদের একচেটিয়া মহল ছিল এবং বাংলা গদ্যে তাঁরা যদি কোনো পুস্তক রচনা করে থাকেন, তবে তার ভাষা 'অনুস্বার বিসর্গরহিত' সংস্কৃত ছিল। আমরা তখনকার দিনের যে ইতিহাস পাই, তাতেও জানতে পারি যে বাঙালী পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যেমন ভক্তিমিশ্রিত অনুরাগ ছিল, প্রাকৃত ভাষা অথবা প্রাকৃত ভাষা হ'তে সদ্য উৎপন্ন বাংলা ভাষার প্রতি তেমনি অবজ্ঞা ও অবহেলা ছিল। বিদ্বান পণ্ডিতগণ দেবভাষায় তাঁদের জ্ঞানবিজ্ঞানের কাজ চালাতেন। ভিন্নদেশ হতে আগত রাজাদের সর্বভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত কৃত্রিম কবিতা আবৃত্তি করে সম্মান ও পুরস্কার লাভ করতেন। রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন, 'ইংরাজের সমাগমের পূর্বে যে গদ্যগ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী হৃদয়গ্রাহিণী নহে। উহা যেমন উৎকট শব্দে পরিপূর্ণ, সেইরূপ পূর্বাপর সম্বন্ধ বিরহিত। জনসাধারণের নিকট এ সব বই এর কোনো আবেদন থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মেই কালক্রমে এসব বই লুপ্ত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যরচনার আদিমতম চেষ্টায় যে পরিচয় আমরা পাই, তা ছড়া, ঘুমপাড়ানী গান অথবা সাধনভজনের রহস্য নিয়ে লিখিত গীতি বা কবিতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা কবিতা কিন্তু গোড়ায় থেকেই কথিত ভাষার ব্যবহার ছিল। হৃদয়াবেগ যখন প্রবল হয়, তখনই মানুষ কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করে। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হতে যা উত্থিত হয়, তা স্বভাবতই মাতৃভাষায় উচ্চারিত হয়। গদ্য লেখবার সময় লেখকের অনুভূতির অতটা গাঢ় মন্থন প্রায়ই হয় না, কবিতা রচনা করবার সময় যেমন হয়। তখন কার দিনে প্রাণের ও প্রেরনার তাগিদে যে সব কবিতা রচিত হয়েছিল, তাতে তাই চলিত বাংলা ভাষারই ব্যবহার ছিল। চতুর্দশ শতকে রচিত বড়ু চণ্ডিদাসের রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনকাব্যের ভাষার সঙ্গে এখনকার চলিত ভাষার বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। রাধা যখন কৃষ্ণের প্রেম নিবেদনে বিরাগ প্রদর্শন করে বলছেন :

কাল কাজল নয়নে না লও।
কাল কানাঞি তোকে বড় ডরাও

তখন, কৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলেছেন :

কাল আখরে তীন ভুবন বিচার।
কাল হতের অলে জীয় সংসার ॥
কাল বাঁইর ফীর লাগে বড় কাজে।
কাল রতনে হার লোভে দেবরাজে ॥
অকারণ আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর নাম্বো ঘনশ্যাম মালা ॥
কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে।
কাল ভুরুহী শোভে বদন-কমলে ॥
কাল ভ্রমরে কমল-ধন শোহে।
কাল কাজলে আরী জগজন মোহে ॥

গদ্য লিখতে গিয়ে কিন্তু বাঙালী লেখক দেবভাষার মোহ সহজে ছাড়তে পারেননি।

জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ সর্ব্বজন বোধগম্য গদ্য ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আনুমানিক ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন বাঙালী—দোম আন্তনিও—'ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক সংবাদ' রোমান বর্ণমালায় প্রকাশিত করেন। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মানুএল দ্য আস্‌সুম্প নামে একজন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী লিস্‌বন সহর থেকে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ঐ ভাবে রোমান বর্ণমালায় মুদ্রিত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি আইন পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে বিকৃত বাংলায় লিখিত এসব বই এর কোনো কৃতিত্ব নেই।

উনিশ শতকের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিও একটি প্রধান কীর্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কারণে রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণ বাংলা গদ্য রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, উনিশ শতকের প্রথম দশকে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান প্রচারকগণ সেই একই কারণে বাংলা গদ্যে ধর্ম পুস্তক প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীরামপুরের এই প্রচারকদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁরই চেষ্টায় বাংলা গদ্য অনুশীলনের উৎসাহ এদেশে প্রথম সঞ্চারিত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে তিনি

নিউ-টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ মুদ্রিত করেন। সেই বৎসরই মে মাসে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। এখানে হয়তো বলা প্রয়োজন যে নব-নিযুক্ত সিবিলিয়ানদিগকে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংস্থাপিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় তখন উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ছিল না। ১৮০১ থেকে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কেরী ও তাঁর আটজন সহকারী পণ্ডিত রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, হরপ্রসাদ রায়, রাজীবলোচন রায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রভৃতি তেরখানি গদ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন।

কেরী 'কথোপকথন' নাম দিয়ে বাংলা দেশের বিভিন্নশ্রেণীর লোকদের কথা-বার্তার যে বিবরণ সংকলন করেছিলেন, সরল সহজ ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন ভাষার বৈচিত্র্যে তা সত্যিই বিস্ময়কর। অনুবাদ সাহিত্যে কিন্তু কেরী খুব বেশী সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তাঁর বাইবেলের অনুবাদের নিম্নলিখিত অংশটি পাঠ করলেই তা বোঝা যাবে: 'সে দিনে যেসু ঘর হইতে যাইয়া বসিলেন সমুদ্রের তীরে। এবং হেন বড় মানব্য একত্তর হইল তাহার স্থানে তাহাতে তিনি জাহাজে যাইয়া বসিলেন ও সকল মানব্য তটের উপর ডাণ্ডাইল। এবং তিনি হিৎ উপদেশে কহিলেন অনেক বিষয় তাহারদিগকে বলিয়া দেখ এক বীজ বুনক বীজ বুনিতে গিয়াছে। বুনিতেই কিছু পড়িল পথের পার্শে পক্ষেরা আসিয়া তাহা গ্রাস করিল। কতক পড়িল পাষাণ স্থলে যেখানে বিস্তর মৃত্তিকা নহে ও তৎক্ষণে তাহা গজিল একারণ তাহার মৃত্তিকার গভীরতা নহে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। কেরীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহার সহকর্মিগণ কলেজের ছাত্রদের উপযুক্ত নানা রীতির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণ করেছিলেন। কিন্তু এ সব পাঠ্যপুস্তক 'কথোপকথনের' মত প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন নয়। পণ্ডিতদের রচিত এসব গ্রন্থে বাংলা গদ্যরচনার প্রকৃতি বিরোধী বড় বড় সমাসপদের প্রয়োগ কণ্য ও সাধু ভাষার অশোভন সংমিশ্রণ, অনাবশ্যক অলঙ্কারের অবতারণা ইত্যাদি নানা দোষে দুষ্ট।

বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হতে উদ্ভূত হ'লেও, তার গঠন ও প্রকৃতি যে সংস্কৃত ভাষা হতে ভিন্ন একথা আমরা এখন মেনে নিয়েছি। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে এ কথা কেউ স্বীকার করতে চাইতেন না। বাংলা গদ্য লিখবার সময় রামমোহন কিন্তু এ সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন। বাংলা

ভাষার গঠন সম্বন্ধে তাঁর আপন আদর্শটি তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণে ব্যক্ত করেছেন। রামমোহন বাংলা গদ্যকে সন্ধি ও সমাসের শিকল থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। সমাস সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্য মতে আসেনা। ভাষার নিজস্ব রূপ তার গঠনের উপর নির্ভর করে জেনেই রামমোহন বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারও বাংলা ভাষার গঠনের এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে রামমোহনের মত এত সচেতন ছিলেন না।

ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথায়… the missionaries made the field of vernacular education their own Just as two centuries earlier the Jesuits at Madura in the extreme south composed works in Tamil which are still acknowledged as classical so did the Baptist mission at Serampore near Calcutta first raised Bengali to the rank of literary language They studied the Vernacular in order to reach the people by their preaching and to translate the Bible.'

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'প্রবাদ আছে যে রাজা রামমোহন রায় সে সময়ে প্রথম গদ্য লেখক'। সুপণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার তুলনায় রামমোহনের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করবার উদ্দেশ্যে সেদিনও পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকায় আন্দোলন হইতে দেখিয়াছি। এ প্রসঙ্গে আমরা নিজেরা কোনও প্রতিবাদ করিব না। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ১৩২১ সালে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিরূপে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃতি করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি। চৌধুরী মহাশয় কহিতেছেন— মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব, দুই হিসাবেই এই (পণ্ডিত) শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১০ [১৮১৩] খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবোধচন্দ্রিকার প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষা প্রশংসমান প্রথম কুসুমের শেষাংশে লিখিত আছে যে, গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন, 'অদাদির ভাষায় যুগপৎ বৈখরী-রূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতি শীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপার্থবোভাবাব-

স্থিত কোমলতর বহুল কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এতদ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত উত্তমা বহুবর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত এক বাক্যর পশুপক্ষিভাষা বহুতরাক্ষর মনুষ্য ভাষার মত ইত্যানুমানে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা এই নিশ্চয়। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষা উত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য হেতুক।' ফলত এ সকল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন-.....নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাঙ্গলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা তাঁহার মনে ছিল, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেন না, তিনি একদিকে যেমন সাধুভাষার আদি লেখক— অপর দিকে তিনি তেমন চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চলতি ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, 'মোরা চাস করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ করিয়া খাবো, ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু মদ্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক্ পাত শামুক গুগলি ভিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি কুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি।' ইত্যাদি (সংক্ষেপিত)

'এ ভাষা অশ্লীল ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাংলা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্র জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য রচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ।.....আমার বিশ্বাস আমাদের পূর্ব্ববর্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংবত ও পুষ্ট হইয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।

'কিন্তু তাঁহার (রামমোহন রায়ের) অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গ সাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা-পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। এ গদ্য আমরা যাহাকে modern prose বলি তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রত্যক্ষিপ্ত করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।'

অতএব দেখা যাচ্ছে বাংলা গদ্য রচনা কে বা কারা প্রবর্তন করেছেন, এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের, বিশেষ করে, কেরীর উৎসাহ ও চেষ্টায় বাংলা গদ্যের অনুশীলন সম্ভব হয়েছিল। এজন্য বাংলা ভাষাভাষী তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তামিল ভাষার মত বাংলা গদ্যকেও তিনি সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত করেছেন, এই উক্তি অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। ব্যাকরণের ত্রুটি ছেড়ে দিলেও, আমরা বলতে বাধ্য যে, মিশনারীদের শব্দবিন্যাস মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় বহন করে না, তাঁদের সাহিত্যিক মেজাজ (বাংলা ভাষায় লিখিত গদ্যেরই কথা বলা হচ্ছে) কিয়ৎ পরিমাণে অমার্জিত এবং প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষার আপন রূপটি ফুটে ওঠেনি।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের যে উক্তিটি আমাদের উপহার দিয়েছেন, তা ১৩২১ সালে লিখিত। এই উদ্ধৃতিতে চৌধুরী মহাশয়ের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে কথ্য ভাষার রীতি অবলম্বিত হলে বাংলা ভাষার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সহজে হতে পারত। আমরা সকলেই জানি যে উক্ত রীতিটির অনুসরণ করা হয়নি। রামমোহন প্রধানত ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন এবং নিজের মতের প্রতিবাদকারী পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। এ সব বিতর্কে নেমে তাঁকে সংস্কৃত ভাষ্যকার-দিগের রীতি অনুসরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর এমন অনেক গদ্যরচনা আছে যা অন্য মতের বিরুদ্ধে স্বমত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য লেখা হয়নি। সে সব রচনাতে তিনি সংস্কৃত ভাষ্যকারদের রীতি অবলম্বন করেননি। তিনি কোনো রসসাহিত্য সৃষ্টি করে রচনারীতির আদর্শ স্থাপন করেছেন, এমন দাবী কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। রামমোহন সন্ধি ও সমাস বহুল প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দে অশোভনভাবে সংমিশ্রিত ভাষা অগ্রাহ্য করে বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপটির সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা করেছেন। এই দাবীই করা হয়। ব্রজেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত রচনাটির ১৯ বৎসর পরে লেখা 'রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য' এই প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের এ প্রবন্ধটির সন্ধান পেলে হয়তো এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকত না। লেখাটির প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত হ'ল : 'রামমোহন রায় পাঁজীর হিসেবে না হোক, সাহিত্যের হিসেবে প্রথম গদ্য লেখক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'প্রবোধ-

চন্দ্রিকা' নামক গদ্যগ্রন্থ সর্ব্বপ্রথমে লণ্ডন নগরে ছাপা হয়েছিল *। কিন্তু প্রবোধ-চন্দ্রিকা' সাহিত্য গ্রন্থ নয়, ইংরাজীতে যাকে বলে 'Text Book' তাই। সুতরাং এ পুস্তক রচিত হয়েছিল দেশের লোকের জন্য নয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুবক 'সাহেবজাত' গণকে বাংলা ভাষায় কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে।... ইংরাজী আমলে এদেশে গদ্য সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারকে কোন হিসেবেই বাংলা গদ্যের জন্মদাতা ব'লে গণ্য করা যায় না।

'প্রবোধচন্দ্রিকার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নেই। সুতরাং সংক্ষেপে উক্ত গ্রন্থের পরিচয় দিই। এই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের ভাষা বাঙ্গলা নয়। ন্যায় অলঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃতশাস্ত্রের বাঙ্গলা অনুবাদও নয়, paraphrase মাত্র। আর দ্বিতীয় ভাগের ভাষা খাঁটি বাঙ্গলা। কিন্তু এই দুটি পৃথক পৃথক ভাষার অপর কেউ অনুসরণ করেন নি, অনুকরণও করেন নি। ফলে প্রবোধচন্দ্রিকা একখানি literary curosity মাত্র হয়েছে।

'অপরপক্ষে সেকালে বাঙ্গলা ভাষায় গদ্য লেখবার কৌশল যে বাঙ্গালীরা আবিষ্কার করেনি, সে বিষয়ে রামমোহন রায় সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি প্রথমেই কি-পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গলার বাক্য গঠন করতে হয়, তার নিয়মাবলীর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংস্কৃতের অনুসরণে যে বাঙ্গলায় কাব্য লেখা অসম্ভব, সে জ্ঞান তাঁর ছিল। আর তাঁর লেখা বাঙ্গলা ব্যাকরণে তিনি স্পষ্ট করে লিখে গিয়েছেন যে, এক ভাষার ব্যাকরণ অপর ভাষার উপর আরোপ করা যায় না, কারণ প্রতি ভাষার গঠন বিভিন্ন এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাষাকে শাসন করা নয়, ভাষার structure-এর সন্ধান নেওয়া। বাঙ্গলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, ও তার বাক্যগঠন প্রণালীও যে বিভিন্ন, এ বিষয়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সন্ধি সমাস যে বাঙ্গলার ধাতে সয়না, এ সত্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। ফলে তাঁর লেখা সম্পূর্ণ সমাসমুক্ত। সংস্কৃত ব্যাকরণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার ফল যে বাঙ্গলা ভাষাকে মুক্তি দেওয়া অর্থাৎ আত্মবশ করা, রামমোহন রায় প্রদর্শিত এই সহজ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের প্রায় এক শতাব্দী লেগেছে।

'ইতিমধ্যে আমরা বাঙ্গলা গদ্য নিয়ে নানারূপ experiment করছি। সংস্কৃত ভাষার প্রতি আমাদের যে মোহ আছে, রামমোহন রায়ের তা ছিল

* পুস্তকটি ১৮১৩ সালে রচিত হ'লেও ১৮৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

না, কারণ তিনি ছিলেন সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আমরা তা নই। রামমোহন রায় বাঙলা ভাষার শুধু প্রথম গদ্য লেখক নন, গদ্যরচনার প্রকরণ পদ্ধতি বিধি-নিষেধও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এমন কি, কোন শব্দ কি রূপে বানান করতে হবে, সে বিষয়েও তিনি স্বজাতিকে উপদেশ দিয়েছেন। রামমোহন ছিলেন মুক্তিবাণীর প্রচারক, এবং তিনি স্বভাষায় মুক্তিকামী ছিলেন।'

'প্রবোধচন্দ্রিকা'র চলিত ভাষার যে ব্যবহার দেখতে পাই, তা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নিজস্ব ষ্টাইল, এ রকম অনুমান করবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। প্রবোধচন্দ্রিকা সিবিলিয়ানদের 'শিক্ষার্থে' রচিত হয়েছিল। ধর্মপ্রচারে ও শাসনকার্যে সফলতা লাভ করতে হ'লে বিভিন্নশ্রেণীর লোকদের কথ্যভাষা জানা প্রয়োজন, এ কথা কেরী খুব ভাল করেই জানতেন। তাই, নিজে শুধু কথোপকথন সংকলন করেই ক্ষান্ত হন নি, সহকর্মীদের নানা রীতির গ্রন্থ প্রণয়ণ করতে উৎসাহিত করেছেন। চৌধুরী মহাশয়ের উদ্ধৃত অংশে কেরীর কথোপকথন-সংকলনের ভাষার প্রভাব স্পষ্ট। এই অনুমানের কারণ এই যে প্রবোধচন্দ্রিকার মুখবন্ধে মৃত্যুঞ্জয় লিখেছেন যে বাংলাভাষায় সংস্কৃত-বাহুল্য আছে বলেই বাংলা ভাষা অন্যান্য দেশীভাষা হতে 'উত্তমা'। বেদান্ত চন্দ্রিকার উপসংহারে লিখেছেন, যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরা অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমন সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রই পরাঙ্মুখ হন।' যিনি গৌড়ীয় ভাষাতে 'সংস্কৃতবাহুল্য হেতুক', সে ভাষা অন্য ভাষা হতে 'উত্তমা' মনে করতেন, যাঁর বিচারে লৌকিক ভাষা এত 'নগ্না উচ্ছৃঙ্খল' যে তার শ্রবণমাত্রতেই সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা পরাঙ্মুখ হন', তিনি কথ্যভাষাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবেন, একথা বিশ্বাস করা চলেনা। প্রথম চৌধুরী মহাশয় প্রবোধচন্দ্রিকার তৃতীয় স্তবক তৃতীয় কুসুমের যে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছেন, তার অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদটি এইরূপ, 'ইতোমধ্যে শৃগাল সাড়া পাইয়া গৃহ হইতে নির্গমনার্থ উন্মুক্ত হইয়া গুরুতর ভোজনেতে উদরভারে শীঘ্র বহির্গত হইতে পারিলনা। কৃষক দেখিতে পাইয়া দ্বারে কপাটে শৃঙ্খল লাগাইয়া দিল। শিয়ালের পো কারাগারবদ্ধপ্রায় হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর লাঙ্গলিক ক্রুদ্ধ অগ্নি নির্বাণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসার্দ্দিত হইয়া ভোজ্য দ্রব্যব্যাঘাতে অতি মন্দক্রোধে শৈলীক্রমে গৃহাভ্যন্তরে

গিয়া দৃঢ়তর রজ্জুতে কণ্ঠদেশ আঁটিয়া বান্ধিয়া শৃগালকে টানিয়া আনিয়া হাতিনাতে পাড়িয়া কাতি করিয়া ফেলিয়া শৃগালের পিছাড়ি দুই পাতে আপন দুই পাদতলের ভর দিয়া তার উপর চাপিয়া বসিয়া স্ত্রীকে কহিল, ওলো মাগি, আর কতকগুলা ধুলা শীঘ্র আন এ শালার বেটাকে জব্দ করি। চাসানী ধুলি আনিয়া দিল। কুপিত মূর্খ লাঙ্গলিক পাঁচানিতে ঠাসিয়া শৃগালের মার্গছিদ্রে সকল ধুলা পুরিয়া স্ত্রীকে ডাক দিল।.....মূঢ় চাসা অধোমুখ হইয়া শৃগালের গুহ্যদ্বার নিরীক্ষণ করিতেছে ইতাবসরে ধূর্ত্তশিরোমণি বক্তক কালিয়া এক মরুৎকর্ম্ম করিয়া চাসার চক্ষে ধূলিতে সম্পূর্ণ করিল।...শৃগাল...চাসার পাচায় এক কামড় দিয়া চলিয়া গেল।' কল্পনা যেরকম উদ্ভট, সংস্কৃত ও কথিত-ভাষা সংমিশ্রিত রচনাটিও তেমনি কিম্ভূতকিমাকার বহুরূপীর রূপ ধারণ করেছে।

রামমোহনের রচনার দু' একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্তচন্দ্রিকার অন্যান্য মতবাদ খণ্ডন করে, রামমোহন তাঁর বিদ্রূপের উত্তরে লিখছেন: 'আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্যকথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এসব রীতিও নহে যে, দুর্ব্বাক্যকথনের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই। অতএব, ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তরপ্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।' (রচনাতে কিছু কিছু বিরামচিহ্ন যোগ করা হয়েছে)

হিন্দুদের পুরাণোক্ত বহুদেব-বাদ নিয়ে যখন খ্রীষ্টান প্রচারকেরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলেন, তখন রামমোহন তাদের 'পাদরী ও শিষ্যসংবাদ' নামক রচনাটি উপহার দিয়েছিলেন। তিনি এই রচনায় খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ যে অযৌক্তিক ও অসঙ্গত তা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। এক পাদরীর সঙ্গে চীনদেশীয় তিনজন শিষ্যের কথোপকথন কল্পিত হয়েছে। রচনাটি দীর্ঘ। শুধু প্রত্যেক শিষ্যের প্রথম ও শেষ উক্তিটি উদ্ধৃত করছি:

প্রথম শিষ্য—ঈশ্বর তিন
দ্বিতীয় শিষ্য—ঈশ্বর দুই
তৃতীয় শিষ্য—ঈশ্বর নাই

প্রথম শিষ্য—আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলিঘা

অর্থাৎ ধর্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

দ্বিতীয় শিষ্য—আমরা চীনদেশীয় মনুষ্য, নানাবস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি, আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে তিনব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন। ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্তমান আছেন।

তৃতীয় শিষ্য—আপনারা পশ্চিম দেশীয় বুদ্ধিমান লোক, আমারদিগের ন্যায় নহে, আপনারদিগের দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয়না। কারণ পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৮০০শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই, ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে হয়তো বোঝা যাবে যে রামমোহনের রচনা ফোর্ট উইলিয়ামী রচনা হতে কত সহজ ও সরল। রামমোহনের রচনাতে খাঁটি বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ যে অনুপাতে বর্তমান, আজকালকার প্রচলিত সাধু ভাষাতেও সংস্কৃতের অনুপাতে তার চেয়ে কম নয়। অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যাঁর পরিচয় নেই, মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার মর্ম গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মৃত্যুঞ্জয় সাধু ও চলতি ভাষা নিয়ে যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন, যে সব উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, ভবিষ্যৎ ভাষার সংস্কার কার্যে সে সব পরীক্ষা ও সংগৃহীত উপাদান হয়তো ফলপ্রসূ হয়েছে। 'কোকিল কুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলনিল সে উচ্ছলচ্ছীকরত্যাচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে,' এসব বাক্য প্রয়োগ করবার জন্য এক সময় মৃত্যুঞ্জয় নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু যদি স্মরণে রাখা যায় যে শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজ, কান্তি, সমাধি বাক্যের এই দশপ্রকার গুণ সম্বন্ধে উদাহরণ দেবার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে চয়ন করে এ সব বাক্যের অবতারণা করছেন, তবে নিন্দার কোনো সঙ্গত কারণ পাওয়া যাবে না। কুশলী লেখক, 'ইন্দুতে ইন্দীবর সুন্দর চিহ্ন চারু ছবি বিস্তার করে' কিংবা 'কামিনী কাঞ্চী

মঞ্জীর মঞ্জু সিঞ্জিত করে' এ সব উদাহরণ হতে বাক্যের গুণ সম্বন্ধে অবহিত হলে সংস্কৃত ভাষার ছন্দ ও শ্রুতিমধুরতা বাংলা ভাষাতেও সঞ্চারিত করতে পারবেন। তবে ভাষাটা খাঁটি বাংলা হওয়া চাই।

মৃত্যুঞ্জয় সুরসিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সন্ধি ও সমাস হতে মুক্ত বাংলা গদ্যের নিজস্ব রূপটি তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়নি। এই মুক্তির মন্ত্র সর্বপ্রথমে রামমোহনই উচ্চারিত করেছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের অস্থি-সংস্থান তাঁরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

যাঁরা বাংলাগদ্যের অগ্রগতির ইতিহাস জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে বাংলা ভাষা যখনই সংস্কৃতবহুল হয়েছে, তখনই সেই রীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'তাঁহার (রামমোহনের) পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।... এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কারপ্রাপ্ত হইল।...কিন্তু প্রাচীন প্রথার আরব্ধ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইতনা। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণপথেই চলিল।' বাংলাভাষার ইতিহাস-পাঠক জানেন, অক্ষয়কুমার যখন জিগীষা, জুগোপিষা, জিজীবিষা প্রভৃতি উৎকট শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তখন কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী ঐ সব শব্দের তালিকায় 'চিচ্‌চৌমিষা' প্রভৃতি শব্দ যোগ করে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সংস্কৃতবহুল ভাষার প্রতিক্রিয়াতেই প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' সরল সহজ কথ্য ভাষায় রচিত হয়েছিল। আলালী ভাষা আদর্শ ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়নি। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হবার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে বাংলা ভাষার নিজস্ব গানটি বজায় রেখে, সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।' পূর্বের কয়েকটি অনুচ্ছেদে যা লেখা হয়েছে তাতে পাঠক নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করবেন যে রামমোহনের আদর্শও এইরূপই ছিল।

ভাষা প্রবহমান ও পরিবর্তনশীল। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের পরে

তাই এলেন প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। নিজের প্রথমযুগের ভাষার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ আবদ্ধ থাকেন নি। রবীন্দ্রনাথের পরেও বাংলা গদ্যভাষার প্রবহমান স্রোত থেমে যায় নি, ছোট বড় অসংখ্য লেখকের নিকট থেকে দেহ-লাবণ্য লাভ করে নব নব পথে ব্যপ্ত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। ভাষার অস্থি-সংস্থান ও দেহ-সুষমা-সম্ভার এক জিনিস নয় একথা স্মরণে রাখলে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মনের অস্পষ্টতা দূর হবে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা

আশুতোষ ভট্টাচার্য

প্রত্যেক সজ্ঞান শিল্পীকেই অতীত এবং বর্তমান কালের সাহিত্যবিবেক সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হয়। পূর্বসূরীদের সাহিত্য সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে সমসাময়িক মানুষের সাহিত্য পিপাসা চরিতার্থ করিতে হয়। এইটুকু সততার সহিত পালন করিতে পারিলেই তিনি চলতি যুগের নগদ-পাওনা লাভ করেন, কিন্তু যিনি সার্থক শিল্পী তাঁহার বিচারের আরও এক পর্ব বাকি থাকিয়া যায়। তাঁহাকে ভবিষ্যৎ কালেও বিচার সভায় হাজির হইতে হয়। ইহাতে সেই শিল্পীরই গৌরব। কারণ উত্তরকালের বিচারসভায় সচরাচর অক্ষম শিল্পীর ডাক পড়ে না। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের কবিকণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছে। এই দূর কালের ব্যবধান হইতে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা এবং তাহার কাব্যরূপ আলোচনা করিয়া দেখা যাক। ১৮৮৫ সালে ঈশ্বর গুপ্ত প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি রচিত হইবার পর তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা অপেক্ষাকৃত অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। এবং অধিকাংশ আলোচনাতেই আমরা ঈশ্বর গুপ্তের যুগ-পর্ব সম্বন্ধে মুখর হইয়াছি। কবি হিসাবে বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রাচীন অথবা আধুনিক কোন পর্বে তাঁহার যথার্থ স্থান হওয়া উচিত এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। কোন কোন সমালোচকের মতে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার প্রাচীন কাব্যধারার সর্বশেষ কবি, কাহারও মতে তিনি আধুনিক ধারার প্রথম কবি, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে প্রাচীন ও নবীন ধারার সন্ধিক্ষণের কবি বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য বাংলার প্রাচীন কাব্যধারার সাধারণ রূপটি সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। রূপগত বিচার করিলে বাংলার প্রাচীন কাব্যের দুইটি ধারা পাই, একটি বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা, অপরটি মঙ্গল কাব্যের ধারা। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে আনুপূর্বিক কোন কাহিনী নাই। মানবীয়

অনুভূতিই রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্য দিয়া সেখানে পরিবেশিত হইয়াছে। সেই মানবিক অনুভূতির তপ্ত স্পর্শের জন্যই বৈষ্ণব পদগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বিস্তৃত এবং সুস্পষ্ট কাহিনী ছিল। উহাদের একটি নিজস্ব জগৎ ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর ধারার সহিত সমান্তরাল-ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া উহারা বাংলা কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলী ও মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক পরিপূরকের।

ঈশ্বর গুপ্ত যদি প্রাচীন ভাবধারার সর্বশেষ কবিই যথার্থ হন তাহা হইলেই আমরা সঙ্গতভাবেই আশা করিব যে তিনি সততা এবং শিল্পচাতুর্যের সহিত প্রাচীন কাব্যধারাটি অনুসরণ করিবেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত তাহা করেন নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া মঙ্গলকাব্যের যে ধারাটি প্রবাহিত হইতেছিল, ভারত-চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের মধ্যেই তাহা একান্ত সহজ সরল পরিণতি লাভ করিয়াছিল। অপরপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা যদিও ভারতচন্দ্রের কবিতায় তাহার ক্ষীণ স্রোত বজায় রাখিয়াছিল তথাপি এই ধারা ঈশ্বর গুপ্তকে প্রেরণা দেয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত বৈষ্ণব পদ রচনা করেন নাই। পরে আবার ঐ বৈষ্ণব গীতি কবিতার ধারা রামপ্রসাদের মধ্যে নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু রামপ্রসাদের অনুকরণে ঈশ্বর গুপ্ত কোন উমা-সঙ্গীত রচনা করেন নাই। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর ধারা যে কবি অনুসরণ করেন নাই, তাঁহাকে প্রাচীন ধারার সর্বশেষ কবি বলা সঙ্গত নহে।

একটি বিষয়ে প্রাচীন কাব্যধারার সহিত ঈশ্বর গুপ্তের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। তাহা প্রাচীন কাব্যের বহিরঙ্গ রূপের দিক। ছন্দ, শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগের ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিকতার পরিচয় দেন নাই। প্রাচীন কাব্যের প্রধান ছন্দ ছিল পয়ার। যেখানে করুণ রসসৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিত, সেখানে দীর্ঘ ত্রিপদী অথবা লঘু ত্রিপদী ব্যবহার করা হইত। এইগুলিই বাংলার প্রাচীন ছন্দ। এই পয়ার এবং ত্রিপদীর প্রথাসিদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত নূতনতর ছন্দের তরঙ্গে বাংলা কাব্যস্রোতকে তরঙ্গিত করিতে পারেন নাই; ইহারই মধ্যে প্রাচীন কাব্যধারার সহিত ঈশ্বর গুপ্তের যোগ। ইহার বেশি কিছুই ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কাব্যধারা হইতে গ্রহণ করেন নাই। ধীরে ধীরে ঈশ্বর গুপ্তের আধুনিক মনন বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার স্মরণীয় 'পরমেশ্বর বন্দনা' ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন আধ্যাত্মিক বোধ হইতেই

সঙ্গত। বিষয়বস্তু ও ভাবের দিক দিয়া তাঁহার মধ্যে প্রাচীনতা নাই। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক যুগের কবি বলিয়াই গ্রহণ করিতে চাই। ভাষা কবিতার অন্যতম অঙ্গ, তবে একমাত্র অঙ্গ নহে। সার্থক কাব্যসৃষ্টির জন্য ভাব ও ভাষা, এই দুইয়েরই প্রয়োজন। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা প্রাচীনপন্থী, কিন্তু ভাব ও মনোভঙ্গী আধুনিক।

ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরবোধ আধুনিক চিন্তার অনুকূল। মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণব পদাবলীর কবিগণ রূপের মধ্যেই ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছেন। রূপাতীত ঈশ্বরের কোন ইঙ্গিত আমরা তাঁহাদের কাব্য হইতে পাই না। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত রূপাতীত ঈশ্বরের যে ইঙ্গিত দিলেন, তাহা বাংলা কাব্যে নূতন। এই নূতন ঈশ্বরবোধ ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতে জাত। ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ ইংরাজী শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু বাংলাদেশে তখন ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটিতেছিল এবং এই ইংরাজী শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাব কবির মননে শুভ ফল প্রসব করিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তরুণ সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায় পাশ্চাত্য ভাবধারার আংশিক প্রভাব তাঁহার উপর পড়িল এবং সেই প্রভাবের প্রকাশ দেখিতে পাই তাঁহার কাব্যে। অথচ তাঁহার কবিকল্পনা বাংলার প্রত্যক্ষ লোক ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যায় নাই। ঈশ্বর গুপ্তের কবিমন ছিল বাঙালিয়ানায় স্নিগ্ধ। কৃষি উৎসব বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসব ঈশ্বর গুপ্তের কবিকল্পনাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাংলার আনারস, পাঁঠা এবং 'তপসীর প্রায়' তপসে মাছকেও কবি কাব্যে স্থান দিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই নূতন এবং আধুনিক। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের মধ্যযুগের গতানুগতিক বিষয়-বর্ণনা হইতে পরিত্রাণ দিয়া আধুনিক যুগের সিংহদ্বারে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিল। আধুনিক যুগের বস্তুতান্ত্রিকতার লক্ষণগুলি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে বিরাজ করিতেছে।

প্রাচীন যুগের ভাবকল্পনা হইতে বাংলা কাব্যের যখন বন্ধনমুক্তি ঘটিল তখন কবিগণ কাব্যের বাহিরের চাকচিক্য অর্থাৎ শব্দশিল্পের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিলেন। বাংলার নিজস্ব ভাবকল্পনার সমৃদ্ধি আমরা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নানা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু বাংলা ভাষারও যে একটি নিজস্ব ঐশ্বর্য আছে এবং এই ভাষারই দ্বারা যে মণিমাণিক্যের সৃষ্টি সম্ভবপর তাহা প্রথম

দেখাইলেন কুশলী শব্দশিল্পী ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের যুগে শব্দশিল্পের উপর কবিদের সদাজাগ্রত শিল্পপ্রবণ লক্ষণীয়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসর বাংলা সাহিত্যের অন্ধকারময় যুগ। সেই যুগ প্রধানত কবিওয়ালাদের। কবিওয়ালারাও শব্দশিল্পের উপর জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু পরিমিত শিল্পজ্ঞান কবিওয়ালাদের ছিল না। তাই কবিওয়ালাদের সৃষ্টি কৃত্রিম।

ঈশ্বর গুপ্তও এই কবিওয়ালাদের ধারাই অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দোষগুলিকেও গ্রহণ করেন। তাই তাঁহার কাব্যের অনুপ্রাসের অপরিমিত ব্যবহার পাই। অনুপ্রাস ব্যবহার ব্যাপারে ভারতচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের যে সংযত শিল্পবোধ ছিল, তাহা ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত গতানুগতিক শিল্পনীতিকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুপ্রাস ও যমকের শিল্প-সম্মত ব্যবহার তিনি করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার কাব্যের বহিরঙ্গ দিকটি আধুনিক কাব্যপাঠকের সন্তোষ বিধান করিতে পারে না।

ঈশ্বর গুপ্তের আধুনিক মনের আরও একটি পরিচয় তাঁহার ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতার মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে। তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে satire বা ব্যঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একজনের পক্ষে যাহা হাস্যরসের খোরাক অপরের পক্ষে তাহা মর্মান্তিক—এই বোধই ব্যঙ্গরসের ভিত্তিভূমি। এই ব্যঙ্গরসের রসিক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক। ইহার পূর্বে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইত স্থূল হাস্যরসের অবাহিত পানীয়ে। তখন ছিল স্থূল হাস্যরস, কিন্তু সূক্ষ্ম শ্লেষের ব্যঞ্জনা আমরা প্রথম পাইলাম ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে। অতি পুরাতন আচার ব্যবহারকে তিনি বাস্তব অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। এই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার ফলে তাহার নূতন এক রূপ ধরা পড়িল। সেই অবস্থায় কবি তাঁহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের খোঁচায় আমাদের অনড় বোধের মর্মমূলে আঘাত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যঙ্গপ্রিয় মনের দর্পণে তাঁহার আধুনিক ছায়া পড়িলেও আমাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে ব্যঙ্গের বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন। উদার মতবাদ তাঁহার ছিল না। যাহা কিছু নূতন তাহার প্রতি তাঁহার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু ব্যঙ্গের মধ্যেও যে আধুনিক সাহিত্যের আবেদন আছে ঈশ্বর গুপ্ত তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রকাশভঙ্গিতে আশানুরূপ দক্ষতা প্রকাশ না পাইলেও তাঁহার আধুনিক মনোভঙ্গি আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি।

আধুনিক ঈশ্বরবোধ ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে অভিনব ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। যে যুগে বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল, সেই যুগের সমাজে তখনও একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মঙ্গলকাব্যের কবিগণের মধ্যে গ্রন্থরচনার প্রারম্ভে বহুবিধ দেবদেবীর বন্দনা করিবার প্রথা ছিল। এই দেবদেবী বন্দনা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার কাব্যরচনার প্রারম্ভে এইরূপ কোন দেবীবন্দনা রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার একটি ব্যক্তিগত বোধ ছিল। বেদে, উপনিষদে ঈশ্বরের কথা আছে, সাংখ্যে পরম পুরুষের কথা আছে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে একেশ্বরবাদের প্রভাব বাংলার সমাজ জীবনে ছিল না। খ্রীষ্ট ধর্মে ঈশ্বরকে পিতা এবং প্রভুরূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। রামপ্রসাদ মাতৃসাধক ছিলেন। মাতৃরূপের মধ্য দিয়া তিনি জগতের মূলীভূত শক্তির সাধনা করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর কবিদের ঈশ্বরবোধ হইতে ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরবোধ একেবারে স্বতন্ত্র। ঈশ্বর তাঁহার নিকট নির্গুণ। এই ঈশ্বর-চৈতন্য উনবিংশ শতাব্দীর নূতন আধ্যাত্মিকতাবোধ। বাংলা কাব্যের আসরে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম বলিলেন যে ঈশ্বর ত্রাণকর্তা। ইসলাম ধর্মেও একেশ্বরবাদের কথাই বলা হইয়াছে। ইসলাম ধর্মের ঈশ্বরবোধ, খ্রীষ্ট-ধর্মের ঈশ্বরবোধ এবং বেদান্তের ঈশ্বরবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নূতন ঈশ্বরবোধের সূচনা হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত যে যুগে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই যুগের নানা মনীষীর চিন্তায় নব্য বাংলার নূতন ঈশ্বরবোধ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় পৈতৃকভবনে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করিলেন ১৮৩৯ সালে। ইহা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ঠাকুর পরিবারের সম্প্রীতি ছিল। তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত এই সভায় যাইতেন। ঈশ্বর গুপ্ত বুঝিলেন যে একটি নূতন আধ্যাত্মবোধ আত্মপ্রকাশে উন্মুখ। তিনি সেই বোধকে অস্বীকার তো করেনই নাই, উপরন্তু সেই নূতন ঈশ্বরবোধকে তাঁহার বিভিন্ন খণ্ড কবিতার মধ্যে সহৃদয়ভাবে স্বাগীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী যুগে রাধাকৃষ্ণকে অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণব কবিতা রচিত হয় নাই ও লৌকিক দেবদেবীকে অতিক্রম করিয়া-মঙ্গলকাব্য রচিত হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের যুগে ভক্তির ভাব বা দেবদেবীর প্রতি প্রীতির ভাব শিথিলতর

হইয়া পড়িয়াছিল। দেবদেবী অপেক্ষা মানুষের রসবিলাসই সেই যুগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেবতাকে একেবারে বাদ দিয়া কাব্য-রচনা করা সেইযুগেও সম্ভব হয় নাই। শাক্ত পদাবলীতে মানবীয় রসানুভূতির সন্ধান পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেইখানেও উমা-মেনকাকে অবলম্বন না করিয়া মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্তের যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন হইতেছিল। তাঁহার কবি প্রতিভার মূলে সত্যবোধ ছিল; তাই তিনি পর্যুদিত প্রাচীন গতানুগতিক পথের পথিক না হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ধর্মবেত্তাগণ যে নূতন ঈশ্বরবোধ প্রচার করিতেছিলেন, তাহারই প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন, "যাহা আছে তাহারই কবি ঈশ্বরচন্দ্র।" এই মন্তব্যের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতি প্রবণতার কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিকতাবোধে বস্তু-লীনতা নাই, সেখানে আছে বিনম্র সাত্ত্বিকতা। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার আধ্যাত্ম-চেতনা বস্তুনিরপেক্ষ, রূপনিরপেক্ষ ও গুণনিরপেক্ষ। অন্য প্রসঙ্গের কবিতা-গুলিতে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা আমাদের বিংশ শতাব্দীর মার্জিত রুচি ও শালীনতাবোধকে পীড়া দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক কবিতাগুলিতে কবির কুরুচির পরিচয় নাই। ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি অশ্লীলতা করেন নাই। তাঁহার শুদ্ধ আধ্যাত্মিক চৈতন্য অপূর্ব শালীন রূপ লইয়া প্রকাশিত। এই ধরণের কবিতাগুলি পরবর্তীকালে অধিকতর শিল্পগুণ সমৃদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলিতেও ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের গতানুগতিকতা অনুসরণ করেন নাই। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে আমরা প্রকৃতির কোন স্বতন্ত্র রূপ পাই না। মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বারমাসীর মধ্যে প্রধানতঃ প্রকৃতি বর্ণনা হইয়াছে। সেই বারমাসীগুলি নায়িকাদের মনের দর্পণ বিশেষ। বারমাসীগুলি প্রায়শই দুঃখের, প্রেমের নৈরাশ্য হইতেই তাহাদের উদ্ভব। বারমাসীকে অবলম্বন করিয়া বৈশাখ হইতে চৈত্র, এই বারমাসের বাংলা দেশের প্রকৃতি বর্ণনার এক প্রয়াস লক্ষ্য

করা যায়। কিন্তু বারমাসীতে নায়িকার দুঃখ বর্ণনাই মুখ্য এবং প্রকৃতি গৌণ। প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কবির প্রত্যক্ষগোচর দৃষ্টির সাহায্যে সেখানে প্রকৃতি বর্ণনা হয় নাই। বৈষ্ণব পদাবলীতেও প্রকৃতির নিজস্ব স্বতন্ত্র ভূমিকা নাই। সেখানেও নায়ক-নায়িকার প্রয়োজনেই প্রকৃতিকে কাব্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরাধার অভিসারের সময় প্রকৃতির বর্ণোজ্জ্বল চিত্র বৈষ্ণব পদকর্তা আমাদের উপহার দিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও মুখ্য হইল অভিসারের আনন্দে বিহ্বল শ্রীরাধার মনের বর্ণনা, প্রকৃতি সেখানে পটভূমিকায় চলিয়া গিয়াছে। মৌখিক বা লোকসাহিত্যের প্রকৃতি বর্ণনাও মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণেই হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যেই আমরা সর্বপ্রথম প্রকৃতির একটি স্বতঃ সম্পূর্ণ রূপ পাইলাম। ঈশ্বর গুপ্ত বুঝিয়াছিলেন যে কাব্যে মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট স্থান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনি প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিলেন। তিনি প্রকৃতি বর্ণনায় সময় অত্যন্ত বিষয়নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন। মানব-জীবন নিরপেক্ষ প্রকৃতি এইভাবে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে নিজস্ব রসগরিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি যখন ঝটিকা বর্ণনা করেন তখন প্রকৃতির মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিকেই অনুভব করেন। পরবর্তীকালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কাঞ্চী-কাবেরী-তে প্রকৃতির যে বাস্তব বিষয়ানুগ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাকে তাঁহার কাব্যগুরুর প্রভাব বলিয়াই মানিতে হইবে।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রেম-বিষয়ক কবিতাগুলি আলোচনা করিবার আগে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে প্রেমের স্থান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লইতে চাই। মঙ্গল কাব্যের প্রেম ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় চলিয়াছে। মঙ্গল-কাব্যে দাম্পত্য প্রেম বা গার্হস্থ্য প্রেমকে সম্মান দেওয়া হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ প্রেমের বাস্তবতার পরিচয় দিয়াছেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ফুল্লরার কর্তব্যবোধ ও প্রেমবোধের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য করিয়াছেন এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাদের বলিতে হয় যে মঙ্গল-কাব্যের কবিগণ বাঁধাধরা মিলন ও বিচ্ছেদের মধ্যেই প্রেমের পরিসমাপ্তির রেখা টানিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতাতে যে প্রেমের বর্ণনা করা হইয়াছে সেই প্রেম

দাম্পত্য প্রেম নহে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ভিত্তি করিয়াই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রেমকে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়া তাহার উপর স্বর্গীয় মাধুরিমা আরোপ করিবার দিকে বৈষ্ণব কবিদের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কাব্যের প্রেমচেতনা গতানুগতিক পথে অগ্রসর হইয়া অনেকাংশে কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন চিত্তের বিকাশ উহার মধ্যে পাই না। মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রেমের ধারা যে নির্দিষ্ট পথে চলিয়া আসিতেছিল, লোকসাহিত্যে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল। সেখানে কবিগণ স্বাধীন ব্যক্তিপ্রেমের জয়গান করিয়াছেন। দাম্পত্য আদর্শ বা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে কবিগণ বিসর্জন দেন নাই। কিন্তু আধুনিক মানদণ্ডে যাহা যথার্থ মানবীয় প্রেমের কবিতা তাহার সর্বপ্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত। বিংশ শতাব্দীর বহু কবিই আধ্যাত্মিক প্রেমাদর্শের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিয়াছেন; "মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা"—অক্ষয় কুমার বড়ালের এই স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে ঈশ্বর গুপ্তের প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলির প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও আধুনিকতা আছে। কারণ, লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অনুপ্রাস ও যমকের যে অপরিমিত ব্যবহার তাঁহার অন্যান্য বহু কবিতাকে কৃত্রিম করিয়া দিয়াছে, তাহা প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলির মধ্যে তাঁহার একটি বিশেষ পরিচয় নিহিত আছে। স্বদেশ প্রেম সেযুগে প্রায় অজানিত ছিল, বৃটিশ শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় বাঙালীর জাতীয় চেতনা যখন স্তিমিত হইয়া আছে, সেই যুগে বাঙালী ঈশ্বর গুপ্তের মুখ হইতে শুনিতে পাইল :

ভ্রাতৃভাব ভাবি' মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া,
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

এই কণ্ঠস্বর বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব। এই কবিতায় কবি চিৎকার করিয়া কোন কিছু ঘোষণা করিতে চাহেন নাই। স্থিতপ্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীর মত ঈশ্বর গুপ্ত জাতীয়তার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে চাহিয়াছেন। বাঙালীর বুকে স্বদেশপ্রীতির প্রদীপটি ঈশ্বর গুপ্ত জ্বালিয়েছেন। তাঁহার ঠিক অব্যবহিত পরেই

রঙ্গলালের "বলে যেই ত্যাজে প্রাণ ধন্য সেই পুণ্যবান্" বা "রাখিব জাতীয় ধর্ম রুধির তর্পণে" ইত্যাদি চরণের মূল উৎস ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেমের কবিতাগুলি।

স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল যে কবিতার বহিরঙ্গগত কারুকার্যের প্রতি ঈশ্বর গুপ্ত উদাসীন ছিলেন। তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে সুন্দর ভাবকে সুন্দর ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করাও কবির অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কবি-কণ্ঠেই যে নূতন যুগের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। প্রত্যেক কবির মধ্যে দুইটি মানুষ থাকে। একজন চিৎকার করিয়া সাধারণ কথা বলিতে চায়, আর একজন গভীর মননের শিল্প-রূপ দিয়া তাহা সহৃদয় পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিতে চায়। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব অনেক বড় কবির কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায়। ব্রাউনিং এর কবিতার আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার কবিতার অনুরাগী পাঠক সমালোচক E. V. Lucas মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "Dr. Jekyll was more different from Mr. Hyde than the Browning who sings from the Browning who roars" ব্রাউনিং এর সহিত ঈশ্বর গুপ্তের তুলনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কারণ ব্রাউনিং আরও উচ্চস্তরের শিল্পী। কিন্তু মন্তব্যটির মধ্যে সাধারণ সত্য আছে; তাহাই স্মরণ করিয়া বলিতে চাই যে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে চিৎকারপ্রিয় পদ্যলেখক এবং রসিক কবির একটি দ্বন্দ্ব ছিল। সেই দ্বন্দ্বের মধ্যেও যেখানে তাঁহার কবি মনটি স্বস্থ হইয়াছে এবং সাংবাদিকতার আশু প্রয়োজন মিটাইবার তাগিদ হইতে মুক্তি পাইয়াছে সেইখানে তিনি সার্বজনীন কবিতার মর্মবাণীই উচ্চারণ করিয়াছেন।

রাইনর মারিয়া রিলকে

ভালোবাসে যে মেয়ে :

এই আমার জানালা। এখনই
জেগে উঠেছি এত হাল্কাভাবে।
ভাবলাম, শূন্যেই ভর রাখব।
কোন্‌খান পর্যন্ত যায় আমার জীবন
আর কোথা থেকে শুরু হয় রাত ?

মনে করতে পারতাম, সব
আমিই তো চারিদিকে ;
স্বচ্ছ যেন স্ফটিক খণ্ডের
গভীরতা, অন্ধকারাচ্ছন্ন, নির্বাক।

আরো পারতাম তাদের
আমার মধ্যে নিতে ; কত বড়
মনে হত আমার হৃদয়টাকে ; অত খুশীতেই
ও আবার ছেড়ে দিত তাকে,

যাকে আমি হয়তো ভালোবাসতাম
হয়তো ধরে রাখতে গিয়েছিলাম।
অথচো, যেন কখনো বর্ণিত হয়নি,
আমায় তাকিয়ে দেখছে আমারই অদৃষ্ট।

উত্তরসূরী

কী আমি ; এই
অনন্তের নীচে,
এই টুকরো মাঠের মতো সুগন্ধি,
এ-দিক ওদিক চালিত,

যে আমি ডাক দিয়ে জয় পাই
পাছে কেউ শুনে ফেলে,
আর যার অন্তের মধ্যে
মিলিয়ে যাওয়া নির্ধারিত।

ভেনিসে হেমন্ত :

এখন শহরটা নয় আর বড়শীর টোপ,
যাতে ভেসে-ওঠা সব কটা দিন গেঁথে তোলে।
কাচে মোড়া প্রাসাদগুলি আরো ঠুনকো ঝনঝনায়
তোমার দৃষ্টিপাতে। বাগিচাগুলি থেকে ভোলে
গ্রীষ্মটা, যেন একরাশ পাঁচালী পুতুল,
ঝুঁকে পড়া মাথা, ক্লান্ত, হৃত প্রাণ।
কিন্তু, তলা থেকে পুরনো বনের কঙ্কাল হতে
উঠে আসতে ইচ্ছে, যেন হাতাহাতি
সমুদ্রের সেনাপতি তাঁর অনিদ্র অস্ত্রসংগ্রহে
ডিঙার সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়ে নেন,
পরের দিনে ভোরবেলায় বাতাস
আলকাতরায় কালোতে রাঙিয়ে দিতে বহর সাজিয়ে,
যে বহরটা দাঁড় ফেলে চলতে চলতে
হঠাৎ পেয়ে যায় জোরাল হাওয়া,
সব নিশান এক সঙ্গেই ওড়ানো, উজ্জ্বল, আপদ্।

অনুবাদ : পুণ্যশ্লোক রায়

গ্যটেকে লিখিত শিলের-এর চিঠি

Jena, 23rd August 1794

মান্যবরেষু

আপনার সঙ্গে আমার সাম্প্রতিক আলোচনা আমার সমস্ত চিন্তাধারার সূত্রগুলোকে গতিদান করেছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমি যে-সব বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক ছিলাম, সে-চিন্তাধারার সঙ্গে এ-গুলো সম্পর্কিত। আপনার মনের ধ্যানধারণার দ্বারা (আমার মনে যে সামগ্রিক প্রভাব আপনি চিন্তার দ্বারা সঞ্চারিত করেছেন—সেই কারণেই বলছি) কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোক সম্পাত করা হয়েছে। এ-গুলো আমি কখনও ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি, বস্তুনিষ্ঠ অসংখ্য চিন্তার কেন্দ্রস্থানগুলির বোধবিষয়ে আমার অভাব ছিল। আপনি আমাকে ঠিকপথে পরিচালিত করেছেন। আপনার সদাজাগ্রত চোখ সর্বদাই বস্তুর ওপর আবদ্ধ। আপনি কখনও ভ্রান্ত পথে চলবার ঝুঁকি নেন নি, এর কারণ এই যে স্বভাবতঃ নানারকম পরীক্ষা এবং মধ্যস্থতার ভেতর দিয়ে এসে আত্মশক্তিনির্ভর প্রজ্ঞার এসে এ-গুলো উপস্থিত হয়েছে। আপনার স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি সবকিছুই নিরীক্ষণ করে, এগুলি আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে বিশ্লেষণের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করি, সংক্ষেপে বলতে গেলে আপনার মধ্যে একটা অখণ্ড পূর্ণতা আছে। এই পূর্ণতার প্রাচুর্যবোধ আপনার কাছে হয়ত অজ্ঞাত আর আমরা শুধু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্লেষণই করতে পারি। আপনার মত বুদ্ধিজীবিরা কতদূর অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন তা হয়ত অনেক সময় ধরতে পারেনা তারা, আরও ধরতে পারে না কত কম যুক্তি দর্শন শাস্ত্র থেকে আহরণ করা হয়েছে। একদল লোক আছে যারা তৈরী জিনিষকে শুধু ব্যবচ্ছেদ করতে পারে, বিশ্লেষণকারীরা শুধু বিশ্লেষণই করতে পারে। অন্ধকার গর্ভে সত্যবোধের পূর্ণ যুক্তিতে পরিচালিত হয়ে মনীষীরা বস্তুনিষ্ঠ নিয়মের সঙ্গে নিজেকে পরিচালিত করে।

এটা ঠিক, বহুদূর থেকে আমি আপনার মনের অগ্রগতি লক্ষ্য করেছি। নতুন করে আপনাকে অনুভব করছি এই জন্য যে আপনি আপনার নিজের পথ নিয়েছেন। প্রকৃতির মাঝে বিভাবিত সত্য আপনি খুঁজছেন। আপনি

অত্যন্ত দুরূহ কাজ গ্রহণ করেছেন। কারণ দুর্বলচিত্ত লোক যে কোন মুহূর্তে এর মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। আপনি সমস্ত প্রকৃতির সত্তাকে এক করবার চেষ্টা করেছেন। উদ্দেশ্য, আলো যথাযথ স্থানে ছড়িয়ে পড়ুক! প্রয়োগের দ্বারা সমগ্রের মধ্যে আপন ব্যক্তির মূল্যকে ব্যাখ্যা করবার আশা করছেন। সাধারণ জীবনযাত্রার সহজ সড়ক ছাড়িয়ে ক্রমশঃ আপনি আরও গভীরে চলে যাচ্ছেন।

উদ্দেশ্য এই যে শেষ সীমান্তে সমস্ত বস্তু দিয়ে আপনি প্রকৃতি ও মানুষের জটিলতার মধ্যে বৃহৎ সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। একে আপনি নতুনভাবে প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান। মহৎ ও সত্যকল্পনার সাথে আপনার বুদ্ধিমত্তা মিলিত হচ্ছে একটা সুন্দর ঐক্যের ধ্যানধারণায়। আপনি কখনও ভাবতে পারেননি যে আপনার জীবন এত ব্যাপকভাবে একটা লক্ষ্য পথের সীমানায় বিস্তারলাভ করবে, তাছাড়া প্রতি জিনিষ সম্পূর্ণভাবে শেষ করবার পর প্রত্যেক পথে আপনাকে নূতনভাবে উঠতে হচ্ছে এবং আপনি Illiadএ Achillesএর বদলে Pythia ও অন্যরূপ বেছে নিয়েছেন। আপনি যদি গ্রীক এমনকি ইটালিয়ান হয়ে সুন্দর প্রকৃতি ও আদর্শ শিল্পচর্চার মাঝে পরিবৃত থাকতেন তাহলে আপনার যাত্রাপথ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত; বস্তুর অপরিহার্য গঠনের চেয়ে বস্তুকে আপনি যখন প্রথমেই চিন্তা করতে শিখেছিলেন তখন সেই অভিজ্ঞতার মহৎ বোধ সেই দিকে তা হলে পরিচালিত হত। কিন্তু যেহেতু আপনি জার্মান, জার্মান হিসাবে সেই গ্রীক প্রতিভা নর্ডিকের মাঝে প্রবাহিত হয়েছে। যদি না হত তা হলে বাস্তব সত্যের অভাববোধ আপনার প্রতিভা দিয়ে পূরণ করতে হত এবং সহজজ্ঞান ও বিচারশক্তি দিয়ে নর্ডিক হিসাবে আপনাকে হয়ত এক গ্রীকমানসকে বিকাশ করতে হত।

নানারকম অপর্যাপ্ত রূপের দ্বারা পরিবৃত হয়ে জীবনের মধ্যে যখন অন্তরের সত্তা ভিতরের সত্তার দ্বারা নিজেকে বিকাশ করে সেই সময় আপনি এক আদিম ও নর্ডিক প্রকৃতি আহরণ করেছিলেন। কারণ আপনার দুর্দমনীয় প্রতিভা পার্থিব জিনিষকে অতিক্রম করে অন্য এক দুর্জ্ঞেয় অভাব বোধ করল এবং বাইরে স্বীকৃতি পেল গ্রীক মননশীলতার সাথে পরিচিত হ'য়ে।

এই সময় আপনাকে নিম্ন নীচ সত্তাকে পরিশীলিত করতে হয়েছে।

এ আপনার কল্পনাকে বিক্ষিপ্ত করেছিল। আপনার সৃজনী মন উত্তম বোধকে এ-ভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য এগুলো করায়ত্ত করতে হলে কতগুলি স্থির ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই তর্কনিষ্ঠ চিন্তাধারা ঠিক পথে অগ্রসর হতে বাধা হয়! অনেক সময় অবশ্য সৌন্দর্যবোধের সাথে মিল খায় না। তবুও তর্কনিষ্ঠ জ্ঞানবোধ কৃষ্টির একচ্ছত্র মাধ্যম। আপনি আরও অগ্রসর হয়ে কাজ করেছেন।

বলতে গেলে মোটামুটিভাবে আমি আপনার মনের বিস্তৃতির অনুসন্ধান করি। এই বিষয়ে আমি ঠিক বলছি কি না তা আপনিই যথার্থ বলতে পারবেন। আপনি কদাচিৎ যা জানেন তা হচ্ছে এই যে দার্শনিকবৃত্তি এবং প্রজ্ঞাজনিত সৃষ্টির মধ্যে সুন্দর জড়িত। অবশ্য প্রথমে মনে হবে যে বিশ্লেষণমূলক মনের চেয়ে দুই প্রান্তিক চিন্তাধারা কী ভাল হতে পারে না? সহজজ্ঞান এবং অখণ্ডবোধ থেকে এ উদ্ভূত হয়ে এ দুটী জিনিষ বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়। যদি দুই পরস্পর বিপরীত ধীর ও সৎভাবে অভিজ্ঞতার সন্ধানে অগ্রসর হয় এবং সহজজ্ঞান স্বচ্ছন্দে বুদ্ধির সাহায্যে পরিশীলিত হয় তাহলে তা মাঝপথে অবশ্যই পরস্পর মিলিত হবে। সহজ অনভূত জ্ঞান ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্লেষণ করা মন একাধিক অনুষঙ্গের সাথে জড়িত। সহজ-অনভূত হৃদয় যদি প্রতিভার দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় এবং প্রয়োজনের সামগ্রী বহুজনের অভিজ্ঞতার মাঝে অনুসন্ধান করে তা হলে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে তা বহু বিশিষ্টতায় সমৃদ্ধ। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিশ্লেষণকারী মন যদি প্রতিভার দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় এবং অভিজ্ঞতার ক্ষতি স্বীকার না করে উন্নতমার্গে উঠতে চায় তাহলে এ একাধিক রূপ প্রকাশ করবে; যদিও তাদের মধ্যে জীবনের স্থিতি এবং বাস্তব বস্তুর প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক মেনে নেবে।

আমার মনে হচ্ছে চিঠির বদলে আমি একটা নিবন্ধ লিখছি। এ বিষয়ে আমার আকর্ষণ আছে বলে আমাকে মাপ করবেন। যদি এ আয়নায় প্রতিকৃতি আপনি চিনতে না পারেন তাহলে এই প্রসঙ্গে আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব তা মুছে না ফেলতে।

ভবদীয়

আপনার বন্ধু শিলের

অনুবাদ: শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

কবিতাবলী

জার্ণাল

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

তোমাকে স্মরণ শুধু ছুঁয়ে যেতে মনে অন্ধকার
ছিল যা গানের আলো পথে সার-সার
বর্ষায়, শিশিরে, ঝড়ে, নিভে গিয়ে সব
স্মৃতিহীন এখন নীরব।

তোমাকে স্মরণ শুধু ছুঁয়ে যেতে জন্মের শরীরে
খানিক আনন্দ-ইন্দ্রজাল
হয়তো মৃত্যুর সুখে—যা আমাকে ঘিরে
আমার জন্মের আগে বসন্তের লাল ॥

॥ দুই ॥

নারকেল গাছের নিশান
দেখায় সমুদ্র কাছাকাছি।
দূরে দেখা করে যায় দুইটি ঘোমাছি—
ঢেউ আসে, শুনি স্তব্ধ গান।
নিরন্তর রাত্রি আর দিন
বোনে শুধু এলাচী দক্ষিণ ॥

অপ্রেম

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

যখন ঘুমোলো সে-ও কৃষ্ণকায়ে একা
তখন অদৃশ্য হল তার দেহজ্যোতি—
অন্ধকার জানোয়ার মুহূর্তেই দিল তার দেখা
এবং শুকিয়ে গেল প্রাণধারাপূর্ণ স্রোতস্বতী ;

সে তখন প্রেম নয়, গান নয়, নয় ভাল কিছু :
পৃথিবীর গন্ধময় ভালবাসা, রক্ত অনুরাগ,
সাগরের নীল ছায়া ; নীল আবহাওয়াটার পিছু
ঘুরেও পেল সে ব্যথা হৃদয়েতে দুখও দুভাগ—

এমন কি যে তাকে কিংবা যারা যারা ভালবাসতো তাকে
তার জাগরণে যেন মুহুর্মুহু শান্তি পেত ঘুমে—
তারাও মোমের মত ব্যর্থ অবয়ব নিয়ে হাঁকে,
যে হাঁকে শুকোয় মাঠ পরিপূর্ণ করিতে গোধূমে ;

সে যখন ফিরে এল জেগে জেগে, জ্ঞানপাপী তখন অচেনা,
অর্থবিত্ত বহু তার তবু পূর্ণ অপ্রেমের দেনা।

চিরন্তনী

জ্যোৎস্না ভড়

সারারাত গান গেয়ে আকাশ ঘুমলো এই কিছুক্ষণ আগে
তাকে আর ডেক' নাক'। অন্ধকার ঘিরে থাক হৃদয় শরীর
শ্রাবণ তুমিও আর থেকে থেকে বিদ্যুৎ হেনে জাগিও না, না
দু'চোখে যতই যেন ছড়া কাটো, জাগাতে পারেনা কোন মতে।

উত্তরসূরী

সময়, শিশির, মন একে একে ঝরে। লিখে রাখার নামতা
সবুজ কাগজে রাখি (হয়তো জাগবে) কবে পৃথিবী নিজেই
সব কথা জেনে ফেলে, মন তার পায়না খবর। আমি সেই
সুর নিয়ে ছায়াপটে প্রহরে প্রহরে ছবি ফেলে জাল বুনি।

ঘড়ির ডায়ালে কাঁপে কাঁটা। হাজার বছর পর এ হৃদয়
পুরনো পুঁথির মত তামারঙে গলে যাবে ঠিক একদিন
(মোমের পুতুল যেন) জল-ঝড়ে বহু পথ হেঁটে হেঁটে এসে
এখন ঘুমাক সে—না. আজ আর জাগাতে পারেনা কোনমতে।

•

স্মৃতির দিনগুলি

সুস্নিগ্ধ মুখোপাধ্যায়

দিনের স্মৃতিগুলি ভেসে আসে
রাত্রির নিঃশব্দ জোয়ারে
অসংখ্য নিঃসঙ্গ ঢেউ
আর অস্পষ্ট ফেনা
তার চেতনায়

মৌন সাম্রাজ্য তার অরণ্যের মতো
মরুভূমির বালির কণায়
তার চোখের তৃষ্ণা
মৌন জিজ্ঞাসা তার গাছের পাতায়
হাওয়ায় উড়ে যায় পাখি
তার আকাঙ্খার ডানা

দিনের স্মৃতিগুলি শুধু অথৈ জলরাশি
রোদ্দুরে সোনার পাহাড়

স্মৃতির দিনগুলি

ভিন্‌দেশী কোন এক নাবিক
ভাঙা-তরী ছেঁড়া-পাল
ভেসে ভেসে আসে
তার কাছে
গাঢ় নীল ফেনা
সেই নাবিকের চোখ

ও ছুঁতে চায় কি দুঃসাহসে
পেতে চায় কি গভীর ইচ্ছায়
ও শুধু তাকিয়ে থাকে
ঢেউফেনা সমুদ্রের দিকে

এ দিকে রোদ্দুরে পড়ে তার নগ্ন দেহ
লোনা হাওয়ায় ভেজে চোখ
টানটান পেশল বাহু
মুঠোও শিথিল
ছলছল অবিরাম জল

ভেসে আসে স্মৃতির দিনগুলি
নিঃশব্দ জোয়ারে
অসংখ্য ঢেউয়ের দল
আর গাঢ় ফেনা ॥

প্রথম বৃষ্টি

ফণিভূষণ আচার্য

কি যেন সে পাবে বলে সমুদ্রের কাছে
বুকের আগুনে জ্বলে পিপাসার আনাচে কানাচে
নিজেকে সঁপেছে প্রেমে। তাইতো সে সমুদ্রকে ভালোবেসে রাতে
শরীর ভোবালো তার। আদিগন্ত তরঙ্গ-সংঘাত

উত্তরস্থরী

সে নারীর শীর্ণ তনু অভিষিক্ত হলো, যেন পৃথিবীর মতো
প্রথম বৃষ্টির স্বাদে সারা দেহে তরঙ্গিত হলো এক
প্রতীক্ষার রমণীয় ব্রত।

কি যেন সে পাবে বলে অন্তহীন পিপাসার বুকে
সমর্পিত হলো রাতে। তারপর চোখে, মুখে এবং চিবুকে
দুঃখ-বিস্ময়ের চিহ্ন পরে শেষে একবিন্দু আলো
দুহাত প্রার্থনা করে ধীরে ধীরে সে আপন শরীরে তাকালো
বিস্মিত দুচোখ তার সূর্যমুখী প্রভাতের মতো হলো স্থির
সে জানেনা সমুদ্রকে ভালোবেসে অন্ধকারে
কখন সমুদ্র হয়ে গেছে তার অকূল শরীর।

এই খরস্রোতে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বিদায়ের অন্ধকারে চলে গেল যদি সহচরী
দুচোখের দীর্ঘছায়া ঢেকে দিলো আমার আকাশ,
কালের পাথরে এই নক্ষত্রের আহত তিমিরে
উৎকীর্ণ প্রশ্নেই ক্ষত-বিক্ষত হলো যে অবকাশ।

না, তাকে বলবোনা তবু : জানো তুমি সমস্ত শিখর
ভেঙেছে চুরমার হয়ে তোমার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে
বন্য-হরিণের মত রক্তাক্ত আমার ভালোবাসা
চিতার থাবায় ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে ঘাসে!

না, তাকে বলবোনা তবু : স্মরণের অন্তহীন মরু
তুমি কেন রেখে গেলে, ঋতুতে ঋতুতে কতোবার
সকলই পুষ্পিত হলো, আষাঢ়ের মেঘের ডম্বরু
আমার বাগানে কেন আনলোনা কদম্ব-বাহার!

বরং নদীর কাছে ফিরে যাবো। অন্ধকার জলা
মৃত্তিকার মত বইবো ; নিয়ে যাবে ধূ-ধূ চড়া হতে
আমার প্রেমের শব এ-জীবন—বেহুলার ভেলা,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিয়ে যাবে দূর গাঙে এই স্বরস্রোতে।

দূরবর্তিনী

সুশীলকুমার গুপ্ত

জীবনের নীড় থেকে তুমি উড়ে গেছ এক পাখির মতন,
কাছের সংসার ছেড়ে সুদূরের দুরন্ত তারায়
এবার তোমার যাত্রা সুরু হল বুঝি !
তবুও তোমার স্মৃতি
দিনরাত্রি নিয়ে খেলে অসহ উল্লাসে,
একান্তে ঝরায় স্বপ্ন
প্রাণের প্রান্তর বুকে সমবেদনার করুণ হাওয়ায়,—
রাঙায় গভীর ম্লান মন।

তোমার দেহের রক্তে ভ'রে যায় কামনার রাত,
চোখের ঝিনুক থেকে নামে স্নিগ্ধ রূপালী শিশির
স্বপ্নের কুসুমঠোটে,
চুলের দিগন্ত বেয়ে ঝড় এসে ছোঁয় ভীরু নীড়,
নির্জনতা জড়ায় দু'হাত।

তোমার আমার
ভিতরে আছে কী আর কোন ভুল স্বপ্নের আড়াল ?
এত রঙ, এত গান, আলো
শুধু ধূ ধূ মরীচিকা, শূন্যগর্ভ হাওয়ার খেয়াল ?
যে যাই বলুক আমি দূরের তোমাকে ভালবাসি,
তোমার স্মৃতিতে ভ'রে আছে এই কাছের সংসার,—
এই সুখ, এই শান্তি, ভালো।

সমগ্রতা

আলোক সরকার

দেখেছিলুম আকাশভরা মেঘের দিন, একটি উজ্জ্বলতা
শরৎ কালের আলোর সমধর্মী।
এবং সেই প্রাচীন অশথগাছেও সেদিন হাজার-হাজার
সবুজ পাতা জেলেছিল ছন্দময় নিবিড় সমগ্রতা।
রাঙা ধুলোর নীল হাওয়ার অসীম উপহার
প্রান্তরের বিশালতায় সম্মিলিত প্রতিশ্রুত শুভ্রতায়।

অন্ধকার সিঁড়ি থেকে নেমে এসে সদর দরজায়
কিশোর প্রতিবাদ। তুমি তাকে রেখে ঘরের বাইরে যাচ্ছো?
সমস্তদিন ভালোবাসার অভিব্রতায়, এখন ভালোবাসা
তাকে তুমি আন্তরিক দূরে রাখো। ওদিকে পথে-পথে
সঞ্চারিত জ্যোৎস্নালোক, প্রবাহিত আকাশ, দীর্ঘ ভাষা
প্রস্তাবিত সমারোহে সমর্পিত সমন্বয়ী ব্রতে।

বিবিধ রঙ, বিচিত্রিত রেখা কিন্তু স্বাভাবিকের।
প্রেমিকাকে নিয়ে তুমি শালবনের গভীর একাগ্রতায়
বিবেচিত স্রোতের সহজতায়। সংহতির অরব আনন্দের
ধ্বনি যেন উন্মোচিত নীল শিখায় হৃদয়ময় যায়
এলোমেলো পাতার ছায়া তোমার প্রিয়ার মুখের উপর
চন্দনের মতন মাত্র। তুমি অমল অসংশয়ী যাও।

অন্ধকার পথের মধ্যে আলোকিত একটি কিশোর ঘর
এবং সেই গোলাপ-ভরা ফুলদানীর সৌরভের স্মৃতির
রেখাগুলো স্পষ্ট মুছে ফেলো। প্লাবিত সেই পরিশুদ্ধ মন্দিরের

সমগ্রতা

কাছে এলে পুরোহিতের প্রথর তিরস্কার।
দেখবে সেই নিমগ্নতা স্থগত চোখ, যেন বিশাল ভয়ের
মতন এক হাওয়ায় তোমায় নিয়ে যাবে
যেখানে হীন অবরুদ্ধ অনাশ্রয়ী আর্ত অন্ধকার।

অন্ধকারে

চিত্ত ঘোষ

আলো নিবিয়ে দিলে কথা বলা যায় :
'এই শোন্, আয়'—
আজ রাত্তিরটা থাক
ওর মুখে ইচ্ছার উজ্জ্বল দাগ।

ওর মতিগতি বোঝা যায় না :
অন্ধকারের মত গভীর।
কেমন যেন ভয় ভয় করে
যদি কিছু হয়!

যদি ভালো লাগে
ঠাণ্ডা অন্ধকারে ডুবে থাকতে যদি ভালো লাগে
রোমাঞ্চের স্বাদে যদি শরীর ভরে যায়
যদি ঘুম পায়!

বাতাসের বন্যায় অন্ধকার উথলে ওঠে
রাত্রির খনিগর্ভে দুর্লভ হীরা জ্বলে।

দুটি কবিতা

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

সে এক অবাধ্য মেয়ে।

অলস সূর্যের নীচে রোদে পুড়ে সারাদিন
টো টো করে পৃথিবীকে নিয়ে।
তার নাকি ভালো লাগে
এই গাঢ় রোদ রং গায়ে মুখে মেখে
স্নান করে নিজেকে শুকোতে,
ভালো লাগে চুপ করে একা বসে থেকে
দুপুরের ভালোবাসা পেতে।

॥ ২ ॥

জরাজীর্ণ দেয়ালের হিজিবিজি হিসেবের লেখা
স্মৃতি বয় শুধু, সেই পরিচিত গাঢ় অন্ধকারে।
ছায়া নামে ঘরে ঘরে, রাত বাড়ে রূপরচনায়—
মাটিকাটা মেঘে-ভরা ছড়ানো আকাশ আলোময়,
আলো জাগে তার ঘরে, আকাশেও সাড়া নেই কোন।

তুমিও এখানে নেই ; তবু আসে অব্যর্থ সকাল।

পরস্পর

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কে বলে আমাকে তুমি খোঁজোনি ঘনিষ্ঠ প্রয়োজনে !
যখন আকাশময় সংশয়ের গর্ভ-অন্ধকার
মজানদী লুপ্তপ্রাণ, শুষ্ক গাছে ছায়ার বিকার,
তৃষাদীর্ণ চৈত্রদিনে আজো তুমি ডাকো সঙ্গোপনে ।

হেমন্তের গোধূলিতে, কার্তিকের হিমেভরা রাতে,
স্মরণজড়িত শীতে, বসন্তের আরক্ত প্রহরে
নিজেকে ছড়াও তুমি বার-বার সারা চরাচরে,
নির্জন মুহূর্তে রাখো শুভ্রহাত রক্তঝরা হাতে !

গোপন শান্তিকে খুঁজে সমস্ত পৃথিবী দিশেহারা,
বঞ্চনার অন্ধকারে যদিও অপূর্ণ মনস্কাম,—
সমস্ত উষ্ণম আজ গড়ে তোলে একটি চেহারা,
তুমি, আমি একাকার, যে-উষ্ণমে সাগর উদ্দাম ।

পরস্পর দূরে আছি, তবু যেন আছি কাছাকাছি,
সময় সমুদ্রে দুটি ঢেউ হয়ে উভয়েই বাঁচি ॥

হরিণের রং

প্রতিমা পাল

বসন্তের এই গল্প শেষ হলে পরে
কিছুই থাকেনা বাকি । রাত্রির প্রহরে
বিবর্ণ মৃত্যুর স্বাদ পাওয়া যায় চৈত্র
অস্বচ্ছ কাঁচের মত শীতল চাঁদের ।

উত্তরসূরী

পৃথিবীর সব স্বাদ হিম মনে হয়
প্রৌঢ় বাঘের শরীরে। যা হবার নয়
সেই নটে গাছ মরে যায় অবাঞ্ছিত
হলুদ পাতার ভিড়ে। প্রত্যাহের মত
নিরঙ্কুশ সুখে স্থির নদীটির ডানা
মুছে ফেলে শিশিরের জলের ঠিকানা।

এই বসন্তের গল্প শেষ হলে পরে
উড়ে আসে শ্রান্তিহীন শীতের চুপুরে
যাযাবর বুনো হাঁস। কিছু থাকে বাকি
এ মন আকাশ হয় এ মন জোনাকি।

ছবি

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

শিউরে ওঠা রোদ্দুর ধূসর ধোঁয়া বৃষ্টি-ধোয়া রাস্তা, মন্থর ট্রাম থেকে অপলক দুটি চোখ মেলা, সেই বেলা এক ঝলক হাওয়া আমাদের অপ্রত্যাশার মতো একটুক্ষণ স্তব্ধতা মুহূর্তধ্যানে স্পন্দিত হল—একটু ক্ষমা-নিষ্ঠুরতম সুন্দরের চকিত অপসরণ—তাই নিয়ে বাড়ী যাবো। নির্মম ঘুমে মুছে যাবে জন্মান্তরের সেই মুখ—হঠাৎ স্বপ্নের মতো স্মৃতির মুখোমুখি আর একবার দাঁড়াবো যে আমার চিরকালের চেনা।

কোনো একজনের উক্তি

শামসুর রাহমান

তোমার নিভৃততম মুক্তো ছিঁড়ে নিতে হৃদয়ের
আমার উদ্যম, ইচ্ছা সাধ
স্বর্ণ-ঈগলের মতো পাহাড়ের নীলে
অপেক্ষায় তীক্ষ্ণ রাত্রিদিন।

অবশ্য অন্তিমে জানি ফিরে যেতে হবে
তোমার আশ্বিন হ'তে কোনো
বেদনায় নিঃসীম আষাঢ়ে।
কেননা প্রবল জনরব :
ঐশ্বর্যের অপরূপ স্বর্গীয় উদ্যানে
বরাহের অধিকার কেবলি গুজব ;
সারসত্য অন্য কিছু বটে
সাবেকি কিংখাবে মোড়া ভীষণ উজ্জ্বল।

তবু অন্ধ রাত্রির নিঃসঙ্গ উর্ণনাভ
গোপনে হৃদয়ে নেমে আসে
পূর্ণিমার আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে
ঘুর্ণিবায়। তোমার দুর্লভ স্পর্শে যদি
অমরতা নদী হয়ে, তরল জ্যোৎস্নার ঝর্ণা হ'য়ে
হাওয়া হয়ে ঝরে
আমার সত্তায়, তাই
তোমার সান্নিধ্য খুঁজি, বিরূপ কাঁটায়
ফুটিয়ে রক্তের ফুল আসি এ উদ্যানে,
প্রত্যাখাত, দুর্বিনীত কুকুর যেমন
বারবার আসে ঘুরে ঘুরে
উৎসবের বিপুল আলোকে।

নিজেরই যে মিত্র নয়, উপরন্তু সংশয়ের বিষ
সঞ্চারিত যার মনে, দুদিকে পুড়িয়ে মোম হেলায় যে ভাবে
প্রলয়ের যন্ত্রণা মধুর,
তাকে কেউ দেয় কি ঘেঁষতে ত্রিসীমানায় ?
অতএব তোমার স্পর্ধিত নিষেধের
হিংস্র তমসায়
নেই ক্ষোভ। নন্দিত স্বপ্নের মাঠে যে বৃক্ষ স্পন্দিত, সারাক্ষণ

উত্তরসূরী

আছেন দাঁড়িয়ে, তার পাতা
ধ্বনি হোক, সবুজ নক্ষত্র হোক তারা
হৃদয়ে আমার, বিশ্বে
প্রজ্জ্বলন্ত, অফুরন্ত—চেয়ে দেখি শুধু।

প্রতি পল অনুপল যে তীর্থের অভিসারী আমি,
হয়তো সে তীর্থ নেই সময়ের নীলাভ সীমায়
অথচ আমার যাত্রা আজো
বসন্তের সজীব ফুলের মতো দীপ্ত, উন্মোচিত
অন্তহীন রৌদ্রের তৃষ্ণায়।

কিন্তু তবু মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে, এবং গভীর
কৃষ্ণ গোলাপের মত অন্ধকারে তুমি সঞ্চারিণী
দৃশ্যের বৈভবে আর সমস্ত চৈতন্যে যেন তোমার চোখের
অপরূপ মহানিশা কাঁপে॥

কবিবন্ধু-কে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

একাই থেকেছে মুক্ত আপন পৃথিবী গড়ে নিতে
স্বল্পকথা অন্তমনে, যেন-বা সে হেঁয়ালী আকাশ
নির্ভুল উপমা তার। আত্মমগ্ন স্বগত সম্বিতে।
পুরু পরকলা চোখে সমুদ্রের ধূসর বাতাস

ঐশ্বর্য মেঘের ঘরে। সমন্বিত রৌদ্রে আঁকা ছবি।
বিকেলবেলার পাখি নীড় পায় গোধূলির গাছে।
পায়ের মিছিল ফেরে ক্লান্তরঙে অবসিত সবি;
আজন্ম নিয়মী তৃষ্ণা তবু দেখ ধ্রুব আলা আছে।

কবিবন্ধু-কে

শাহরিক দোলাচলে ছত যোষ ম্লান কৃষ্ণচূড়া,
রক্তে এক স্বচ্ছ ফুল অন্তহীন দৃষ্টি নিয়ে ফোটে ;
দূরান্বয়ী আভা লাগে, মনোময় ইচ্ছার অনূঢ়া,
বিবর্ণ সন্ধ্যার ছাদে তিলোত্তমা হাসি রাখে ঠোঁটে।

নির্জন নদীর গান তন্ময় শান্তির বুকে টানে—
সেই তাকে ভালোবাসে, প্রাণতায় গভীর উজানে॥

ব্যর্থ মীমাংসা

বংশীধারী দাস

মীমাংসার সেতু
খুঁজে আর পেল না, যেহেতু
বৈষয়িক কূট বুদ্ধি অনায়ত্ত তার,
প্রস্তাবের বিন্দুগুলো সরল রেখার
সহজ সিদ্ধান্তে নয়, তাই
ব্যর্থ হলো সকল আশাই।

ব্যর্থ হলো সকল আশাই,
যেহেতু শত্রুর মুখে ছাই
দিয়ে আর লোকলজ্জা ভীরু লোকভয়
কোনোদিন জয়
করতে পারেনি তার বায়ুগ্রস্ত মন—
এবং যখন
শাস্ত্রবাক্য ভুলে যেতে শেখেনি বিচারে
এবং যেহেতু ব্যবহারে
চাণক্যের প্রজ্ঞা তার অনায়ত্ত, তাই
লক্ষ্যভ্রষ্ট সকল চেষ্টাই।

মীমাংসা সুদূর,—অতঃপর
যা করে ঈশ্বর।

দ্বিতীয় জন্ম

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সনির্বন্ধ অনুরোধ, তুমি একবার এসে স্তাখো
টলটল তৃষ্ণায় সেতু পার হচ্ছে কামুক সংসার,
পিঠে ঝাপ্‌টা এসে লাগে জীবনে বা কাঙাল বাসনা,
টান ধরে কোমরে পাছায় আর শূন্য একটি নিভন্ত শক্তিতে,
জোয়ারি মেঘনায় মেলে কুটুম্বিতা বুঝি, ফিরতে বলা।

আমার চারদিক দুলছে নবীন শরবনে, বেত, সর্ষেক্ষেতে,
কিছু কিছু পাখি পুরোনো বন্ধুর মত শোকতাপ লাগতে দেয় না,
সামান্ত আড়াল করে দাব্‌না ঢেকে প্রকাণ্ড সূর্যকে।

তোমার কাছে থেকে আমার বেলাও গেল নিছক চিনতে,
ভালোবাসতে লম্বিষ্ট এক অনিমেষ মেলার চতুর্দিক।
ইচ্ছে হল, শাদা সুপারির লম্বা একটি বনের ভিতর যাবো,
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবো ওদের, নিবিড় নয় একলা একলা প্রাণ।
বুকের কোষে রক্ত ফুটবে, ঝর্ণা, তোমার আল্‌তো যাওয়া আসা
মন পোড়াবে বাঁশের পাতার মতন কোনো ভূমিষ্ট দাসত্বে।
তোমার কেমন উড়ন্ত আর আলগোছে সব ভালোবাসার কথা
আজ ফিরছে মাছছোঁয়ানি স্মৃতির মধ্যে শোকের চিহ্ন ঢেকে।

বড় গভীর সুখে থাকছি, চতুর্দিক ডাগর চোখে বন্দী—
নদীর চোখ, মাছের চোখ, নবীন সবুজ আযোজনের লক্ষ চোখের
আদর মায়ার কোলের উপর তুই একটি শিশু।

রোগশয্যায়

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

আমার দক্ষিণের দুয়ার অবারিত আছে
কোন পাপোষ নেই বাইরে যে প্রবেশে পাবে বাধা
বিনা অনুমতিতেই ঘরে এসো নিঃসংকোচে :
ক্ষমা করো যদি তোমার সম্মানে
ফুল না রেখে থাকি ফুলদানীতে
আমি কেবল অবারিত রেখেছি আমার দক্ষিণের দুয়ার
আপন অনায়াসে আমার ঘরে এসে
মৌমাছির মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াও চারদিকে
অথবা বসো এক কোণে মগ্ন হয়ে হাঁস যেমন করে জলে ভাসে—
যা তোমার খুশি

আমি বুক ভরে নেব তোমার দেহের মৃদু সু
তোমার নিঃশ্বাসের অস্ফুট মর্মর শুনব কান পেতে
আর চোখ মেলে দেখব তোমাকে
দেখব তুমি, এক বাসনার আগুন, একটু একটু আরও একটু করে
কায়া ছেড়ে মিলিয়ে যাচ্ছ ছায়ায়
এবং ছড়িয়ে পড়ছ সমস্ত ঘরময়
আলমারি টেবল চেয়ার যত আসবাব
টেবলে কাচের গেলাসে জল
জানালায় জানালায় উড়াল পর্দা—
সব কিছুতে যাচ্ছ মিশে
মিশে যাচ্ছ তুমি
যেমন করে জল কণায় কণায় মেশে বাতাসে

আর সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ঘরের সব কিছু

ধীরে ধীরে
বদলে যাচ্ছে আমারই চোখের উপরে
আর আমি কেবল মুগ্ধ নির্বাক দর্শক
দেখছি সবই যাচ্ছে বদলে
ক্রমান্বয়ে
কোন জিনিসই আর আগের রূপে থাকল না
থাকল না তাদের সেই পুরনো ব্যবহার্য গুণ
রূপান্তরিত

•

যেন এতক্ষণে
এতদিনে
ফুটে উঠল বস্তুগুলোর আসল রূপ
একে একে সব আবরণ খসিয়ে সব আভরণ ফেলে
কুয়াশার আড়ালে সূর্যোদয়ের মতো
নগ্ন
অকৃত্রিম
পরিশুদ্ধ
কাঠের আসবাবগুলো তখন উল্লসিত অরণ্য
গর্জমান সমুদ্র লাফিয়ে উঠল কাচের গেলাসে
জানালায় বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
প্রত্যেকটাই এক এক জ্বলন্ত শিখা
সবগুলির মধ্যেই যেন সেই তোমার বাসনার আগুন
তোমাকে এখন আর দেখতে পাচ্ছিনে
তবু তোমারই সেই গন্ধে ঘর ভরে আছে
এখনও শুনতে পাচ্ছি তোমার নিঃশ্বাসের মর্মর

তারপর নির্মোহ চোখে তাকিয়ে দেখি
আমার শূন্য ফুলদানী কখন ভরে উঠেছে ফুলের স্তবকে।

রবীন্দ্রসংগীতে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে কয়েকখানা পুস্তক পুস্তিকা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে খুব বেশী আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রসংগীতের এত ব্যাপক প্রচারের দিনে সঠিক শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব খুবই বেশী। সেজন্য এ বিষয়ে আলোচনা সময়োচিত বলেই মনে হয়।

যদি প্রারম্ভে খুব সহজ গান দিয়ে ক্রমশঃ কঠিনতর গান শিখলেই সমস্ত সমস্যা মিটে যেত তা হ'লে কথা ছিল না। সহজ থেকে ক্রমে কঠিন গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে স্বর ও ছন্দজ্ঞান আয়ত্ত করে না নিতে পারলে শিক্ষা পূর্ণ হয় না। গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি পরিষ্কারভাবে লিখতে পড়তে পারা প্রয়োজন। কারণ বহু রবীন্দ্রসংগীতের পরস্পর পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে আয়ত্ত গানের সংখ্যা যখন খুব বেশী হয় এবং মানুষের স্মৃতিশক্তিও যখন সীমাবদ্ধ, স্বরলিপিকে বাহন না করলে সুরভ্রষ্ট হাওয়ার সম্ভাবনা নেহাৎ কম নয়।

গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ সাধনাও করা প্রয়োজন। প্রথমে গান শেখার কথা ধরা যাক। গান নির্বাচনের জন্য সতর্ক থাকা প্রয়োজন। গান নির্বাচন সহজ থেকে ক্রমশঃ কঠিনতর হবে এটি হল মোটামুটি কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে গীতবিতানে যে ছটি পর্যায়ে ভাগ করে গেছেন—পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক—তা থেকে ছ ভাগে গান নির্বাচন করা উচিত। প্রচলিত রাগ-তালগুলি নির্বাচিত গানের আওতায় থাকা বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন পর্যায়ে রচিত গানের সংখ্যা অনুযায়ী নির্বাচিত গানের সংখ্যায় তারতম্য হবে।

তারপর আসছে কণ্ঠসাধনার দিক। কণ্ঠ সাধনার পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যা রবীন্দ্রসংগীতে স্বরক্ষেপনের পক্ষে সহায়ক। এজন্য বিভিন্ন রাগে ও বিভিন্ন তালে সরগম্ সাধনা ও ধ্রুপদ গানের চর্চ্চা সমীচীন মনে হয়। সরগম্ খুব পরিষ্কার ও স্পষ্ট উচ্চারিত হবে। লয় জ্ঞানের জন্য একই সরগম্ বিভিন্ন লয়ে করা যেতে পারে। বিভিন্ন লয় অর্থে দ্বিগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি। বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার্থীর উপযোগী একটি সরগম্ দেওয়া হল—

কাফি। ত্রিতাল

	সা	রা	জ্ঞা	মা	পা	ধা	পা	র্সা	র্সা	পা	ধা	পা	মা	জ্ঞা	রা	সা
	×				২				০				৩			
দ্বিগুণ :	সা	রাঁজ্ঞ	মা	পা	ধা	পা	র্সা	সরা	জ্ঞমা	পধা	পর্সা	র্সা	ধপা	মজ্ঞা	রসা	
	×				২				০				৩			
চৌগুণ :	সা	রা	জ্ঞা	মা	পা	ধা	পা	র্সা	র্সা	পা	ধা	পা	সরজ্ঞমা	পধপর্সা		
	×				২				০				৩ সপধপা	মজ্ঞরসা		

এই ভাবে যে কোনো রাগের সরগম্ই যে কোনো তালে করা যেতে পারে। আড়-ছন্দগুলি সু-শিক্ষকের অধীনে করাই সমীচীন।

ধ্রুপদ সংগীতে বাণী ও সুর প্রধান। এ দিক থেকে রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। রবীন্দ্রসংগীতে বহু ধ্রুপদাঙ্গের গানও আছে যেজন্য ধ্রুপদ গানের অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি শ্রেণীর গানও কিছু শেখা, বিশেষ করে শোনা ও পরিষ্কার ধারণা থাকলে ভাল। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, রবীন্দ্র সংগীতের জন্য আবার এ সব শেখার দরকার কি। যে কোনো শ্রেণীর গানেরই মূল কথা হল সুর ও ছন্দ। এ দুয়ের ওপর আধিপত্য অর্জন করতে হলে রাগসংগীতের প্রয়োজন আছে বৈ কি।

কণ্ঠসাধনার জন্য তানপুরাই উপযোগী। রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম অলংকরণকে আয়ত্ত করতে হলে তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠসাধনা করা প্রয়োজন। অবশ্য প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে যিনি কোনো সু-শিক্ষকের অধীনে চর্চা করার সুবিধে পান না, তানপুরার সঙ্গে অভ্যেস করা গোড়াতেই সম্ভব হয় না। সে-ক্ষেত্রে হারমোনিয়ামে শুধু স ও প এই দু পর্দায় সুর রেখে অভ্যেস করা চলতে পারে। তারপর স্বরজ্ঞান হলে তানপুরার সঙ্গে অভ্যেস করা সহজ হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্র সংগীতে আনুষাঙ্গিক যন্ত্র হিসেবে গানের প্রকার ভেদে পাখোয়াজ তবলা বা খোল উপযোগী।

প্রথম শিক্ষার্থীর জন্ত শিক্ষকের দায়িত্বও বড় কম নয়। গোড়ায় উল্লেখ করেছি, সহজ থেকে কঠিন গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ সাধনাও চলতে থাকবে, কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর গান নির্বাচন বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রসংগীতে গানের শ্রেণী বৈচিত্র্যের অভাব নেই। একই গলায় সব শ্রেণীর গান মানায় না। সেজন্ত যে গলায় যে শ্রেণীর গান উপযুক্ত হবে, তদনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। অবশ্ত সম্মিলিতভাবে (এক সঙ্গে অনেককে) শেখাতে হলে, এ দিক থেকে কিছু অসুবিধে আছে। যাকে বলে mass singing, তার গান নির্বাচন হবে স্বতন্ত্র। কাব্যের দিকও অবশ্ত বিচার্য। শিক্ষার্থী যে গানের কাব্যরস গ্রহণ করতে অসমর্থ, সে-গান পরে শেখবার জন্ত মুলতুবী রাখাই ভাল।

গানের ভাণ্ডার যখন বড় হয় এবং স্বরজ্ঞান ও ছন্দজ্ঞান আয়ত্তে আসে, তখন স্বরলিপির ওপর খানিকটা নির্ভর করে, ভাণ্ডারকে আরো বাড়ানো যায়। তার আগে নয়। স্বরলিপি থেকে গান তোলারও একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। তা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে আয়ত্ত-সাপেক্ষ।

প্রফুল্লকুমার দাস

ছেলে ভুলানো ছড়া

১

ঘুঘু ম'লো ঘুঘু ম'লো
আলো চা'ল খেয়ে
ঘুঘুর বিয়েয় যাবো আমি
পাটের শাড়ী নিয়ে।
মায়ে দিল তেল পানি
বাপে দিল বিয়া
রাজার বেটা নিতে এলো
বাগেশ্বরী দিয়া।
আয়রে ভাই চিড়া কুট খাই—
একটা চিড়া কম পড়লো
দাদার কাছে যাই।
দাদার আছে ভাইয়া বলদ
আমার আছে গাই!
দুই বোনে যুক্তি করে
লক্ষ্মীপুর যাই।
লক্ষ্মী দিল ধান দুর্বা
মালি দিল ফুল
এমন খোঁপা বেধে দেবো
হাজার টাকা মূল॥

২

হলদি গাছে জলদি ফুল
খালার বিয়ে মোহনপুর:
খালা গো খালা
ডালা কিনে দে

ও ডালা নেবোনো
কলসী কিনে দে !
কলসীর মধ্যে ঢোঁড়া সাপ
গুম্ গুম্ করে
তাই দেখে বউয়ের বাপ
দাঁড়ি মোচর পাড়ে ॥

আলেয়ার মা বাড়া বানে
আলেয়া খায় ক্ষুদ
গাছের আগে মোরগ ডাকে
কুক্‌কোরো কুক্ ॥

আজ ময়নার খেলাধূলা, কাল ময়নার বিয়ে
ময়নাকে তুলে নেবে ঢোলক বাজিয়ে।
ঘর ভরা ধান চাউল পুকুর ভরা পানি
ময়নাকে বিয়ে দিয়ে ঘরে আনবো টানি ॥

৫

পেয়াজের পাতা ঝিকিমিকি
গোলাপ ফুলের বাস্‌না
কেনো জামাই খাস্‌না !
এক বালিসে দুই মাথা
চ্যাংড়া বলে কয়না কথা।
যখন মেয়ের বুদ্ধি হ'বে
কপাট ঘুঁচিয়ে ঘরে যাবে ;
এক বালিসে দুই মাথা
ঘুরে ঘুরে কইবে কথা ॥

হেন্‌চা দুল্‌দুল্‌
কলমী চরে
রাজার বেটা
বাটুল মারে।
মারুক বাটুল,
শুকাক বিল—
সোনায় কৌটা
রূপোর খিল॥

ইন্নি ফুল বিন্নি ফুল
আরত ফুল কেশে
বেড়া ভেংগে গিন্নী পালালো
বউ মরলো হেসে।

এলতল্‌ দিয়া বেলতল দিয়া
বোড়তল দিয়া ঘাটা
শিয়াল দেখে বাঘ পালালো
হেসে মরলো পাঁঠা॥

৬

উত্তরেতে ডগোমগো
পশ্চিমেতে বাগ
পুঁটি মাছে ডিম পেয়েছে
পাহাড় সমান।

ছেলে ভুলানো ছড়া

১০

খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ী খেয়ে যাবে কি ?
গঙ্গাজল ক্ষীরের পায়েস মেনা সাইয়ের ঘি !
একটু সবুর কর রে খোকন লুচি ভেজে দি'
গামছা ফেলে দেরে খোকন কোমর বেধে দি' ।
আগে যায়রে মজুমদার পিছে যায় রে ভারী
মধ্যে মধ্যে যায় খোকন শ্বশুরদারের বাড়ী ।
শ্বশুরদারের বাড়ীতে রে বেতের বাঁধুনী,
তাতে বসে খায় পান দুর্গা ভবানী ।
দুর্গা ভবানী দুর্গা ভবানী তোমার ছেলের বিয়া
ঘর করগা ঘর করগা ফুলের মালা দিয়া ।
ফুলের মালা গন্ধের ভালা কোন সোহাগের বউ
হরিদাদার চৌচালা ঘর কুসুম ফুলের মউ ।

আয়রে পাখী লেজ ঝোলা,
খাবি দাবি দুধ কলা ।

দুধের বাটি তপ্ত
মাণিক হ'বে শক্ত ।

মাণিক যাবে রঙ্গে
বাঘ ভালুকের সঙ্গে ।
সেখানে গিয়ে কি করবে ?
কাঁদা খুঁচ খুঁচ মাছ ধরবে !

সংগ্রহ : আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

দেব রহস্য

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

মানুষ দুই রকম ঘটনার (Phenomenon) সম্মুখীন হয়। এক ধরণের ঘটনা তার পরিচিত এবং বোধগম্য—বলা চলে লৌকিক; অন্য ধরণের ঘটনা তার অপরিচিত এবং বুদ্ধির অতীত—বলা চলে অলৌকিক। শুধু ঘটনা নয়, প্রাণী বা অপ্রাণী, বিশ্বের সব কিছুই এইভাবে লৌকিক আর অলৌকিক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। লৌকিক ঘটনা বা বস্তুর সামনে মানুষ অস্বস্তি বোধ করে না, কিন্তু অলৌকিক ঘটনা বা বস্তুর সম্মুখীন হলে মানুষ বিমূঢ় এবং অনেক ক্ষেত্রেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই ভাব শুধু মানুষ না, প্রাণীমাত্রেরই লক্ষ্য করা যায়,—মানুষ শুধু প্রাণী-মানসের ঢেউ টেনে চলেছে মাত্র। ঘোড়া চাবুককে ভয় পায় ঠিক, কিন্তু চাবুককে দেখে সে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয় না—যা সম্ভব হঠাৎ তার সামনে একটা লাল বা হলুদ ছাতা খুলে ধরলে। শোনা যায় এরকম হঠাৎ ছাতা খুলে ধরলে সিংহ পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে যায়। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটা মরা ইঁদুরকে কাঠির সঙ্গে সুতোয় ঝুলিয়ে বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই দেখে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাঘ ভয়ে একেবারে কেঁচো! যতক্ষণ না ইঁদুরটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে নাকি ভয়ে কেঁপেছে আর গুটিয়েছে।*

এই অলৌকিকের ভীতিই মানুষের প্রথম পূজা বা দেবভজনার প্রেরণা জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "প্রচণ্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথমপূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণ মানুষ তখনও বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে দেখতে পায়নি এবং তখন সে সর্ব্বদাই ভয় বিপদের দ্বারা বেষ্টিত"[1]। আদিমানবের চতুর্দিকেই বিপদ; বন্যপশু, বিজাতীয় বা ভিন্নগোষ্ঠীর শত্রু, ঝড়, বন্যা, মহামারী,—বিপদ আর দুর্যোগের ত আর শেষ নেই! পশু বা মানুষের আক্রমণ সে বুঝতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ কি? নিশ্চয়ই ঝড়, বৃষ্টি, মহামারী, এরাও মানুষের মত প্রাণী

1. Cf. Edward Westermarck, "The Goodness of Gods," London 1926, P—1.

* কালান্তর

(অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন)! এদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি? উপায়, খাদ্য বা নৈবেদ্য সম্ভারে এদের তুষ্ট করা! অনেকক্ষেত্রে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় এইসব দেবতার (বা অপদেবতার) ভয়ের সঞ্চার করে তাদের তাড়িয়ে দেবার প্রথাও প্রচলিত হয়েছে। আমাদের দেশেও শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, উড়নচণ্ডী ইত্যাদি গ্রাম্যদেবতার পূজা এবং সংশ্লিষ্ট আচরগুলি যে এই ভাবেই সুরু হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন, প্রাগার্য। আর্যদের দেবতারাও অনেকেই একই সূত্রে উদ্ভূত হয়েছেন। রুদ্র অতি প্রাচীন দেবতা, পরে যিনি মঙ্গলময় শিব বা মহাদেবে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদিরূপ কি? ঋগ্‌বেদের প্রার্থনায় তাঁর যে স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা মোটেই মঙ্গলময় বা ভদ্র নয়:

"...হে রুদ্র, সন্তান-জননীকে বধ করিও না, আমাদের প্রিয় শরীরে আঘাত করিও না... রুদ্রের হেতি (অস্ত্র) আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। তাঁহার মহতি দুর্মতি ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। হে রুদ্র, তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর।" (২।৩৩)

আরও দেখি, "রুদ্র দীপ্তিমান অসুর" (৫।৪২।১১); তিনি উগ্র 'ভীমমৃগ', অর্থাৎ ভীষণ আরণ্যকতুল্য ধ্বংসকারী (২।৩৩।৯, ১১)। রুদ্র শব্দটি এসেছে রুদ্ ধাতু (রোদন) থেকে—"রোদয়তি (মনুষ্যান) ইতি।"

যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদেও রুদ্রের ভয়ঙ্কর মহিমা কীর্তিত। এই সময় থেকেই ক্রমশঃ তিনি মহাদেবের রূপ নিচ্ছেন। শুক্ল যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে শতরুদ্রিয় হোমের মন্ত্রে তাঁর বিভিন্ন পরিচয় পাই—তিনি কদর্শী, নীল-গ্রীব, নীল-লোহিত, প্রথম দৈব-ভিষক্, সহস্রাক্ষ, তাম্র-অরুণ-বভ্রুবর্ণ। "তিনি বিশ্বরূপ, সহস্র রুদ্র। তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন; **শান্ত না করিলে তিনি উপদ্রব করেন।** 'মা হিংসি পুরুষং জগৎ—পুরুষ (মনুষ্য), জগৎ (অশ্ব-গবাদি পশু) হিংসা করিও না।" অথর্ববেদের প্রার্থনাও ঋগ্‌বেদেরই অনুরূপ:

"হে রুদ্র, আমাদিগকে হিংসা করিও না। পুরুষ, গো, ছাগ ও মেষ আকাঙ্খা করিও না। হিংসক প্রজাদিগকে বধ কর। জ্বর-কাসি-উপদ্রবকারী রুদ্রকে নমস্কার করিতেছি। তুমি অরণ্যপশু গ্রহণ কর, গ্রাম্যপশু গ্রহণ করিও না। জ্বরাদি রোগ দ্বারা, আয়ুধ দ্বারা, বিষ দ্বারা, বিদ্যুৎ দ্বারা, অগ্নিদ্বারা গ্রহণ করিও না। আমাদের বৃদ্ধ, শিশু, যুবা, পিতা, মাতা ও শরীর হিংসা করিও না। রুদ্রের গণদিগকে নমস্কার করিতেছি। কিরাততুল্য দেবের বৃহৎ মুখ-বিবর বিশিষ্ট কুক্কুরকে নমস্কার করিতেছি।"[৩]

(৩) cf. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" পৃ ৮০

শুধু রুদ্রদেব না, তাঁর চেলাচামুণ্ডা ('গণদিগকে') মায় কুক্কুরটিকে পর্যন্ত তুষ্ট করার চেষ্টা! আমাদের দেব-আরাধনার সূত্রপাতে ভয় যে কতখানি ভূমিকা নিয়েছিল তার সাক্ষ্য বেদে অজস্র। মা-দুর্গা বেদে ঠিক প্রকাশিত হননি। ঋগ্‌বেদে রুদ্রাণীর দেখা পাই না, তবে যজুর্বেদে অম্বিকাকে রুদ্রের ভগিনীরূপে আরাধনা করা হয়েছে। (শতপথব্রাহ্মণে অবশ্য অম্বিকা রুদ্রের পত্নী।) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অম্বিকাকে শরৎ ঋতুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তারই দ্বারা ইন্দ্র হিংসা করেন। সায়নাচার্য টীকা করেছেন—শরৎকালে 'পৌনস-জ্বর উৎপাদন হেতু' রুদ্র হিংসক, অম্বিকা হিংসিকা। শুক্ল যজুর্বেদের মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর লিখেছেন, "অম্বিকা শরৎরূপ ধারণ করিয়া জ্বরাদি উৎপাদন করেন।" আমাদের মা-দুর্গার প্রাথমিক কল্পনাতেও (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) তিনি ভয়ঙ্করী—শক্রদলনী, মহিষমর্দিনী। দুর্গা-পূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো প্রাচীন, আরো ভয়ঙ্করী প্রাগার্য দেবী চণ্ডীর পূজা।

প্রত্যেক দেবতাই যে ত্রাস-জাত তা বলা মুস্কিল। প্রাচীনতম দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র একজন, তিনি উদ্রের চেয়েও প্রাচীন। (পশুপতি রুদ্র খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দের কল্পনা বলে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অনুমান করেন, কিন্তু তার অনুমানে ঋগ্‌বেদ আট-নয় হাজার বছরের। এই ঋগ্‌বেদের প্রাথমিক রচনা সমূহেও ইন্দ্র স্তুত হয়েছেন, একথা ধরে নেবার কারণ আছে। ঋগ্‌বেদের প্রায় দশ হাজার সূক্তের মধ্যে আড়াই হাজার সূক্তই ইন্দ্র-স্তুতি। ভারতীয় এবং ইরাণীয় আর্যগণ যে একই শাখা উদ্ভূত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন ইরাণীয় শাস্ত্র 'অভেস্তায়' ইন্দ্রের যেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, রুদ্রের সে রকম বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।[৪] ইন্দ্রের এক নাম 'বৃত্রঘ্ন', অর্থাৎ বৃত্রের নিধনকারী, অভেস্তায়ও 'ভেরেত্রাঘ্ন' একজন প্রধান দেবতা।) ইন্দ্রের স্বরূপ রুদ্রের মত ভয়ঙ্কর না, যদিও তিনি অতীব পরাক্রমশালী। বস্তুত ইন্দ্র মানবের কল্যানকারী দেবতা, বৃষ্টির দেবতা—বৃষ্টি-রোধকারী বৃত্রাসুরকে পরাভূত করে তিনি বৃষ্টি আনয়ন করেন (ঋগ্‌বেদ, ৫।৩২।১)। সূর্য এবং বরুণের পূজাও কল্যাণকারী দেবতারূপেই। বায়ু মেঘ বহন করে এনে বৃষ্টিপাতের সহায়তা

(৪) অবশ্য অপাং নপাৎ-কে যদি রুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয় তবে অন্যকথা। বেদ এবং অভেস্তা, উভয় সাহিত্যেই অপাং নপাৎ-এর বিশেষ উল্লেখ আছে।

করে, তাই বায়ু দেবতারূপে পূজিত। এইভাবে অগ্নি দেবতারও সৃষ্টি। সকলেই কল্যাণের দেবতা। একথা মনে রাখতে হবে, এঁদের পূজা শুধু কৃতজ্ঞতার পূজা নয়, ভবিষ্যৎ প্রাপ্তি কামনাই পূজার আসল কারণ। আকাশ-গঙ্গাকে (ইংরাজীতে বলা হয় milky way) ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে সরস্বতী বা দিব্য সরস্বতী। "পূর্ব আকাশে সরস্বতী উঠিতে দেখিলাম। দিন কয়েক কিম্বা এক মাস পরে বর্ষাকাল পড়িল। তখন বলিব সরস্বতীই বর্ষাকাল আনিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে বর্ষাঋতুর আগমনকাল জানাইয়াছেন। তিনি জ্ঞানদাত্রী, বৃষ্টিদাত্রী, অন্নদাত্রী। এইরূপ মূলভাব হইতে ঋগ্‌বেদের সরস্বতী কালক্রমে সুনৃতা ও বাগ্‌দেবী হইয়াছিলেন।" এই দেবী সরস্বতীই আবার কালে পুরাণের তিন প্রধান দেবীতে ভিন্ন হয়ে গেছেন। "ইড়া,* ভারতী, সরস্বতী, সুরা গঙ্গার তিন স্থান ধরিয়া দিব্যসরস্বতীরই তিন অংশ বলা যাইতে পারে। ইড়া বর্ষা ঋতুর, ভারতী শরৎ ঋতুর, এবং সরস্বতী শীত ঋতুর যজ্ঞরূপা তিন দেবী। ইড়া হইতে পুরাণে লক্ষ্মী, ভারতী হইতে অম্বিকা এবং সরস্বতী হইতে আমাদের পূজনীয়া সরস্বতী আসিয়াছেন" (বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃ-২১) আর্যদের দেবীরা সকলেই প্রাকৃতিক, এবং বৈষয়িক ফল আকাঙ্ক্ষায় প্রাকৃতিক সাহায্যের আশাতেই এঁদের পূজার উদ্ভব।

বিশ্বের বিভিন্ন বৈচিত্র্যে বিস্ময়ও অনেকক্ষেত্রে অলৌকিক পূজার মূল। আকাশ প্রথম থেকেই মানুষের কাছে পরম বিস্ময়। আকাশ অবশ্য কল্যাণ-কারারূপেও কল্পিত হয়েছে,—আকাশই বৃষ্টিদাতা: সূর্য, বায়ু ইত্যাদি যত শক্তি মানুষের কল্যাণ করে, তারা আকাশচারী। তা সত্ত্বেও একথা স্পষ্ট যে আকাশের বিশালতায় এবং বৈচিত্র্যে মানুষের বিস্ময় থেকেই বেদ এবং অবেস্তার 'দ্যৌ'-এর আরাধনা। [দ্যৌ থেকেই গ্রীক দেবতা Zeus শব্দান্তরিত হয়েছেন। [from Indo Iranian 'deivo' (pl. 'deivos)—dyayus—Zeus] খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পারস্য সম্বন্ধে Herodotus যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও দেখি তৎকালীন এবং প্রাচীন পারস্যে প্রধান উপাস্য দেবতা হলেন 'দ্যৌ'

(*) 'ল' আর 'ড়' মিশ্রিত যে আদি সংস্কৃত অক্ষরটি প্রচলিত ছিল, তা বাংলায় এখন আর প্রচলিত নেই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ভাষায় এই অক্ষরটি এখনও চলছে। মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় বালক অনেকটা 'বাড়ক' উচ্চারণ করে। ইড়া শব্দটিও এইভাবে বাংলা ভাষায় ইলা উচ্চারণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অথবা আকাশ। হেরোডোটাস তাঁকে নিজেদের দেবতা Zeus নামেই বর্ণনা করেছেন [cf. E. Edwards, in Encyclopaedia of Religion and Ethics—God (Iranian.) প্রাচীন মিশরে 'দেবতা' বোঝাত 'নত্র্' (ntr) শব্দে। এই 'নত্র্'-এর শেষোক্ত দুটি পত্রে লোপ পেয়ে (XVIIIth dynasty) 'নুতে' (Noyte) শব্দে রূপান্তর ঘটে। এই 'নত্র্' শব্দের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত 'নেত্র' (চক্ষু) শব্দের সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব না। আকাশ সর্বব্যাপী, তাই সর্বদ্রষ্টা (বেদে যেমন ইন্দ্র সহস্রাক্ষ)। দেবতারাও সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা। এইভাবে বিচার করলে মিশরের দেবতা-অর্থক শব্দের নেত্র উচ্চারণে সঙ্গতি পাওয়া যায়, কারণ আকাশ থেকেই সভ্যতর জগতের অধিকাংশ দেবতার উদ্ভব (যেমন, 'দিব' শব্দ থেকে 'দেব' শব্দের উদ্ভব। দিব্ অর্থ উজ্জ্বল ; আকাশের সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাই যে বিভিন্ন দেবতারূপে নির্দিষ্ট হয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি।) আর্যদের কাছে আকাশই আদি এবং প্রধান আরাধ্য শক্তি। Weidemann অবশ্য মিশরীয় 'নত্র্' শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।[6] যাই হোক, বিস্ময়ই আকাশ পূজার প্রথম প্রেরণা। বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী Edward Westermarck বলেছেন :

'That the objects of religious worship, as well as the forces applied to magic, are fundamentally more or less mysterious, awe-inspiring, supernatural seems to me to be a well established fact inspite of Durkheims assertion that the idea of mysterious has a place in a small number of advanced religious only. This is testified by language" ('The Goodness of Gods,' P—2.

তারপর উদাহরণস্বরূপ তিনি বিভিন্ন আদিবাসীদের ভাষায় দেবতা অর্থক শব্দের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে এইসব শব্দের ব্যবহার বিস্ময় বা রহস্যসূচক। উত্তর আমেরিকায় ডাকোটাদের মধ্যে প্রচলিত wakan শব্দ, হিদাৎসাদের mahopa শব্দ, ফিজিদ্বীপের Kalou শব্দ, নিউজিল্যাণ্ডে মাওরীদের atua—এই সমস্ত শব্দেরই তাৎপর্য হ'ল পবিত্র, ভৌতিক, বিস্ময়কর প্রভৃতি। মাওরীদের atua শব্দে শুধু দেবতাই বোঝায় না, বুদ্ধির অতিত সবকিছুকেই বোঝায়,

6. "The word 'ntr' may be applied in two senses, viz., (1) to 'strike', 'knock down', 'throw' and their derivatives, which while it is written, would nevertheless accord with the figure of axe ; and (2) to 'grow' 'thrive' or, 'be young'—not however in the special sense of 'to come periodically and to be renewed' as Loret supposed." (A. Weidemann, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, 'God' (Egyptian).

যেমন নারীর ঋতুস্রাব, কিম্বা বিদেশীদের দিগ্‌দর্শনযন্ত্র। মাদাগাস্কারে 'ন্দ্রিয়ামানিত্রা' (ndriamanitra) শব্দেও শুধু দেবতাই বোঝায় না, প্রয়োজনীয় অথচ নূতন এবং বুদ্ধির অতীত সব কিছুকেই বোঝায়। বই-ও (তাদের ভাষায় tarotany) দেবতা, কারণ বই-এর অদ্ভুত ক্ষমতা—তাকালেই সে কথা বলে দেয়।

যা কিছু অদ্ভুত, বুদ্ধির অগম্য বা অস্বাভাবিক, সবই আদি মানুষের পূজা পেয়েছে—বিরাট পাহাড়, বিপজ্জনক নদীর বাঁক, অদ্ভুত বা বিরাট গাঁই, অস্বাভাবিক আকারের পশুপাখী, এমনকি বিকলাঙ্গ বা বিবর্ণ (যেমন শ্বেতি-রোগগ্রস্ত) মানুষ আদিম সমাজে যে ভয় এবং পূজার পাত্র ছিল তার প্রমাণ অনায়াস লভ্য। এদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও বামন-পূজা দেখা যাবে। ঔষধিক গুণ-সম্পন্ন গাছ-গাছড়ার পূজা এখনও পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যায়। কোন নতুন জীব-জন্তুর প্রথম দর্শনের সময়ে কোন দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা ঘটলে আগে সেই জন্তুকে দুর্যোগের বাহন বা অপদেবতা গণ্য করা হ'ত। সাইবেরিয়াতে যেবার প্রথম উটের আগমন হয় সেবার নাকি খুব বসন্ত মহামারী দেখা দিয়েছিল; তাই কিছুকাল আগেও ওদেশে উটকে বসন্তের অপদেবতা বলে মনে করা হ'ত। বিভিন্ন দেশে এখনও কালো বেড়াল, পেঁচা, প্রভৃতি পশু-পাখীকে অপদেবতাজ্ঞান করা হয়। আবার উপকারিতার জন্য গরু এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণীকে পূজা করা হয়। টোটেম প্রতীক হিসেবেও বিভিন্ন পশু-পাখী বা বৃক্ষলতাকে পূজা করা হয়।

দেব-কল্পনার মূলে ভয়, বিস্ময়, বা অন্য যে-কোন ভাবই প্রধান হোক, বিভিন্ন দেবতার চরিত্রের মধ্যে, এমনকি একই দেবতার রূপান্তরের মধ্যে এক একটি সমাজের এবং তার বৈষয়িক পরিস্থিতির ছাপ সুস্পষ্ট। আদিম জগতে মানুষ যখন বিশ্ব নিয়মকে বুঝতে শেখেনি, সেই অবস্থায় তাদের চোখে দেবতারা সকলেই ক্রূর এবং ভয়ঙ্কর। এই সব দেবতাদের হাত থেকে নিস্তার পাবার একমাত্র উপায় তাদের ঘুষ দেওয়া (অর্থাৎ পূজা) অথবা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় ভয় দেখিয়ে তাড়ান। বর্বর সমাজের দেবতারা প্রায় কেউই 'ভাল মানুষ' না। 'মাওরীদের দেবতারা সকলেই দুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু, রোগ ইত্যাদি সমস্ত অনর্থের মূলে। ভাল কেউই করে না, তবে মন্ত্র তন্ত্র ঝাড়ফুঁকে (অর্থাৎ

ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায়) তাঁদের অকেজো করে দেওয়া যায়, কিম্বা বলিদান করে বা নৈবেদ্য দিয়ে তাদের ক্রোধ ঠেকান যায়। তাহিতি দ্বীপের দেবতারাও কেউই মঙ্গলময় না। ফিজি দ্বীপের দেবতারা কারোর ইষ্ট করে না, তবে অন্যের অনিষ্ট করার ফলে পরোক্ষে দ্বীপবাসীদের লাভ হয়ে যায়, যেমন বিদেশী-দের জাহাজ ডুবিয়ে দিলে বা ঝড়ের ধাক্কায় চড়ায় এনে ভেঙ্গে ফেললে নানা খাদ্য বা জিনিষপত্র দ্বীপ-বাসীদের জুটে যায়। এদের দেবতাদের যে-সব বিশেষণে ভূষিত করা হয়, তাতেই দেবতাদের স্বরূপ বোঝা যাবে—কেউ 'লম্পট' কেউ 'দাঙ্গাবাজ', কেউ 'খুনে', আরো কত কি! (cf E. Westermarck, Goodness of Gods, p·7) আমাদের দেশের আদিবাসীদের দেবতাদের কথা মনে করুন! প্রায় সকলেই ভয়ঙ্কর এবং অনিষ্টকারী। ভেরিয়ার এলুইন সাওরাদের (বা শবর) দেব-দেবীর একটা তালিকা করেছেন, সংখ্যায় তাঁরা একশ-আশি জন। তাঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন রোগ, মহামারী ক্ষতি বা সর্বনাশের কারন (Religion of an Indian Tribe, Bombay, 1955) কৃষির সূত্রপাত সম্বন্ধে সাওরাদের মধ্যে বিভিন্ন উপকথা প্রচলিত আছে। নিম্নোক্ত একটিতে তাদের দেব-চরিত্র যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

প্রথমে কোন ক্ষেত ছিল না। সব বনজঙ্গলে ঢাকা। ক্রমে এই সব জঙ্গল সাফ করে মানুষ চাষবাস সুরু করল। সাতরকমের বীজ বুনে তারা অঢেল শস্য ফলাল। আগাছা নেই, পোকা-মাকড় নেই, কাজেই কোন ভাবনাও নেই। বীজ বুনলেই নির্বিবাদে ফসলে মাঠ ভরে যায়। এত ফসল দেখে ত দেবতাদের চক্ষু চড়কগাছ। কি সর্বনাশ, মানুষের যদি কোন অভাব না থাকে ত' তারা দেবতাদের পূজা করবে কেন? দেবতারা সকলে শস্যদেবতা কিট্টুং এর কাছে গিয়ে হাজির হল। কিট্টুং রাম্মা আর বিম্মাকে (রাম আর ভীম?) পরামর্শ দিল ঘাস আর আগাছা জন্মাবার জন্য। কিন্তু তা' কোথায় পাওয়া যাবে? কিট্টুং পরামর্শ দিল যাও, সাতমাসের গর্ভপাত ভ্রূন জোগাড় করে মধ্যরাত্রে উলঙ্গ হয়ে ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে পুঁতে দেবে। এই ভাবে আগাছা জন্মালে তা' সাফ করতেই মানুষের অর্ধেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে, পুরো ফসল ফলবে না। এই ভাবে আগাছার সৃষ্টি হল। তার উপর আবার আরেক দেবতা জম্মোলমুম' পোকামাকড়ের সৃষ্টি করে মানুষের শস্য সম্পদ আরও কমিয়ে দিল। ফলে অভাবেরও আর শেষ নেই আর সেই অভাব এবং তজ্জনিত দুঃখকষ্টের লাঘবের কামনায় দেবতার পূজারও কোন ব্যাঘাত ঘটছে না।

কয়েকজন দেবতা অবশ্য পূজা-নৈবেদ্য পেলে মানুষের ভালো করে। কিন্তু নিখুঁৎ সদাশয় দেবতা কেউই নয়। এমনকি সত্তা আর ন্যায়ের দেবতা উম্বুংমুম-ও শিশুদের অরাক্রান্ত করেন, বৃদ্ধদের কুষ্ঠরোগে ভরে দেন। ধর্মের দেবতা ধরমমুম-কে মনে করা হয় সন্ন্যাসরোগের জনক। শস্য-দেবতা কিট্টুং যেমন মানুষের উপকার করেন, তেমনি অপকারও কম করেন না।[7]

7. Cf. Verrier Elwin "Religion of an Indian Tribe," P—93.

কোন্সোমাগ্ম্যাট এস্কিমোদের বিশ্বাস, প্রেতজগত (বা দেবলোক) 'তুঙ্গ আক' (Tung Ak) নামক মহাপ্রেতের অধীন। ইনি সাক্ষাৎ মৃত্যু! এর কাজ হ'ল শুধু যন্ত্রনা দেওয়া। আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতীয়রা অলৌকিক শক্তির মঙ্গলকর অবদান স্বীকার করলেও সমস্ত অমঙ্গলের মূলেই অলৌকিক শক্তিকে দায়ী করে। বেচুয়ানাদের মধ্যে ২৫ বছর বাস করেও মিশনারী শ্রী মোফাট কোনদিন শুনতে পাননি যে তাদের প্রধান দেবতা মেরিনো কারোর ভাল করেছে। নানা তথ্য খতিয়ে দেখে Westermarck তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বর্বর সমাজের দেবতারা মানুষের স্বার্থ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন; মানুষের নৈতিক আচার-আচরন বিষয়েও তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁরা ব্যস্ত শুধু তাঁদের স্বার্থ নিয়েই :

"It seems that most gods of the uncivilized peoples are thoroughly selfish beings who care about nothing else than what concerns their own personal interests—that they are utterly indifferent to men's behavior towards their fellowmen, neither disapproving their vice or punishing their wicked, nor approving their virtue or rewarding the good..... We are directly told by competent observes that the supernatural beings of savage belief frequently show the utmost disregard to all questions of worldly morality."[৪]

বর্বরদের অপরিণত সমাজে দেবতার চিত্র অন্যথা হতে পারে না। প্রাক্-কৃষি মানবসমাজে জীবিকার সংস্থানে মানুষ কৃষি-প্রধান সমাজের মত এত প্রকৃতি-নির্ভর ছিল না। শিকার-জীবী মানুষ শীকারের অভাব ঘটলে বনান্তরে বা স্থানান্তরে যেত। পশু-পালক সমাজেও তাই। সেজন্য প্রকৃতির দাক্ষিণ্য তার চোখে পড়ে নি, প্রকৃতির শত্রুতাই তার চোখে পড়েছে বেশী। কাজেই দেবতা-দের চেহারা তদ্রূপ।

কৃষি-প্রধান সমাজে পরিস্থিতি অন্যরূপ। কৃষক কখনো যাযাবর থাকতে পারে না। তাকে একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয় এবং সেইস্থানের ভৌগলিক তথা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর তাকে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। এই নির্ভরশীলতার ফলেই ক্রমশঃ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যও চোখে পড়তে আরম্ভ করে। দেবতা হয়ে ওঠে মঙ্গলময়। বেদের দেবতারা এই সামাজিক রূপান্তরের সাক্ষ্য; আর্যরা ভারতবর্ষে আসার প্রাক্কালে প্রধানত পশুপালকগোষ্ঠী ছিল বলে

৪. Cf. E. Westermarck, "Goodness of Gods," P—10.

মনে হয়। ঋগ্‌বেদে শুধু গরু না, মেষাদি অন্যান্য পালিত পশু সম্পর্কেও উৎকণ্ঠা নানাস্থানে লক্ষনীয়। ঋগ্‌বেদে অশ্বের উল্লেখ প্রচুর। প্রাচীন 'আর্যাবর্ত্ত' (অর্থাৎ পঞ্জাব এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ) অশ্বের দেশ নয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অনুমানে আর্যগন তাদের আদি বাসস্থল কাস্পিয়ান হ্রদ অঞ্চল থেকে প্রচুর অশ্ব এদেশে আনেন : "এশিয়ার মধ্যভাগে কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্বদিকে অশ্বের আদি নিবাস : পুরাণে সে দেশের নাম কুশ দ্বীপ। লোকে এই দেশেই বন্য অশ্ব মৃগয়া করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিত। আর্যগনও করিতেন, নচেৎ অশ্বমেধ আসিত না" ('বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' পৃ ১২৪) আর্যরা যে শুধু অশ্ব মৃগয়াই করত না, জীবিকার অঙ্গ হিসেবেই অশ্ব পালনও করতে শুরু করেছিল একথা ধ'রে নেওয়া চলে। এই পশু-পালন জীবিকায় মানুষকে যতটা মুক্ত আকাশের সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে এত আর কোন জীবিকায় নয়। তাই কি ঋক্ রচনার প্রাক্কালে 'দ্যৌ'-এর এত প্রাধান্য ? 'দ্যৌ' যে ভারতে আসার পূর্বে প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন তার বিভিন্ন প্রমান আছে,[৪] অথচ ভারতে এসে কৃষি-প্রধান সভ্যতায় সুস্থির হবার পর বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রই প্রাধান্যলাভ করল। পারস্যে সমাজপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সূর্য বা মিত্র (বর্ত্তমান উচ্চারণ মিথ্র) প্রধান দেবতা হয়ে উঠলেন। এদেশেও প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে বোধ যত স্পষ্ট হতে থাকল ততই ক্রমশঃ সূর্যের প্রাধান্য স্বীকৃত হতে লাগল। ক্রমশঃ সূর্য-পরিক্রমা এবং তার সঙ্গে ঋতুর সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হল। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর কল্পনা এবং প্রাধান্য স্বীকৃত হতে লাগল। "যেমন অন্যান্য সূর্যের শক্তি, বিষ্ণুও তেমন সূর্যের এক শক্তি। বিষ্ণু সূর্যের বার্ষিক গতিশক্তি।" অবশ্য অন্যান্য সমস্ত কৃষি সভ্যতার মত বৈদিক সমাজে সূর্যই সর্বপ্রধান দেবতা রইলেন (ঋগবেদ ১।১৬৪)।

বোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে ত্রাস-জাত দেবতারা লুপ্ত হয়ে গেলেন তা মনে করার কোন কারণ নেই। তাঁরা পাশাপাশি পূজিত হতেন। বিশেষত অলৌকিকের ভীতি আজ পর্যন্ত বর্ত্তমান। তাই আমরা পাশাপাশি ইন্দ্র,

৪. "The premier position amongst early Persian derivities assigned by Herodotus to the sky is in perfect consonance with the suprimacy which the Sky-God enjoyed amongst the Indians under the name Dyāus or later under that of Varuna" (E. Edwards, in Encyclodaedia of Religious and Ethics, 'God' (Iranian).

অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি কল্যাণের দেবতাদের সঙ্গে রুদ্র, অম্বিকা প্রভৃতি ত্রাস-জাত দেব-দেবীর পূজা দেখতে পাই। তবে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের আবার রূপান্তর ঘটেছে। সব দেবতারই সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী রূপান্তর ঘটেছে। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র ক্রমশঃ দেবরাজ এবং জয়ের দেবতা হয়ে উঠলেন, কেননা ভারতে এসে আর্যগনকে সর্বদা অনার্যদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই অবস্থায় কোন পরাক্রান্ত দেবতার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। সেকালের দেবকুলে ইন্দ্রকেই সবচেয়ে পরাক্রান্ত বলে মনে করা হ'ল। প্রথমত যিনি বজ্র (অর্থাৎ বাজ) পরিচালনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই অতীব শক্তিশালী। তা' ছাড়া অনাবৃষ্টির মত এত ক্ষতিকর শত্রু যিনি নাশ করতে পারেন তাঁর ক্ষমতায় কোন সন্দেহ থাকেনা। "ঋগ্‌বেদের বহুস্থানে পণিদের নাম আছে। এক ঋষি বলিতেছেন, 'অগ্নিযজ্ঞ-রহিত, মিথ্যাভাষী, হিংসিতরাক শ্রদ্ধারহিত, বুদ্ধিশূন্য পণি নামক দস্যুদিগকে বিতাড়িত করুন।' (৭।৬।৩) পণিরা আর্যদের গোধন চুরি করে কোন দূরবর্তী নদীর পারে পর্বত-গুহায় লুকিয়ে রাখত। ইন্দ্র সেই পণিগনকে পরাস্ত করেছিলেন। ঋগ্‌বেদের একস্থানে বৃত্রকে 'দাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র সেই 'দাস'কে বিনাশ করেছিলেন। বৈদিক এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে ইন্দ্রের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ আর্য আর অনার্যদের সংগ্রামেরই প্রতিচ্ছবি। একগোষ্ঠির সঙ্গে অন্য গোষ্ঠির শত্রুতায় ভিন্নগোষ্ঠির মানুষ দেবতারও শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বেদ-পুরাণের কাহিনীগুলি তারই প্রমাণ। কতকগুলি কারণে মনে হয় মূলতঃ একজাতীয় হয়েও আর্যদের যে গোষ্ঠি ভারতবর্ষে এসেছিল, তাদের সঙ্গে ইরানীয় আর্যগোষ্ঠির সংঘাত লেগেছিল। তাই পারস্যে 'অহুর' উপাস্য আর 'দেব' শব্দ দানব অর্থে ব্যবহৃত।[১০] 'অসুর'—র পরে 'আহুর' এইভাবে উচ্চারিত হয়েছে। জোরোস্ট্রীয়দের সবচেয়ে বড় দেবতা 'আহুর-মাজদা'। ভারতে ঠিক বিপরীত।

সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের স্বরূপ আরও মার্জিত হয়ে আসে। Alfred Berthblet-এর ভাষায় :

"The progress of culture in general is accompanied by a gradual refinement and spiritualisation of religious and ethical concepts as well as of harmony. The demonistic spirits whose actions are as a

(১০) অভেস্তার উক্তি আছে 'শত্রু (দেব) দেখার সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা (অর্থাৎ মানবেরা)

rule unpredictable are either gradually replaced by friendly deities or the evil spirits are reduced to a position of malicious, but in the last analysis impotent antagonists" (Ency. of Social Sciences—Religion).

আমাদের দেশে অনার্য অপদেবী চণ্ডী ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে যেভাবে ক্রমশঃ সর্বমঙ্গলা শিবানী, জগদ্ধাত্রী ভবানী এবং হিমালয় দুহিতা উমায় রূপান্তরিতা হয়েছেন তা Bertholet এর উক্তিই প্রমাণ করে।[১১] ব্রহ্ম-কল্পনার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা প্রধান তা' সভ্যতার অনেক পরবর্তী স্তরেই সম্ভব, তাই ৩।৪ হাজার বছর ধরে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এদেশের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্‌বেদে ব্রহ্মার কোন উল্লেখ নেই।

একটা সংস্কৃতি যখন অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন উভয় সংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্যের বিনিময় ঘটে। আমাদের দেশের বিভিন্ন দেবদেবীর রূপান্তরের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক বিনিময় বা মিশ্রন (acculturisation) স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। চণ্ডীদেবীর উল্লেখ আগেই করেছি। চণ্ডীদেবী নিঃসন্দেহে অনার্যদেবী। সেই চণ্ডীদেবীই (অথবা 'চাণ্ডী') পরে দুর্গাদেবীতে রূপান্তরিত হয়ে আর্যসমাজে গৃহিতা হয়েছেন। এই রূপান্তর সহজে ঘটেনি। অনেক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পর তিনি উচ্চতর সমাজে গৃহিতা হয়েছেন। তার ইঙ্গিত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে স্পষ্ট[১২]। রুদ্র কি সত্যিই আর্যদের দেবতা ছিলেন? না ভারতে আসার পর অনার্যসমাজ থেকে গৃহিত হয়েছেন? ঋগ্‌বেদের এক-স্থানে রুদ্রকে 'অসুর' বলা হয়েছে (৫।৮২।১১)। ভারতে আসার আগে আর্যরা রুদ্রোপাসনা করতেন না বলেই মনে হয়। 'অভেস্তা'য় রুদ্রের কোন উল্লেখ নেই। বিদ্যানিধি মহাশয়ও রুদ্রের কল্পনা খ্রী পূ ৪৫০০ বছর আগের বলে মনে করেন, অথচ ঋগ্‌বেদকে তিনি আট-নয় হাজার বছরের প্রাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। অথর্ব বেদেও রুদ্রকে 'কিরাত-বেশী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ একদিকে যেমন নতুন নতুন আবিষ্কারে তার প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করেছে, সেই আবিষ্কার আবার নতুন প্রয়োজনের ও নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে মানুষের কর্মের পরিধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের প্রভাবের সীমা বিস্তৃত হয়েছে বা

(১১) শারদীয় 'চতুষ্কোন' (১৩৬১) পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের 'শক্তিপূজার রূপান্তর' দ্রষ্টব্য।

(১২) দ্রঃ বিনয় ঘোষ, "বাঙালীর দুর্গোৎসব",—'শারদীয় যুগপত্র', ১৩৬৯।

নতুন দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সূর্য এবং বিষ্ণুর প্রভাবের বিস্তৃতি লক্ষনীয়। আগুনের ব্যবহার আবিষ্কারের পর থেকেই অগ্নিদেবতার উদ্ভব; তেমনি সভ্যতার পরবর্তী ধাপে ধাপে বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টি হয়েছে।[১৩]

মানুষের সমাজপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে দেবলোকের সমাজ। মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধ দেবলোকেও প্রতিফলিত। মা-দুর্গার সন্তান সন্ততিসহ যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তা বাংলার ঘরোয়া সামাজিক চিত্র। দেবতাদের পত্নীপুত্র ইত্যাদি মানুষের সমাজেরই প্রতিফলন। আবার দেখি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দেবতাদের প্রাধান্য, কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজে দেবীদের। ঋগবেদের প্রাথমিক যুগে বাক্ দেবীর সামান্য প্রতিপত্তি ছাড়া দেবীদের স্থান নিতান্ত নগন্য। তার কারণ আর্যরা ক্রমশঃ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্থিতিলাভ করছিল। পরবর্তী যুগের দুর্গা, চণ্ডী, মনসা, ইত্যাদি দেবীরা প্রধাণত অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল। দ্রাবিড় সমাজ প্রধানত মাতৃতান্ত্রিক ছিল। তাই এই সব সমাজে দেবতার চেয়ে দেবীদের প্রাধান্য বেশী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি আর্য সমাজের প্রতিনিধি। তিনি তার স্ত্রী খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা করতে দেখে অতীব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তখন আর্যকুলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজধারা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে সমাজে নারীর কোন সামাজিক স্বীকৃতিই নেই; এমন কি স্ত্রী-দেবতার পূজা করতেও তাঁরা নারাজ :

"এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লক্ষিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে॥
ভূমীতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়॥
কেমন দেবতা এই পূজস ঘটঝারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি॥

উপরোক্ত চিত্র অবশ্য আর্য-অনার্য সাংস্কৃতিক সংঘাতেরও প্রতিচ্ছবি বলে গন্য হতে পারে।

---

13 "Every step in cultural progress extends the sphere of existing gods or creates new ones. For it widens the range of human needs and human needs in turn call into being gods who can satisfy them" —(Alfred Bertholet in Encyclopaedia of Social Sciences—Religion).

এবার দেবতা-কল্পনার বিভিন্ন পর্যায়গুলি খতিয়ে দেখলে দেবরহস্য আমাদের কাছে পরিষ্কার প্রতীয়মান হবে (অন্তত সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে।) প্রথম পর্যায়ে বিশ্ব-নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা-প্রসূত ভয় থেকে সূত্রপাত হয় কাল্পনিক অলৌকিক শক্তির সম্বন্ধে ধারণা। এই অলৌকিক শক্তিগুলি ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, কেননা তারা ঝড়-বৃষ্টি মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক (আদিমানুষের চোখে অলৌকিক) ঘটনা সংঘটিত করে। যার ইচ্ছাশক্তি আছে, তার নিশ্চয়ই কামনা-বাসনা-অনুরাগ-লোভ ভয়-ঈর্ষা-দ্বেষ সম্বলিত মনও আছে, এবং মন আছে অথচ দেহ নেই,এ-কল্পনা আমাদের আদিপুরুষদের সাধ্যাতীত ছিল, কাজেই ধীরে ধীরে দেবতার মূর্তি কল্পিত হ'ল। এই মূর্তিকল্পনার পেছনে অবশ্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াপদ্ধতির অবদান আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তার আলোচনা সম্ভব নয়।

মূর্তিকল্পনাই দেবতার বিকাশের শেষ পর্যায় নয়। শুধু মানুষের মত হলে দেবতাদের চলবে কেন? মানুষের চেয়ে উন্নত হওয়া চাই! একদিকে যেমন আমাদের দেশে মূর্তিরও নানা বিকাশ ঘটেছে, অন্যান্য দেশে আবার অধিকাংশক্ষেত্রে মূর্তিকল্পনাই পরিত্যক্ত হয়েছে। দেবতার ক্রমবর্দ্ধমান আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে সমস্ত বাস্তবতাই বর্জন করতে হয়, তাই দেবতার দেহ-কল্পনাও বর্জন করা হল।[১৪] শুধু ইসলাম এবং খ্রীষ্ট ধর্মে নয় আমাদের দর্শনেও চিন্ময়, অব্যয় ঈশ্বরের কল্পনা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

জগদীশ্বর, পরমেশ্বর বা ভগবানের কল্পনা সভ্যতার অনেক পরবর্তীস্তরের, যদিও এবিষয়ে সমস্ত সমাজ-বিজ্ঞানীরা একমত নন। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের 'আদিপুরুষ' (Dawn-Being) বা অন্যান্য বিভিন্ন স্থানের 'মহাপ্রেতের' (Great spirit) কল্পনা থেকেই ঈশ্বর কল্পনার এবং একেশ্বরবাদের সূত্রপাত হয়েছে বলে Andrew Lang প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন। অনেকে আবার এই আদিপুরুষ বা 'পরম পিতার' ধারণা খ্রীষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শের ফলে আদিবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন, যেমন আমাদের দেশে সাওতালদের মধ্যে 'মাঞ্চন' (মহাপ্রভুর অপভ্রংশ) বা পরমেশ্বর হিন্দু-ধর্মের প্রভাবের ফল সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেবলোকের অধিপতি-কল্পনায় সহায়তা করেছে। ফলে ক্রমশঃ সব দেবতার উর্দ্ধে ঈশ্বর কল্পনা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

14. Cf. (1) Andrew Lang, in Ency. of Religion & Ethics,—God (Primitive and savage).

(2) A. R. Radcliff Brown, 'Religion an Society,' (Henry Mayers Lectures, 1945).

আলোচনা

কবিতা প্রসঙ্গে

শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীনত্বের দাবী বোধ হয় কবিতার পক্ষেই করা সম্ভব। বস্তুত সভ্যতার প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ-কথাই প্রমাণিত হবে যে সে-সময়কার আদিম গুহাবাসী মানুষের ব্যবহারিক সত্যের অথবা বাস্তব সত্যের ধারণার সঙ্গে কল্পনার সত্যের ভেদরেখা ততদূর প্রবল ছিল না, কল্পনায় যে প্রেরণা তাদের মধ্যে সঞ্জাত হত বাস্তবে তারই সুষ্ঠু প্রয়োগে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন এবং বাস্তবোত্তর জীবনের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্কের সেতু রচিত হয়েছিল। কল্পনার জীবন এবং বাস্তবের জীবন এক অখণ্ড জীবনধারার রূপ গ্রহণ করেছিল। একটা উদাহরণ দিলে ধারণাটা কিছু পরিষ্কার করা যেতে পারে। ধান কাটা অথবা চারা রোপণের পূর্ব্বাহ্নে এইসব আদিম মানুষেরা নৃত্যগীত সহযোগে কাল্পনিক ধানকাটা অথবা চারা রোপণের অনুষ্ঠান করত। এবং এই কাল্পনিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকে যে প্রেরণা তারা আহরণ করত বাস্তবের ধানকাটা অথবা চারা রোপণের সময় সে প্রেরণা তাদের সাহায্য করত। বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়াও এই যে অপর এক অস্তিত্বের ধারণা—কাল্পনিক হলেও যে অস্তিত্ব অসত্য নয়, যে অস্তিত্ব তাকে আনন্দ এবং প্রেরণা দেয়—এই বোধই মানুষের শিল্পচেতনার (কাব্যসৃষ্টির) প্রারম্ভ।

শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে এই অন্ত-অস্তিত্বের বোধই নিরন্তর কাজ করে যেতে থাকে এবং প্রথমাবস্থায় বাস্তবসত্তা এবং শিল্পসত্তার মধ্যে যে সম্পর্ক নিবিড়, ঘনিষ্ঠ এবং পরস্পর পরিপূরক ছিল উৎপাদনের জটিল পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলেই হোক অথবা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্নতির ফলস্বরূপই হোক না কেন এই বাস্তবোত্তর অস্তিত্ব ক্রমশই একটি সমান্তরাল নিরপেক্ষ শিল্পসত্তার জন্ম সম্ভব

করল। অবশ্য সামাজিক অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কারণে নিত্য-নতুন ধারণার ঘাত প্রতিঘাত ও প্রভাব যে এই দ্বিতীয় জগতকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেনি এমন নয়।

শিল্পসৃষ্টির প্রাথমিক স্তরের প্রচেষ্টা মূলতঃ গোষ্ঠীগত হলেও ব্যক্তি-চেতনার ক্রমোন্মেষ কাব্যশরীরকে নতুনভাবে শ্রীমণ্ডিত করতে থাকে। এখানে লক্ষণীয়, ব্যক্তির (স্রষ্টার) যে কোনো ভাবনা, চিন্তা, অনুভাব আবেগ ছন্দোবদ্ধ যে রূপ নিত তাই কবিতা বলে উল্লিখিত হত। সেই অর্থে মধ্যযুগ পর্যন্ত যে কোনো শিল্পকর্মঃ (সঙ্গীত এবং চিত্র বাদে) কবিতার আঙ্গিকে জন্ম নিত এবং কবিতা বলে চিহ্নিত হত। চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের ধারাকে অনুসরণ করলে এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হবার নয় যে পাঁচালী, কাহিনী-কাব্য, যাত্রা, রামায়ণ গান, কীর্তন ইত্যাদি শিল্পকর্ম যদিচ কবিতার ভাষায় লেখা হত তাহলেও তার মধ্যে নাটকীয় উপাদান, সামাজিক সমস্যা, কাহিনী, দর্শন, উপন্যাসের উপকরণ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই নিহিত থাকত। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই প্রসঙ্গে একথা বলা হয়ত অবান্তর হবেনা যে এক জার্মাণ শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যানুরাগীর সঙ্গে তাদের দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাকালীন কোনো এক সময় তিনি আমায় বলেন যে এখনও জার্মাণীতে কবিতা (Poetry) বলতে উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি শিল্পের অন্যান্য শাখাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সুতরাং এমত অভিযোগ যদি ওঠে যে আধুনিক বাঙ্গলা কবিতা কেন সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে পঠিত হবেনা এবং দু'শো বছর পূর্ব্বের দল বেঁধে কবিতা পাঠের রেওয়াজ বর্ত্তমানে কেন অনুসৃত হবেনা তাহলে উপরালোচিত প্রেক্ষিতের আলোয় সমস্যাটির রূপ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া ছাড়া আর গত্যান্তর থাকে না। এইভাবে অগ্রসর হলে আমার মনে হয় বিষয়টি বুঝতে সাহায্য হতে পারে। প্রথমত বর্তমানের কবিতা এবং মধ্যযুগের কবিতা অথবা আদিম মানুষের প্রাথমিক স্তরের কবিতা যা মূলত গোষ্ঠীভাবনা অথবা দলগত আবেগ (Collective emotion) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তা কি গুণগতভাবে একই? নিশ্চয়ই নয়। কারণ গণতন্ত্রীতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে। সাহিত্যের মূল উৎস উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা শাখায় অড়িয়ে পড়ে। কবিতার সংজ্ঞা ক্রমেই আর পূর্বের অর্থে ব্যাপক থাকেনা। কোনো বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ,

কোনো দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন, কোনো কাহিনীর বিবরণ আর কবিতার উপজীব্য থাকে না, অন্তপক্ষে অন্তনিরপেক্ষ ভাবে কবিতা বিষয়াভিমুখী (objective) থেকে বিষয়ী অভিমুখী (subjective) হয়ে উঠতে থাকে—বৈষ্ণব গীতি কবিতায় যার প্রথম সূত্রপাত। বর্তমানের কবিতা বলতে আমরা বুঝি সেই আবেগী অনুভবের রসায়ন।

অতএব মধ্যযুগে কবিতা বলে যা সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হত এবং প্রায়শঃই নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি যোগে যা দর্শকবৃন্দের কাছে মনোহারী ও আনন্দবর্দ্ধকরূপে পরিবেশিত হত বর্তমানের কবিতার পক্ষে সে ধরণের আনন্দ দান করা সম্ভব নয়। কারণ আধুনিক কবিতার রসগ্রাহী পূর্বের পাঠকের ন্যায় নিছক শ্রোতা নন। কেননা আধুনিক কবিতা যে কৈবল্যের সন্ধান দেয় তা একমাত্র তন্ময়চিত্ত পাঠকের পক্ষেই লাভ করা সম্ভব। তা ছাড়া বিশ-শতকের সমান-বয়সী মানুষ আর আগেকার সেই সহজ, সরল, জটিলতা বিবর্জিত মানুষ নেই। আজকের কবিচেতনা যে রূপকল্পের সাহায্যে কোনো অনুভবের ভাবরূপে উত্তীর্ণ হবে তা একদিকে যেমন জটিল অন্যদিকে তেমনই ব্যক্তিগত। সুতরাং কবিতার রসাস্বাদনে আপাত সহজবোধ্যতার আশা করাও অসমিচীন।

অথচ রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা কবিতা সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতারই অভিযোগে পাঠকশ্রেণীর এক বৃহত্তর অংশ আধুনিক বাংলা কবিতাকে অপাংক্তেয় করে রেখেছেন। শুধুমাত্র নির্মম উদাসীনতাই যদি বাঙলা কবিতার একমাত্র প্রাপ্য হত তাহলে হয়ত দুঃখিত না হলেও চলত। কিন্তু উদাসীনতা ছাড়াও বিদ্রূপ, উপহাস, সহানুভূতি, উপদেশ অনেক কিছুই আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই যথার্থ কাব্যপ্রেমী এবং কবিদের এমতাবস্থায় বিচলিত বোধ করবার যথেষ্ট কারণ ঘটে। একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় এ-অবস্থা কেবলমাত্র বাঙলাদেশেই নয় পরন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সাহিত্যেও কবিতাকেও এই একই পর্যায়ের ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হচ্ছে। এই যে উপেক্ষা, উদাসীনতা, এবং সাধারণ শিক্ষিত জনসাধারণের কবিতা সম্বন্ধে উপরোক্ত মনোভাব একথারই প্রমাণ দেয় যে কবিতা এক উচ্চতম পর্যায়ের শিল্পরূপ যেখানে এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা প্রয়োজন। অন্যান্য ক্ষেত্রে কম শক্তিমান লেখকের পক্ষেও যে আপাত খ্যাতি ও সামাজিক সম্মাননা ও বিত্তের অধিকারী হওয়া সম্ভব সমপরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক

শক্তিবিশিষ্ট কবির পক্ষে সে ধরণের খ্যাতি অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা বর্তমানেই যে সম্ভব তা নয়, ভবিষ্যতকালেও যে কোনোদিন কবিতার স্রষ্টাকে এহেন দেবদুর্লভ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বিশুদ্ধ কবিতার (পদ্য অথবা ছড়া নয়) সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছবার অক্ষমতার কারণ কবিতা তার ধর্মের মধ্যেই নিহিত যার আভাষ দেওয়ার একটা ক্ষীণ চেষ্টা এই স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে করেছি কিন্তু এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা আরও ব্যাপকতার দাবী রাখে এবং স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হতে পারে।

সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রভারতী ভবনে কবিতামেলার যে তিনদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠান হল তা কিছু উৎসাহী তরুণ কবিতানুরাগীর এবং কবির সাহিত্য-পাঠকদের বাঙ্গলা কবিতা সম্পর্কে যে সশ্রদ্ধ ভীতি, উপেক্ষা এবং উদাসীনতা-জনিত বিচ্ছিন্নতা দূর করবার এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হিসাবে তা বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান পাবে। অবশ্য আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে এ-ধরণের আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন, একক অথবা প্রথম প্রচেষ্টা নয়। কয়েক বছর পূর্বে কতিপয় যুবক রাস্তায় রাস্তায় 'আরও কবিতা পড়ুন' বলে যে ধ্বনি তুলেছিলেন এবং পথচারীদের বিস্মিত করেই আধুনিক বাঙ্গলা কবিতা সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন অনেকেরই বোধ হয় স্মরণে আছে তাঁদের সে প্রচেষ্টা শুধুমাত্র বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যরসিক অথবা বুদ্ধিজীবিদের কাছেই নয় পরন্তু সমগ্র পৃথিবীরই সশ্রদ্ধ প্রশংসার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হয়ত তাঁরা যা করেছিলেন তার মূলে কোনো সুপরিকল্পনা বা মহত্তর কোনো আদর্শবোধের প্রেরণা ছিলনা—যা ছিল তা হয়ত নিছক সাময়িক খেয়াল খুশীর খেলা মাত্র। কিন্তু তাঁদের সেই খেয়াল থেকে যার সূত্রপাত তা ক্রমেই যে এক তাৎপর্যময় রূপ গ্রহণ করবে তা বোধহয় সেই সব সহৃদয় যুবকদের ধারণার অতীত ছিল। তার কিছুকাল পরেই আমরা দেখেছি সিনেট হলে দুইদিনব্যাপী সম্মেলন, আশাতীত সাফল্য এবং লোকসমাগমের মধ্যে যার সমাপ্তি ঘটেছে। ইদানীংকালেও যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিসম্মেলন অন্যতম এক কর্মসূচীরূপে প্রায়ই স্থান পাচ্ছে। কবিতামেলা এই সব টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার এক সংহত ও অখণ্ড রূপ।

সভা সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাঙ্গলা দেশে বিশেষ করে কলকাতায়

কোনো নতুন ঘটনা নয়। তবুও কবিতামেলাকে উপলক্ষ করে মেলার উদ্যোক্তারা তিনদিনব্যাপী যে ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তা একদিকে যেমনই অভিনব অন্যদিকে তেমনই বৈচিত্র্যময়ও বটে। আজকের অবক্ষয় এবং মূল্যহীনতার যুগে এ-ধরণের মেলার আয়োজন করে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা শুধু তাঁদের কাব্যপ্রীতিরই পরিচয় দেননি পরন্তু এক ঐতিহাসিক কর্তব্যও পালনও করেছেন। যথার্থ কাব্যপ্রেমিক, কবি এবং সংস্কৃতিবান ব্যক্তিমাত্রই এ-ধরণের অনুষ্ঠানের তাৎপর্য অনুভব করে নিশ্চয়ই উল্লসিত বোধ করবেন, বস্তুত শুধু বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রভূত আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, একটি সংস্কৃত এবং দুটি বাংলা কাব্য নাটিকা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এতদ্ভীত ইংরাজী, জার্মান এবং ফরাসী ভাষাভাষীদের দ্বারা স্ব স্ব দেশীয় কবিতা পাঠে প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতার ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে ইদানীং কাল পর্যন্ত বিশিষ্ট মৃত কবিদের কবিতা পাঠ, পূর্ব্ব-বঙ্গের কবিদের কবিতাপাঠ ইত্যাদিও অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভাও অনুষ্ঠিত হয় এবং তরুণ কবি সাহিত্যিকরা এই আলোচনা সভায় যোগদান করে এতদ্বিষয়ক আলোচনাকে সমৃদ্ধ এবং জীবন্ত করে তোলেন। কবিতামেলার কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হবে সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং বুদ্ধদেব বসুর মত দু'জন বিশিষ্ট কবিকে সম্বর্দ্ধনাজ্ঞাপন। আধুনিক বাংলা কবিতা তাঁদের দানে সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁদের কবিকৃতিকে আড়াল রেখেও আধুনিক বাঙ্গলা কবিতার সংরক্ষণ, পুষ্টি এবং প্রসারে তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা সাহিত্য-প্রেমিকমাত্রেরই সশ্রদ্ধ প্রশংসায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং উপযুক্ত পাত্রেই এই সম্মানদানে কবিতা-মেলার উদ্যোক্তারা দলমত নির্বিশেষে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। মোট কথা কবিতামেলার অনুষ্ঠানের ভিতরেই প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একটি সুষ্ঠু পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে আধুনিক কবিতার মূল রূপটির সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দের যোগাযোগ ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। সর্ব্বোপরি সম্মেলনস্থানে একটি হার্দ্দ পরিবেশে কবি এবং কবিতা-পাঠকেরা মিলিত হয়ে পরস্পরের ভাবনা, চিন্তা এবং মত বিনিময়ের সুযোগ পান। কবিতার মত বিশুদ্ধ

রসের সামগ্রীকে নিয়ে ইত্যাকার অনুষ্ঠান যে সম্ভব এ-কথার প্রমাণ দিয়ে মেলার উদ্যোক্তারা দর্শক সাধারণকে বিস্মিতই করেছেন বলা চলে। অবশ্য এর ত্রুটির দিকও আছে। কবিতামেলার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ অন্যান্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ধাঁচে সমস্ত কার্যসূচী পরিবেশিত হওয়ার ফলে মেলা নামটি তার তাৎপর্য হারিয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা। এই ধরণের অনুষ্ঠানের দ্বারা পাঠকবর্গকে হয়ত কবিতা-সচেতন করা যায় কিন্তু কবিতাপাঠের আনন্দ—তা একান্তই নিভৃত ও ব্যক্তিগত। সম্মিলিতভাবে রাজনীতি অথবা সমাজ সংস্কার নিশ্চয়ই করা সম্ভব কিন্তু সম্মেলনের সভামণ্ডপে কয়েকদিনের উপস্থিতি নিশ্চয়ই শ্রোতাদের অনুভবের সেই উচ্চ শিখরে আরোহণ করাতে সমর্থ হয়না এবং সেই দিক দিয়ে বিচার করলে এই ধরণের অনুষ্ঠানের আপাত নিরর্থকতা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বে যে আলোচনার ক্ষীণ চেষ্টা করেছি তার জোর টেনেই বলি কবিতা সৃষ্টির মত কবিতার রসাস্বাদন একান্তই বিষয়ীগত—অন্তত আধুনিককালে যখন কবিতা আবেগী অনুভবেরই নিঃসারমাত্র। তবুও এই ধরণের একটি প্রীতিময় পরিবেশ এবং কবিতার আবহাওয়া তৈরী করার কাজে মেলার উদ্যোক্তারা যে সফলকাম হয়েছেন তার জন্য শ্রোতৃবৃন্দের এবং দর্শক সাধারণের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। 'আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরে যেমন অনেক যন্ত্র, অনেক গ্রন্থি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, আমরা তা কখনো জানতে পারিনা কিন্তু কোথাও কোনো প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হলেই পীড়িত হয়ে পড়ি—সভ্যতার উপর কবিতারও প্রভাবও সেইরকম'। সুতরাং কবিতা সম্পর্কে যাঁরা ভাবেন এবং এই ধরণের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবি এবং কবিতা-পাঠককে কাছাকাছি নিয়ে আসেন তাঁরা রসিকমাত্রেরই শ্রদ্ধার্হ।

নবেন্দু চক্রবর্তী

●

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ৭নং কায়েত লেন,
কলিকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CENTRAL LIBRARY

উত্তরসূরী

সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩

ভাষা কবিতা ও মনুষ্যত্ব

বুদ্ধদেব বসু

একমাত্র মানুষের ভাষা আছে, এবং মানুষমাত্রেরই ভাষা আছে। সমস্ত জীবজগতে অন্য কারো ভাষা নেই।

জীবের কাছে প্রকৃতির চাহিদা এই যে সে বংশানুক্রমে পৃথিবীতে টিঁকে থাকবে। এই চাহিদা মেটাবার জন্য ভাষার কোনো প্রয়োজন হয় না। আত্মরক্ষা, প্রজনন ও সন্তানপালন—এই তিন কর্মই বিনা ভাষায় সম্পন্ন ও সুসম্পন্ন হ'তে পারে।

এমনকি মানুষের পক্ষেও ইঙ্গিতের দ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যক্ত করা সম্ভব, এবং যৌন কামনা জানাতে ও জাগাতে হ'লে বরং ভাষার চেয়ে কটাক্ষই বেশি কাজে লাগে। শিকার বা যুদ্ধ যখন মানুষের জীবিকার উপায় ছিলো তখন চীৎকার তার বলবৃদ্ধি করেছে, এবং সন্তানের জন্মের ভূমিকাস্বরূপ আজ পর্যন্ত নরনারীর কণ্ঠ যা উচ্চারণ ক'রে থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষ তার নাম দিয়েছিলেন শীৎকার। চীৎকার বা শীৎকার, এর কোনোটাকেই ভাষা বলে না।

প্রজাপতির সংকল্পপূরণ ভাষানিরপেক্ষ ব্যাপার। দুই অংশীদার, পরস্পরের ভাষা না-জেনেও, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভ করতে পারে। যদি আণবিক অস্ত্রে মানবজাতির ধ্বংস ঘটে, টিকে থাকে শুধু কতিপয় কাফ্রি পুরুষ ও কতিপয় এস্কিমো নারী, তাহ'লে—যদি ঐ দু-দলে সাক্ষাৎ হয়—তারাই মানবজাতিকে আসন্ন লুপ্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না তা নয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে না ব'লে সেই মহৎ কর্মে বিঘ্ন হবে না।

অন্যান্য প্রাণীর গলা দিয়েও আওয়াজ বেরোয়। খিদে পেলে, আঘাত পেলে কামের বা বাৎসল্যের আবেগে অধিকাংশ স্থলচর পশু নিজ-নিজ বিধিবদ্ধ ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার ক'রে থাকে। পুরুষ-পাখি ইনিয়ে-বিনিয়ে সঙ্গিনীকে আহ্বান করে, আমাদের কানে তা সুশ্রাব্য ব'লে বোধ হয়, আমরা তার নাম দিয়েছি 'গান'। কিন্তু সেই ধ্বনিসমূহের পরপারে, অন্য এক দিগন্তে, মানুষের ভাষার উদয় হয়েছিলো।

পিঁপড়ে ও মৌমাছি সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন যাপন করে; মৌচাক বা বল্মীকের গঠনপটুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রাণীদের বিষয়ে বিস্ময়কর তথ্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এরা ব্যূহরচনা জানে, পারে দূরে কাছে খবর পাঠাতে, বিপৎকালে স্বজাতিকে সতর্ক ক'রে দিতে। অর্থাৎ সামাজিক জীবন ভাষা বিনাও সম্ভব।

২

ভারতীয় ভাষা-কমিশনের যে-বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার মুখবন্ধের সংস্কৃত বচন উদ্ধৃতিযোগ্য :

> .....যদৈ বাঙ্ নাভবিষ্যৎ ন ধর্মো নাধর্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগ্যেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি।
>
> (ছান্দোগ্য-উপনিষদ্, (৭।২।১)
>
> যদি বাক্ না থাকতো তবে ধর্ম বা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হ'তো না। সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ—কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না। বাক্‌কে উপাসনা করো।

বাক্ যদি উপাস্য হয় তা কি শুধু এইজন্য যে তার অভাবে 'কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না'? ভাষা ছাড়া কিছুই জানা যায় না, এ-কথা কি সত্য? নিমের পাঁচন মুখে পড়লেই আমরা জানতে পারি সেটা মনোজ্ঞ নয়, আর মধু যে মনোজ্ঞ তার প্রমাণ রসনাতেই নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়। ভঙ্গিতে ও চোখের দৃষ্টিতে মিথ্যা ধরা পড়ে শীতে আচ্ছাদন বা তৃষ্ণায় জল যে শুভ বস্তু তা স্বতই ও সেই মুহূর্তেই বিজ্ঞাপিত হ'য়ে থাকে। যে-লোকটার এইমাত্র পকেট কাটা গেলো তাকে ধর্ম ও অধর্মের তফাৎ বোঝাবার জন্য শাস্ত্র প'ড়ে শোনাতে হয় না। অতএব যদিও উপনিষদের বচন, ভাষার এই সংজ্ঞার্থ অগ্রাহ্য।

কিন্তু উপনিষদ্-সমূহেই ভাষা বিষয়ে অন্য যে-সব বাণী আছে, সেগুলিকে

উপেক্ষা ক'রে যে ভাষা-কমিশন এই বিশেষ বচনটিকে বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন—তা দৈবাৎ নয়, রীতিমতো সুচিন্তিতভাবে। ভাষা বিষয়ে অধিকাংশ সদস্যের যা মনোভাব—ভাষা বলতে তাঁরা যা বোঝেন—তার নিকটতম সংহত রূপ এই বচনে বিধৃত আছে। সে-মনোভাব তাঁদের ২৬৯ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘায়িত আলোচনার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং ২৮৯ পৃষ্ঠা ধ'রে যে-কথা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তা স্পষ্টভাবে, নির্ভুলভাবে প্রকট হ'য়ে উঠেছে গ্রন্থের সর্বশেষ অনুচ্ছেদটিতে।

> Language is in a sense profoundly important and in another sense of little or no consequence. It is important at the level of instrumentality. It is the loom on which the life of a people is Woven. It is, however, of no intrinsic consequence in itself because it is essentially an instrumentality : the loom, not the fabric : only a vehicle of thought and not thought itself : a receptacle for the traditions, usages and cultural memories of a people, but not their substance. It is not language but education that is aimed at in the school's it is not language but good government that is aimed at in the field of public administration : it is not language but justice that is sought in the law courts. That which lends itself to the most convenience is the correct solution of the language problem in the various fields. Surely, there does not have to be heat and passion over the issue of Language over the instrumentality and not the substance !
>
> (ভাষা-কমিশনের রিপোর্ট পরিচ্ছেদ ১৫, অনুচ্ছেদ ১৮, পৃ ২৮৯)

ভাবানুবাদ।

> ভাষা এক অর্থে অত্যন্ত বেশী জরুরি, অন্য অর্থে এতে প্রায় কিছুই এসে যায় না। ভাষা যেখানে যন্ত্র, সেখানে তা মূল্যবান। ভাষা সেই তাঁত, যাতে জাতির জীবন বোনা হ'য়ে থাকে। কিন্তু তার নিজস্ব মূল্য কিছু নেই, কেননা তা সারত একটি যন্ত্র মাত্র : শুধু তাঁত, বস্ত্র নয়, শুধু চিন্তার বাহন, কিন্তু চিন্তা নয়। একটি জাতির আচার, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির আধার, কিন্তু তাদের সারবস্তু নয়। বিদ্যালয়ে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, শিক্ষা ; সরকারি কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের যা লক্ষ্য তা ভাষা নয়, সুশাসন ; আদালতে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, সুবিচার। সুবিধা যাতে সর্বাধিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষাসমস্যার সেটাই নির্ভুল সমাধান। ভাষার প্রশ্ন নিয়ে নিশ্চয়ই হৃদয়াবেগ ও উত্তেজনার প্রয়োজন করে না —যে-ভাষা কখনোই সারবস্তু নয়, শুধু যন্ত্র !

অনুচ্ছেদটির প্রথম ও শেষ বাক্যে একেবারে সরলভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভাষা নামক বস্তুটা কোনো বস্তুই নয়, তাতে প্রায় কিছুই এসে যায় না। এই বক্তব্যকে জোরালো ক'রে তোলার জন্য এর প্রণেতাগণ দু-দুটি অবজ্ঞাসূচক

বিস্ময়চিহ্নেও বিদ্ধ করেছেন একে—যেন ভাষা ব্যাপারটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান। 'Instrument'-এর বদলে 'instrumentality' ব'লে ঠিক কী তফাৎ করা হ'লো তা বোঝার মতো সুগভীর ইংরেজি জ্ঞান আমার নেই : কিন্তু এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে 'যন্ত্র'রূপে স্বীকার করলেও যেটুকু স্বকীয় মর্যাদা দিতে হয় তাও তাঁরা ভাষাকে দিতে নারাজ, তাকে তাঁরা অতি কষ্টে মানতে পারেন বড়ো জোর একটি 'যান্ত্রিকতা' হিশেবে—যা সম্পূর্ণ নির্বস্তুক, বিমূর্ত, প্রায় অস্তিত্বহীন। কিন্তু শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম বিচারে যদি প্রবৃত্ত নাও হই, তাহ'লেও সন্দেহ করা যায় না যে ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সদস্য ভাষা বলতে বোঝেন একটি যন্ত্র বা বাহন, একটি আধার বা উপায় মাত্র, যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন ক'রে থাকি। এবং আমি এই মুহূর্তেই ব'লে নিতে চাই যে ভাষা বিষয়ে এই ধারণা সারত ভুল, মূলত মিথ্যা, মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিবাদী।

ভাষা যে-অর্থে উপায়মাত্র—'means of communication'—সে-অর্থে ইতর প্রাণীরও ভাষা আছে। পাখি ডাকে, পশু গর্জন করে, পিঁপড়ে প্রভৃতি কীটেরা স্পর্শের দ্বারা বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়। শুধু বার্তা পৌঁছিয়ে দেবার জন্য মানুষেরও সব সময় ভাষার দরকার করে না। চোখের দ্বারা প্রেম, ঘৃণা, অনুরোধ, নিষেধ, ভয়, বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করা যায় হাতের স্পর্শে প্রকাশ করা যায় সেবা, কামনা, শুভেচ্ছা, আবার সেই স্পর্শেরই ওজন বাড়িয়ে দিলে হিংসাবৃত্তি প্রকট হ'য়ে ওঠে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসংখ্য সাংকেতিক ভঙ্গি মানবসমাজে প্রচলিত আছে : চিমটিও একপ্রকার বার্তা—'communication', চিমটিভোগীর 'উঃ' শব্দও তা-ই। ভাষা বাদ দিয়েও যদি এতদূর পর্যন্ত বিনিময় করা যায়, আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন না ঘটে, এবং সামাজিক জীবনও সম্ভব হয়, তাহ'লে মানুষের ভাষার প্রয়োজন হ'লো কেন?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে চিমটি, চুম্বন বা হেষাধ্বনির তুলনায় ভাষা অনেক ব্যাপকতর অর্থে বার্তাবহ; মানবসমাজের বহুবিচিত্র কর্মের যথাযোগ্য সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট হবে এমন চিহ্নসমূহ শুধু ভাষাতেই পাওয়া যায়;—স্পর্শে, ভঙ্গিতে বা নিনাদে নয়। 'আমার খিদে পেয়েছে' বা 'আমি তোমাকে কামনা (বা ঘৃণা) করি'—এ-রকম কথা ভঙ্গির দ্বারা বলা গেলেও 'কংগ্রেসকে ভোট দিন', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' বা 'একনায়কত্বের অবসান চাই' বলতে

হ'লে ভাষা ভিন্ন চলেনা। 'গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে', 'ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি হিন্দি প্রচার ক'রে থাকেন', 'একটি ত্রিভুজের দুই ভুজ যুক্ত হ'লে তৃতীয় ভুজের চেয়ে দীর্ঘ হবেই'—এ-সব বলার জন্যও ভাষা চাই। এবং এ-সব কথা বাংলায় যত ভালোভাবে বলা যায়, কানাড়া, মারাঠি, হিন্দি বা উড়িয়াতেও ততটাই—উনিশ-বিশের বেশি তফাৎ এখানে হ'তে পারে না। যে-বস্তু একটা 'উপায়মাত্র, সারবস্তু নয়', যার নিজের মূল্য কিছুই নেই', তা হিন্দি হোক বা ইংরেজি হোক বা রাশিয়ান হোক, তাতে কী-ই বা এসে যাচ্ছে। অতএব—এই হ'লো ভাষা কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের পরামর্শ—আসুন আমরা সর্ব-ভারতে সবাই মিলে হিন্দিকে গ্রহণ করি, তাতে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে এবং সারা দেশে সর্বপ্রকার কাজ চালাবার পক্ষে সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি।

যদি ভাষার কাজ হ'তো শুধু বার্তাজ্ঞাপন, তথ্যপরিবেশন ও স্লোগান বা বিজ্ঞাপনধর্মী স্থূল আবেগের প্রকাশ, যদি তার দ্বারা শুধু সরকারি পত্র, রিপোর্ট, দলিল, সাংবাদিক প্রবন্ধ বা জনসভার বক্তৃতা রচনা করতে হ'তো, তাহ'লে এ-কথা মেনে নেবার তেমন বাধা ছিলো না। যদি ভাষার দ্বারা মানুষ ইতিহাস, ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা ছাড়া আর-কিছুর চর্চা না করতো, তাহ'লেও এ-কথা মেনে নেয়া একেবারে অসম্ভব হ'তো তা নয়। কেননা ইতিহাসে দেখা যায় যে মানুষ পরভাষায় এই সব কাজই চালাতে পেরেছে। মোগল আমলের ভারতে পারস্য যখন রাজকার্যের ভাষা ছিলো তখন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা তা শিখে নিয়েছেন; মধ্যযুগের য়োরোপে ইটালি, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সব দেশেই পণ্ডিতেরা লাটিন ভাষায় সূক্ষ্ম জটিল বিতর্ক ও সারবান গ্রন্থ রচনা করেছেন উনিশ শতকের রাশিয়াতে ফরাশি ছিলো—শুধু দরবারি আমির-ওমরাহের নয়, সমগ্র শিক্ষিত শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক ভাষা, যাতে এমনকি মা ছেলেকে আদর করেন বা তরুণযুগলের প্রেমালাপ চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব থেকে আরম্ভ ক'রে সেন্সাস-রিপোর্ট পর্যন্ত বহু বিষয়ে মূল্যবান গবেষণাপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার ভাষা ইংরেজি এবং প্রণেতাগণ ভারতীয়। ইংরেজিতে আমরা যা পেরেছি, হিন্দিতেই বা তা পারবো না কেন?

কিন্তু একটি প্রশ্ন বাকি থেকে যায়। কেন, যে-কালে য়োরোপ ভ'রে

বিদগ্ধজন লাটিনে ভিন্ন চিন্তা করতেন না, সেই কালেই য়োরোপের কবিরা তাঁদের নিজ-নিজ মাতৃভাষায় রচনা ক'রে গেছেন, শৌর্য এবং প্রেমসম্পৃক্ত অসংখ্য রোমান্স—যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর্থারের রাজসভার কাহিনীমণ্ডল—আর কেনই বা পরবর্তী পশ্চিমী সাহিত্য সেই দেশীয় সাহিত্যের প্রভাবেই ভরপুর? কেন প্রভাঁসালের মতো লৌকিক ভাষায় লাটিনপ্লাবিত য়োরোপ তার আধুনিক গীতিকাব্যের মূলসূত্র আবিষ্কার করেছিলো? কেন ক্যাথলিক ধর্মের যেটি শ্রেষ্ঠ সপ্রাণ অভিব্যক্তি সেই 'ডিভাইন কমেডি'র ভাষা লাটিন হ'লো না, হ'লো তখনকার অবহেলিত ইটালিয়ান? উনিশ শতকের রুশ লেখকেরা যখন অমর সাহিত্য সৃষ্টি করতেন, সেই সাহিত্যের ভাষা কেন ফরাশি হ'লো না, হ'লো রাশিয়ান—যাতে তাঁরা কৃত্য, পিতামহী ও কৃষকদের সঙ্গে ভিন্ন পারতপক্ষে কথা বলতেন না? আর কেনই বা গত দেড়শো বছরের মধ্যে, বিদেশীর পক্ষে যতদূর সম্ভব উত্তমরূপে ইংরেজি শিখেও, কোনো ভারতীয় ইংরেজিতে কোনো মৌলিক সাহিত্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেনি, যা ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদরূপে স্বীকৃত হয়েছে?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না। মানুষ পরভাষায় প্রায় যে-কোনো কাজই চালাতে পারে, পারে না শুধু কাব্য, নাটক, উপন্যাস লিখতে, সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করতে। কেন পারে না? যেহেতু সাহিত্য যেখানে সৃষ্টিশীল সেখানে মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—শুধু তার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বোধ ও হৃদয়বৃত্তি নয়, তার নির্জ্ঞান মন, তার আত্মায় অধিষ্ঠিত নরক ও স্বর্গ, তার পূর্বপুরুষের ধূসর স্মৃতিপুঞ্জ। স্পষ্ট দিবালোকে যুক্তিনির্ভর জীব ও প্রজা হিশেবে যা-কিছু কর্ম করি আমরা—সন্তানপালন, রাষ্ট্রচালনা, শিক্ষাদান, বিচার-বিতরণ, তার বিধিবদ্ধতার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় যে-কোনো ভাষাকেই মানিয়ে নেয়া যায়, এবং সুবিধে বুঝে একটা ফেলে আর-একটাকে গ্রহণ করলেও আপত্তি ওঠে না। যদি মানবিক ভাষার বদলে চিহ্ন ব্যবহার করলে গণিত অথবা বিজ্ঞানের বেশি সুবিধে হয়, নিশ্চয়ই তা-ই করতে হবে। উদ্দেশ্য যেখানে সুনির্ণীত, যেখানে আমরা জ্ঞান দিতে চাই, কিছু প্রমাণ করতে চাই, চাই বিরোধী মতকে পরাস্ত করতে অথবা দেশপ্রেমের মতো কোনো সমষ্টিগত আবেগ জাগাতে, সেখানে ভাষা জিনিষটাকে নেহাৎই একটা উপায় হিশেবে স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য একটা জীবন আছে মানুষের,

তা না-থাকলে সে পূর্ণ মানব হ'তো না। সে-জীবন গোধূলির, আধো অন্ধকারের, স্বপ্নের। এই বিজ্ঞানপোষিত বিশ শতকেও স্বপ্নে আমরা ছেলেমানুষ বা আদিম মানুষে রূপান্তরিত হই, সেখানে আমাদের দিনের আলোর সব শিক্ষা ধ্বসে পড়ে, ত্রাস আশা উদ্যম কোনো যুক্তি মানে না, স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গের মধ্যে হাৎড়ে-হাৎড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয় আমাদের। সেই অচিন্তিত চলার কোনো চিহ্ন যদি খুঁজে পাই আমরা, সে-চিহ্ন একটিমাত্র হ'তে পারে আমাদের মাতৃভাষা। সেই আদিম ও আবিল অন্ধকার থেকে যদি কোনো স্বচ্ছ মণি আমরা ছেঁকে তুলতে চাই, চাই কোনো স্মৃতি, আবিষ্কার বা অভিজ্ঞানকে ছিনিয়ে আনতে, সে-কাজ সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র এই ভাষাতে, যা আমাদের অচেতনের অন্তরঙ্গ, এবং যার মধ্যে পরতে-পরতে জড়িত হ'য়ে আছে আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষের বহুযুগব্যাপী জীবনসূত্র। এবং সেই কাজই কবি ক'রে থাকেন : সচেতন জীবনের সঙ্গে অচেতনের ঘটকালি করেন তিনি ; আমাদের বন্ধ বিশৃঙ্খল স্বপ্নসত্তাকে চিন্ময়রূপ দান করেন, চৈতন্যকে পূর্ণতা দেন স্বপ্নযামিনীর সংস্পর্শে এনে। মানুষের এই একটি কাজ, যা ভাষা বিনা সম্ভব হয় না, এবং বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ভাষার ভিন্ন সম্ভব হয় না। অতএব এই কাজটিকে পরীক্ষা না-করা পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না, ভাষা বলতে সত্যি কী বোঝায়, মানবজীবন ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী। ভাষা ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর-সম্পৃক্ত একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু ভাষা-কমিশনের বিবৃতিটি নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রেও ঠিক এই প্রসঙ্গের সীমান্তে এসে থেমে গেছে। 'বিদ্যালয়ে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, শিক্ষা সরকারি কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের যা লক্ষ্য তা ভাষা নয়, সুশাসন, আদালতে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, সুবিচার।' কিন্তু এর পরে কবিতার কথা উল্লেখ করতে হ'লে বলতে হ'তো, 'কবিতায় আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, কবিতা'—যার অর্থ দাঁড়াতো, 'কবিতায় আমাদের লক্ষ্য ভাষা ভিন্ন আর-কিছু নয়।' কিন্তু এ-কথা কমিশনের অধিকাংশ সদস্য বলতে পারতেন না ও বলতে পারেননি, কেননা তাহ'লে মহোদয়গণের সকল যুক্তি ভেঙে পড়তো। যদিও তাঁদের আলোচনার বিষয় ভাষা, সৃষ্টিশীল সাহিত্য বিষয়ে আদ্যন্ত একটি গভীর নীরবতা বজায় রেখেছেন তাঁরা। ভালোই করেছেন ; আমাদের পক্ষে বোঝা আরো সহজ হয়েছে যে তাঁদের সচেতন

উদ্দেশ্য, মুখবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত, পদে-পদে ভ্রান্তিপ্রচার।

আইন, শিক্ষা, শাসন প্রভৃতিকে যথাবিহিত সম্মান জানাবার পর আমরা যখন সাহিত্যের আহ্বান শুনতে পাই, তখনই ভাষা বিষয়ে অন্য একটি ধারণায় আমাদের অন্তস্তল উদ্ভাসিত হ'তে থাকে ; এই একটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে আমরা উপলব্ধি করি যে ভাষা কোনো উপায়মাত্র নয়, ভাষাই উৎস চিন্তা থেকে ভাষা নির্গত হয় না, ভাষাই চিন্তাকে জন্ম দেয়। স্বপ্নে আমরা যা দেখি সেই ছবিগুলোকে বলা যায় বিশ্বপুরাণের চিত্রকল্প, মানবাত্মার আবেগসমষ্টির আদিরূপ ; সেই ক্ষণিক, চঞ্চল ও অসংলগ্ন চিত্রসমূহ তাদের অব্যবহিত আবেগ-সঞ্চার পরিহার ক'রে যখন ভাষার মধ্যে স্থিরতা, স্থায়িত্ব ও স্বচ্ছতা পেলো, তখনই চিন্তা নামক কাজটি সম্ভব হ'লো মানুষের পক্ষে। তার আগে চিন্তা ছিলো না, ছিলো শুধু আবেগের আঘাত আর ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। বাঘ যখন ক্ষুধার আবেগে আকুল শুধু তখনই সে হরিণটাকে লক্ষ্য করে, অন্য সময়ে হরিণের কোনো অস্তিত্বই নেই তার কাছে। কিন্তু মানুষ যখন হরিণকে আহার অথবা আদর করতে না চায় তখনও হরিণের সত্তা তার কাছে সুস্পষ্ট, কেননা 'হরিণ' নামক শব্দটাকে সে পেয়েছে। ঐ শব্দ আছে ব'লেই, হরিণ বিষয়ে কোনো ব্যক্তিগত আবেগের অধীন না-হ'য়েও, তাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব না-ক'রেও, ঐ জন্তুকে মনে-মনে ধারণা করতে পারে সে, অর্থাৎ তার বিষয়ে চিন্তা করতে পারে। যদি স্বপ্নের চিত্রভাষা ছাড়া আর-কিছু না থাকতো, তাহ'লেও পুরাণের অস্তিত্ব থাকতো না তা নয় কিন্তু ইতিহাস সম্ভব হ'তো না। যদি মানুষ তার স্খলমান মুহূর্তগুলির অব্যবহিত প্রভাবের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো, তাহ'লেও ক্রণাবস্থায় রূপকথা সম্ভব হ'তো না তা নয়, কিন্তু বিজ্ঞান হ'তো না। তাঁরই নাম কবি, যিনি আবেগের দৈহিক অভিঘাত থেকে যাত্রা ক'রে সেই দৈহিক অভিঘাত থেকে মুক্তি দেন মানুষকে, ইন্দ্রিয়গত সংবেদনকে রূপান্তরিত করেন সেই আধ্যাত্মিক সামগ্রীতে, যাকে আমরা অভিজ্ঞতা ব'লে থাকি। আমাদের এই আদিকবি একেবারে কাব্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের জনক : তাঁর চিত্তে আবেগ থেকে জ্ঞান নিষ্কাশিত হ'য়ে জ্ঞান আবার সঞ্জীবিত হয়েছে আবেগে ; বিশ্বপুরাণ থেকে মানবেতিহাস বিশ্লিষ্ট হবার পর ইতিহাস আবার পুরাণের স্রোতে মিশ্রিত হ'য়ে নতুন ক'রে প্রাণ পেয়েছে। এবং তাঁর ও ভাষার

জন্ম একই সঙ্গে তাঁর সত্তা একান্তরূপে ভাষানির্ভর। মানুষের ভাষা আছে, এতেই প্রমাণ হয় যে তার সারাৎসার কবির। মানুষ যদি কবি না হ'তো তাহ'লে তার ভাষার প্রয়োজন হ'তো না।

এইজন্যে জার্মান দার্শনিক হামান্ বলেছিলেন যে 'কবিতাই মানবজাতির মাতৃভাষা।' য়োহান্ গেয়র্গ হামান্, যাঁর প্রভাবের বশবর্তী হ'য়ে প্রথমে হের্ডার ও পরে গ্যেটে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করেন, তাঁর এই বাক্যের সমর্থন আছে পৃথিবীর বহু পুরাণে ও ধর্মগ্রন্থে। ইহুদির অতি-সরল সৃষ্টি-কাহিনীতে চিন্তনীয় অংশ সেখানে আরম্ভ হ'লো, যেখানে ভগবান, ছয় দিনে বিশ্বনির্মাণ ও সপ্তম দিনে বিশ্রাম করার পর, যাবতীয় জন্তু ও প্রাণীকে আদমের সামনে উপস্থিত করলেন নামকরণের জন্য। প্রত্যেক প্রাণীর একটি ক'রে নাম চাই, এবং সে-নাম আদমকেই দিতে হবে। ভগবানের এই নির্দেশেই বোঝা যায় যে আদমের পতন অনিবার্য, এবং সে-পতন ভগবানেরই অভিপ্রেত ছিলো। কেননা যে-মানুষ নামকরণ করে সে অমরকাননের অজ্ঞান অবস্থা ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে, হ'য়ে উঠেছে একাধারে কবি ও বিজ্ঞানী। জ্ঞানের ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, মানুষের এই দুই বৃত্তি সমভাবে সজাগ, একটিকে বাদ দিতে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয় না। 'হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম। কী তোমার নাম। হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে। নামেতে কী হবে। আর কিছু নয়। হাসিতে তোমার পরিচয়'—লেখক যদিও রবীন্দ্রনাথ, তবু এই কথাকে পূর্ণ মানবের উক্তি বলে মানতে পারি না আমরা : কোনো অচেনা ফুল দেখলে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, 'এর নাম কী?', এবং রবীন্দ্রনাথও তা-ই করেছিলেন। সেই নামের সংজ্ঞার্থ উদ্ভিদবিজ্ঞানীর পক্ষে এক প্রকার, কবির পক্ষে অন্যপ্রকার কিন্তু নাম জিনিশটা দু-জনেরই চাই, তা না-পাওয়া পর্যন্ত ঐ ফুল মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার্য হয় না। মানুষের ভাষাকে শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে নামের সমষ্টি হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে এই জগৎ নাম ও রূপের দ্বারা গঠিত। আর এ-বিষয়েও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে মতভেদ নেই যে শুধু পরমেশ্বরের নাম আবৃত্তি ক'রে মানুষ ত্রাণ পেতে পারে।

'প্রারম্ভে ছিলো বাক্', এই ব'লে সন্ত ইয়ন তাঁর যিশুজীবনী আরম্ভ করেছেন। রনাল্ড নক্স-কৃত বাইবেলের নূতন অনুবাদে কথাটা ঈষৎ ভিন্নভাবে বলা আছে—'কালের যখন আরম্ভ তখনই বাক্ ছিলো : ঈশ্বরের সহচর ছিলো

বাক্ সেই বাক্‌ই ঈশ্বর। তিনি (বাক্) ছিলেন, কালের প্রারম্ভে, ঈশ্বরের সহচর হ'য়ে তাঁরই মধ্য দিয়ে সর্বভূত উদ্ভূত হ'লো যা-কিছু হয়েছে তাঁর বিহনে কিছুই হয়নি। তাঁরই মধ্যে ছিলো প্রাণ, সেই প্রাণ মানবের আলোক-স্বরূপ।' এবং, সন্ত ইয়নের মতে, যীশুর মধ্যে 'the word was made flesh', যীশু এই বাক্-এরই অবতার। উপনিষদ্‌সমূহে ব্রহ্মের নামান্তর 'অক্ষর', এবং সংস্কৃতে ঐ শব্দের অর্থ একাধারে 'অপরিবর্তনীয়' বা 'ধ্বংসহীন', এবং শব্দ বা 'বর্ণ-মালার চিহ্ন'। বাক্ ও ব্রহ্মকে এক ব'লে ভাবা হয়েছে এখানে, এক ব'লে বিশ্বাস করা হয়েছে। 'অক্ষর' বলতে ওঙ্কারকেও বোঝায়, যে-ওঙ্কার জীবাত্মারূপ বাণের ধনুস্বরূপ (মুণ্ডকোপনিষদ্ : ২।২।৪), আত্মা থেকে অভিন্ন (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ : ৮), ধ্যানের অবলম্বন (মুণ্ডকোপনিষদ্ : ২।২।৬) এবং সর্ববেদের প্রধান ও স্বয়ং পরমেশ্বর (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ : ১।৪।১)। অক্ষরকে না-জানলে বেদজ্ঞান বৃথা, কেননা পরমাকাশরূপ অক্ষরেই (ব্রহ্মেই) ঋগাদি বেদ ও সর্বদেবতা আশ্রিত আছেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ : ৬।৮)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, সর্বজীবের প্রাণের উৎসই বাক্ পশু, মানব ও দেবগণের মধ্যে সকলেই বাক্-নির্ভর, বাক্ ধ্বংসহীন, সনাতনের আদিসন্তান, বেদাদির মাতা ও বিশ্বের নাভিস্বরূপ। প্রাচীন পারসিকের ধর্মগ্রন্থ—যেখানে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বকে সৃষ্টির মূলসূত্র ব'লে কল্পনা করা হয়েছে তার সৃষ্টিকাহিনী অনুসারে ভগবানের পরম শক্তি বাক্, বাক্ পার্থিব সৃষ্টির পূর্বজ ও শয়তানের শক্তির বিরুদ্ধে রক্ষা-কবচ। বহু আদিম জাতির পুরাণেও এই বিশ্বাস পাওয়া যায় যে বাক্ ও সৃষ্টি-কর্তা অভিন্ন এবং বাক্ থেকেই সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছে।

বাক্ থেকে সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছে, জীবনের বহু ক্ষেত্রে এর কোনো নিদর্শন আমরা পাই না, বরং উল্টো পক্ষেই অনেক সাক্ষী সংগ্রহ করা যেতে পারে। কথাটা আজকের দিনে উচ্চার্য হ'তো না, যদি না, হর্বার্ট স্পেন্সারের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ ক'রে, মানবজাতি নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিতো যে কবিতা না-হ'লে তার চলে না। যন্ত্র এবং উপযোগবাদের এই ব্যাপ্তির দিনেও কবিতার সত্তা যে অনাক্রমণীয়, এতেই বোঝা যায় যে মানুষের আদি পুরাণসমূহ ভুল করেনি। বাক্ থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, কবিতাই এ-কথার তর্কাতীত প্রতিষ্ঠাভূমি। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, বা স্মরণ করি, তখনই বুঝি ভাষার মূল্য তার নিজেরই মধ্যে, তার অভিধানগত অর্থের মধ্যে সে মূল্যকে ধরানো যায় না।

বাহনমাত্র নয় সে, নিজেই দেবতা। কবি যখন কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি তখনই বোঝেন যে সৃষ্টির উৎসফলই ভাষা, তাঁর রচিত কাব্যটি যতটা তাঁর ঠিক ততটাই তাঁর ভাষার সৃষ্টি যে ভাষা তাঁর হাতে একটি যন্ত্র হওয়া দূরে থাক, তিনি বরং তখনকার মতো ভাষার একটি নিমিত্তে পরিণত হন, এবং নিমিত্ত হিশেবে তিনি কতদূর পর্যন্ত বাধ্য, মনোযোগী ও তন্ময় হ'তে পারেন তারই উপর তাঁর কৃতার্থতা নির্ভর করে। এবং ভাষার উচ্চতম ও সত্য রূপও এখানেই আমরা দেখতে পাই—কবিতায় বা সৃষ্টিশীল সাহিত্যে।

৩

ভাষা-কমিশন যে-ঔপনিষদিক বচন উদ্ধৃত করেছেন এবার সেটিতে ফিরে আসা যাক। 'যদি বাক্ না থাকতো তবে ধর্ম বা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হ'তো না, সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ—কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না।' এই উক্তির প্রকৃত অর্থ এই নয় যে ভাষা একটি উপায়মাত্র—কেননা শিশুও জানে যে ভাষা বিনাও মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের তফাৎ বোঝা যায়; এর আসল অভিপ্রায় এ-বিষয়ে আমাদের সতর্ক ক'রে দেয়া যে ভাষা বস্তুটি উভমুখী। সত্য ও মিথ্যা, ভালো ও মন্দ, ধর্ম বা অধর্ম, প্রীতিকর ও কষ্টকর—ভাষা একাধারে ও নির্বিচারে সবই জানাতে পারে, এই সব বিপরীতযুগলের নিরপেক্ষ প্রকাশক সে। তাই ভাইকে গুলি ক'রে মারার পর আদালতে নির্দোষ ব'লে প্রমাণিত হয়, তা উকিলের ভাষারই সাহায্যে যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশের প্রচারকর্তারা শত্রুপক্ষকে পিশাচরূপে প্রতিপন্ন করেন, তারও মূলে আছে ভাষা। এবং কোনো সরকারি কমিশন, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ভাষা ব্যবহার ক'রেই, এমন কোনো প্রস্তাবকে সারা দেশের পক্ষে হিতকর ব'লে ঘোষণা করতে পারেন, যাতে স্বল্পসংখ্যকের স্ফীতি ঘটিয়ে অধিকাংশকে বিনষ্ট করা হবে। ব্যবহারের অসাধুতা সঙ্গে-সঙ্গেই ধরা পড়ে, ভাষার অসাধুতা সূক্ষ্ম ব'লেই আরো বেশি ভয়াবহ। বাণিজ্যে, সংসারকর্মে, রাষ্ট্রচালনায় এই ভাষাগত অসাধুতা ব্যাপক-ভাবে দেখা যায়—শুধু আজকের দিনে নয়, ইতিহাসের যুগে যুগে। যে-বস্তু এত বেশি বিকারপ্রবণ তাকে উপাস্য বলি কেমন ক'রে?

হয়তো এই অর্থেই হোফ্মান্‌স্থাল বলেছিলেন যে 'ভাষা মানুষের সবচেয়ে বিপজ্জনক সম্পত্তি'। বুদ্ধিমানের হাতে ভাষার বিকৃতি সহজেই ঘ'টে থাকে এবং যাঁর যত বেশি বুদ্ধি তিনি ভাষাকে তত বেশি বিকৃত করতে পারেন।

'গালিভার্স ট্র্যাভলস'-এর শেষ অধ্যায়ে সুইফ্‌ট্‌ যে-অশ্বরূপী আদর্শ জীবের কল্পনা করেছিলেন তাদের পরিমিত ভাষায় 'মতামতে'র প্রতিশব্দ নেই, কেননা সেই পরম যুক্তিবাদী অশ্বসমাজ একান্তভাবে প্রমিতির প্রবক্তা, তাদের মধ্যে কখনো কোনো মতভেদ ঘটে না। আঠারো-শতকী আদর্শ-অনুযায়ী মানুষ একটি যুক্তিময় যন্ত্র হয়নি ব'লে আক্ষেপ করবো না আমরা, কেননা আমরা সকলেই জানি যে মানুষ যেমন কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি রিপুর বশবর্তী, তেমনি তার মধ্যে প্রেম ভক্তি ত্যাগ ও সৃষ্টিশীলতার মতো মহৎ বৃত্তিও বিদ্যমান, এবং এই প্রবৃত্তি ও বৃত্তিসমূহ অন্যোন্যনির্ভর। একদিকে কামুক হিংসুক লোভী প্রভৃতি না-হ'লে অন্যদিকে সে সন্ত, বীর বা ঋষিও হ'তে পারতো না : সুইফ্‌ট্‌-এর 'উইনিম'-সমাজে সকলেই নৈতিক অর্থে ও নীরসভাবে ভালো, কিন্তু মহৎ কেউ নয়। মানুষ যেখানে জান্তব সেখানে সে অযৌক্তিক, আর যেখানে সে দেবতার মতো সেখানে সে অতিযৌক্তিক : তার নিম্নতম ও উচ্চতম স্তর সমানভাবে যুক্তিবহির্ভূত। এবং সাধারণত এই দুই স্তরের অস্তিত্ব যুগপৎ ও অবিচ্ছেদী ব'লে মানবসমাজে কোনো বিশুদ্ধ যুক্তি সম্ভব হয় না দার্শনিক দূরকল্পনায় তার ধারণা থাকলেও, কার্যত সব যুক্তির মধ্যেই প্রবেশ করে কোনো প্রবৃত্তি বা বৃত্তি, কোনো স্বার্থপর কামনা বা কোনো উন্নত আদর্শপ্রসূত আবেগ, এবং ঐ দুই বস্তুর একটি থেকে অন্যটিকে চিনে নেয়া যে সব সময় সহজ হয় না তার কারণই মানুষের ভাষার উভমুখী প্রকৃতি। যে-কোনো প্রশ্ন উঠুক, সভ্য মানুষ তার দুই দিকেই প্রায় একই রকম প্রভাবশালী তর্ক করতে পারে নিজে যা বিশ্বাস করে না তার সমর্থন ক'রে ডিবেটিং ক্লাবে বাহবা পায় কলেজের ছাত্র ; যখন যে-সরকার প্রতিষ্ঠা পান তাঁদেরই পছন্দমতো মতপ্রচারে রাজপুরুষের যুক্তির অভাব ঘটে না। শয়তান শাস্ত্র আওড়ায় : জুলিয়স সীজর বীর না অত্যাচারী, সে-বিষয়ে জনতার ধারণা ব্রুটাস বা মার্ক অ্যান্টনির বক্তৃতা অনুসারে বদলে যায়। যাকে আমরা যুক্তি বলি তার সাহায্যে অনেক সময়ই সত্যকে জানা যায় না : যে-ভাষা যুক্তির বাহন, সেই ভাষাই নানা বিভ্রমের সৃষ্টি করে। ভাষা যেখানে বাহন বা উপায়মাত্র, সেখানে তার বিকারপ্রবণতা অচিকিৎস্য।

কিন্তু এমন কোনো ক্ষেত্র কি নেই, ভাষা যেখানে মিথ্যাচারী হ'তে পারে না, আর তা যদি না থাকে তাহ'লে ভাষার নিজস্ব মূল্যই বা কোথায়।

এই প্রশ্নের উত্তরে হোল্ডালিনেরই আর-একটি কথা উদ্ধৃত করবো : 'মানুষের সবচেয়ে অনপকারী কর্ম কবিতা।' 'অনপকারী'—কথাটাকে খুব কমিয়ে, অত্যন্ত মৃদুভাবে বলা হয়েছে এর আসল অর্থ বুঝতে হ'লে কবিতার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধের কথা ভাবতে হবে। কবিতা সবচেয়ে অনপকারী কর্ম এই অর্থে যে কবিতায়—সৃষ্টিশীল সাহিত্যে—এবং একমাত্র সেখানেই—ভাষা হ'য়ে ওঠে অবিকার, নিষ্কলুষেয়, অমোঘভাবে সত্য। সাহিত্যের মহত্তম মুহূর্তগুলিতে সত্যের বদলে অসত্য, ধর্মের বদলে অধর্ম, মনোজ্ঞের বদলে অমনোজ্ঞের প্রকাশিত হবার উপায় নেই কিন্তু আইন, বাণিজ্য বা রাষ্ট্রচালনা যেখানে সবচেয়ে উন্নত সেখানেও ভাষার মিথ্যাচার সম্ভব হ'তে পারে এবং হ'য়ে থাকে। কেননা আমাদের বোঝা ব্যাপারটা বুদ্ধির কাজ, আর উপলব্ধি স্বজ্ঞার বুদ্ধি যদি আপন গুণেই নির্ভরযোগ্য হ'তো তাহ'লে মানবসমাজে ভুল বোঝা ব'লে কিছু থাকতো না; বুদ্ধির এই অপলাপী স্বভাব শোধন ক'রে নিতে হ'লে স্বজ্ঞার সঙ্গে তার যোগসাধন চাই। স্বজ্ঞার উপলব্ধিতে কখনো ভুল হয় না কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা তার নেই সে যখন বুদ্ধিকে তার সেবকরূপে গ্রহণ করে তখনই ভাষা হ'য়ে ওঠে সত্য, আর কবিতা সেই সত্য ভাষারই নামান্তর। এই ভাষা, মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা যাতে দীপ্যমান, তা তার মাতৃভাষা ভিন্ন আর কিছু হ'তে পারে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা উপযোগ বুঝে ভাষা বদলাতে পারি, যেমন পারি সুবিধেমতো বিভিন্ন বেশ ধারণ করতে, কিন্তু ভাষা যেখানে অবিকার ও সত্য সেই সাহিত্যের প্রসঙ্গে ভাষা বলতে শুধু মাতৃভাষাকেই বুঝতে হবে। মাতৃভাষা আমাদের চিন্তার জননী, আমাদের আত্মিক জীবনের পরিচালিকা। এবং সেই ভাষা 'কখনোই সারবস্তু নয়, শুধু সত্ত্ব', আর তা নিয়ে 'হৃদয়াবেগ বা উত্তেজনা'র প্রয়োজন করে না, এ-কথা যাঁরা বলেন ভাষা বিষয়ে তাঁদের কোনো পরামর্শ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হওয়া অসম্ভব।

৪

কিন্তু—কেউ-কেউ আপত্তি তুলতে পারেন—হিন্দি ভারতের সরকারি ভাষা হ'লে অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষতি হবে কেন? যেমন লাটিন-প্লাবিত য়োরোপে ভিন্ন-ভিন্ন মাতৃভাষায় কাব্য রচিত হয়েছিলো, উনিশ-শতকী রুশ মনীষীরা ফরাশির আধিপত্য সত্ত্বেও খাঁটি রুশীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, এবং

ইংরেজ-শাসিত ভারতের কোনো-কোনো অংশে মাতৃভাষা ও তার সাহিত্যের নবজন্ম ঘটেছিলো, তেমনি নিখিলভারতের সরকারি কাজে হিন্দি ব্যবহৃত হ'লেও ভিন্ন-ভিন্ন সাহিত্যের বিকাশ হবার বাধা কী ? মাতৃভাষা যদি আত্মিক ব্যাপারই হয় তারও উন্নতিসাধন তো আমাদেরই হাতে আছে, রাষ্ট্র সেখানে কী করতে পারে ? একই রকম যুক্তি অনুসারে ইংরেজ আমলে কেউ-কেউ বলতেন যে পরাধীনতা একটা কথার কথা মাত্র, তার অবসান ঘটাবার চেষ্টাও অনর্থক ; কেননা পরাধীন অবস্থাতেও আমরা আকাশের নীলিমা দেখে খুশি হ'তে পারি এবং যোগাসনে মোক্ষলাভেরও বাধা হয় না। আজ আজকের দিনে, এই যুক্তি অনুসারেই, অনেকে ব'লে থাকেন যে অন্তরের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না, অতএব একনায়কত্বে দোষ নেই। ভাষা বিষয়ে আসল কথাটা এই যে কোনো পরভাষার আধিপত্য—সেই পরভাষা মাতৃভাষার তুলনায় অনেক উন্নত হ'লেও—মানুষ বেশিদিন সহ্য করতে পারে না : এত যে বলশালী সংস্কৃত ভাষা তাকেও হার মানতে হ'লো বিভিন্ন অপরিণত কথ্য ভাষার কাছে ; লাটিন ভাষার আদিভূমি ইটালিতে মধ্যযুগীয় য়োরোপের প্রথম 'ভার্নাকুলর'-সাহিত্যের প্রোজ্জ্বল অভ্যুদয় ঘটলো, ইংরেজি সাহিত্যের গরীয়ান এলিজাবেথীয় যুগ, আর গ্যেটের যুগে জর্মান সাহিত্যের উত্থান—এ-দুয়েরই পটভূমিতে আছে বাইবেলের জেমসীয় ও লুথারীয় অনুবাদ—অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে লাটিন থেকে মুক্তিপ্রাপ্তি ; এবং উনিশ শতকে রুশ সাহিত্যের আকস্মিক ও আশ্চর্য আবির্ভাবের একটি কারণ এই যে রাশিয়া, আদিচার্চের অধীন ও লাটিনবর্জিত দেশ ব'লে, প্রথম থেকেই মাতৃভাষাকে ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করেছে। আর উনিশ-শতকী বাংলাদেশে—ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও, বা তারই ফলে—স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যুগান্তকারী জাগরণ ঘটলো, যার পরিণতি 'স্বদেশী' আন্দোলনে। বাংলার সেই নবজন্মক্ষণেই আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়, এ-কথা ভারতবর্ষীয় সকলেই জানেন যদিও আজ অনেকে স্বীকার করতে চান না।

ভারতে ইংরেজি ভাষার অবস্থা বিষয়ে আর-একটু বলা দরকার। প্রথমেই অর্তব্য যে ইংরেজি শাসকেরা তাঁদের ভাষাকে জোর করে আমাদের উপর চাপাননি ; এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী ও সচেষ্ট হয়েছিলেন আমাদেরই রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত মহাপুরুষগণ। কেন,

সচেষ্ট হয়েছিলেন ? যেহেতু তাঁরা বুঝেছিলেন যে ভারতের শেতাঙ্গ শাসকগণ আধুনিক জগৎ ও মানসতার প্রতিভূ, এবং তাঁদের ভাষাকে বাহনরূপে ব্যবহার ক'রে আমরা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালে বদলি হতে পারি। সেকালে দেশের যে-সব অংশে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার অনুপ্রেরণা প্রত্যাখ্যাত হয়, বাদশাহি স্মৃতিমন্থর সেই উত্তরভারতে মধ্যযুগের অবসান ঘটতে বিলম্ব হ'লো, কিংবা এখনো সম্পূর্ণভাবে ঘটেনি—এবং একই কারণে হিন্দি ভাষায় ও সাহিত্যে আধুনিক জীবন স্বাভাবিকভাবে বিম্বিত হতে পারছে না। কিন্তু যেখানে পশ্চিমের দিকে পুরোপুরি দরজা খুলে গেলো—যেমন বাংলাদেশে—সেখানেও ইংরেজি ভাষা গৃহীত হ'লো একটি মূল্যবান যন্ত্র বা উপায় হিশেবে, তার বেশি নয় মধুসূদনের ব্যর্থ প্রয়াসের পরে প্রায় সকলেই বুঝে নিলেন যে ইংরেজিতে আমরা কাব্য রচনা করতে পারি না, আত্মাকে প্রকাশ করতে পারি না. যে বিশ্বমানসে স্থান পেতে হ'লে মাতৃভাষার চর্চা করা আমাদের কর্তব্য। এবং সেই মাতৃভাষার চর্চায় ইংরেজি কখনো আমাদের প্রতিবন্ধক হয়নি, উল্টে প্রেরণা দিয়েছে, এবং এখনো দিচ্ছে। গত দেড়শো বছরে, অন্তত বাংলাদেশে, ইংরেজি যেটুকু প্রসারলাভ করেছে, তার তুলনায় বহুগুণ বেশি বিস্তার ও মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটেছে মাতৃভাষার। স্যর আশুতোষ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে এম. এ. উপাধির প্রবর্তন করেন তখন ব্রিটিশ রাজ পূর্ণপ্রতাপে অধিষ্ঠিত : যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ বাংলাভাষায় রচনা করেন তখনও ইংরেজের ভারত-ত্যাগ কল্পনামাত্র এবং যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজির বদলে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠিত হ'লো, বা সরকারি কার্যের উপযোগী বাংলা পরিভাষা রচনার জন্য প্রথম সমিতি গঠিত হ'লো, তখন পর্যন্ত ইংরেজ আমলের অবসান ঘটেনি। ইংরেজি ভাষা ইংরেজের রাজত্বকালেই, একে-একে বহু ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আজকের দিনের স্বাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশে হিন্দি যে-ভাবে দেখা দিয়েছে তাকে মদমত্ত ও ব্যভিচারী বললে ভুল হয় না। দাবি তার প্রকাণ্ড, উদ্ধত তার উচ্চাশা। আমাদের সংবিধানপত্রে ভারতের সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে হিন্দি, সেই স্বীকৃতিও প্রামাণিক কিনা সন্দেহ করা যেতে পারে, কেননা এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো লোকসভায় নয়, অতি সংকীর্ণ মতাধিক্যের

জোরে বিধান-সভায়। তৎসত্ত্বেও, শুধু সরকারি ভাষা নিয়ে কথা হ'লে এই স্বীকৃতিকে গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে হয়তো একেবারে অসম্ভব হ'তো না। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী দশ বছর ধ'রে হিন্দি সর্বভারতে প্রচারিত হয়েছে—সরকারি ভাষা হিশেবে নয়, তাকে বলা হ'য়েছে রাষ্ট্রভাষা বা 'জাতীয় ভাষা'—the national language। সেই সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলির জন্য অন্য একটি বিশেষণ উদ্ভাবিত হয়েছে : 'regional' অর্থাৎ 'আঞ্চলিক' বা 'দৈশিক'। এই দুটো শব্দকেই আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করছি। যে-ভাষা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের মাতৃভাষা, তাকেই 'আঞ্চলিক' বলা যেতে পারে আর যে-অর্থে তামিল, বাংলা, কানাড়া, মলয়ালি যতটা 'আঞ্চলিক' হিন্দিও ঠিক ততটাই তা-ই এবং ফরাশি, জর্মান, জাপানি, রুশ প্রভৃতি ভাষা যতটা আঞ্চলিক, বাংলা, তেলুগু, মরাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাও ঠিক তা-ই। অতএব এই বিশেষণের কোনো অর্থই হয় না এর ব্যাপক ব্যবহার—যা সরকারি ভাষা-কমিশনের বিবৃতিতেও বিরাজমান—তার উদ্দেশ্যই হ'লো হিন্দি ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মর্যাদাহানি। 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটার দুটো অর্থ হ'তে পারে : রাষ্ট্রিক কর্মের জন্য ব্যবহৃত ভাষা বা সরকারি ভাষা, এবং 'জাতীয় ভাষা'—অর্থাৎ যে-ভাষা দেশের সমগ্র প্রজাগণের মাতৃভাষা। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্ন ওঠে : কোন সরকারের কথা ভাষা হচ্ছে? পশ্চিম বাংলা, মাদ্রাজ না নয়া দিল্লি? আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র বা পশ্চিম বাংলার সরকার হিন্দী ভাষায় তাঁদের কাজকর্ম চালাবেন, এ-রকম কল্পনা সম্ভব হয় শুধু হিটলারের মতো মতিগতি হ'লে। এ-রকম কল্পনা কোথাও দেখা দিয়েছে কিনা সেটা এই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশ পাবে এখানে ব'লে নেয়া দরকার যে হিন্দি-প্রচারকদের অত্যুগ্র উৎসাহ—যাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি[১] অনিরল ইন্ধন জুগিয়ে আসছেন—'রাষ্ট্রভাষা'র দ্বিতীয় অর্থ চালাবার জন্যই বদ্ধপরিকর হিন্দির সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ জড়িত বা যাঁদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা নেই, এমন অনেকে ধ'রে নিয়েছেন যে ভারতের 'জাতীয়' অর্থাৎ সার্বভৌম ভাষার নামই হিন্দি। এই কথাটা শুধু ভুল নয়, অসত্য; শুধু অসত্য নয় মিথ্যা। যে অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয়' ভাষা ইংরেজি,

১ বুলেটিন : ১৩ই মার্চ ১৯৫৭ (৩০শে ফাল্গুনী ১৩৬৩) সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ঘোষণায় এ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। সঃ উ সংসদী

সে-অর্থে কোনো-একটি স্বাভাবিক সার্বভৌম ভাষা ভারতের এখনো নেই, কখনোই ছিলো না। ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই নিখিল ভারত এক ভাষায় কথা বলেনি ; এই বৈচিত্র্যই তার ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, তার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি ; এবং এই বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনায়করাও প্রতিশ্রুত আছেন। যদি 'জাতীয়' কথাটার ব্যবহার করতেই হয় তাহ'লে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সংবিধানপত্রে গৃহীত চোদ্দটি ভাষাই আমাদের 'জাতীয় ভাষা'। এই চোদ্দটি ভাষার মধ্য থেকে হঠাৎ একটিকে ভিত্তিহীন সার্বভৌমতার সিংহাসনে বসিয়ে, অন্য বারোটি জীবিত, সমকক্ষ ও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নত ভাষাকে 'আঞ্চলিক'রূপ অবাস্তব ও অপমানজনক বিশেষণের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রাখার এই যে দুশ্চেষ্টা, এ সম্ভব হ'তে পারে শুধু সেই যুক্তির বলে, যে-যুক্তিতে ইংরেজ একদা বিনাবিচারে বহু ভারতীয়কে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরুদ্ধ রেখেছিলেন। ইংরেজের যুক্তি ছিলো 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' হিন্দি প্রচারকদের যুক্তি হ'লো 'সার্বভারতীয় ঐক্য'। নিজগুণে উভয় বস্তুই বাঞ্ছনীয় ও শ্রদ্ধেয়, তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু সেদিন ইংরেজ যেমন আইন ও শৃঙ্খলার নামেই সুবিচারকে হত্যা করেছিলো তেমনি হিন্দি-প্রচারকরাও আজ উদ্যত হয়েছেন ভারতীয় ঐক্যের নামেই সর্বভারতীয় ঐক্য, সংবিধানে প্রতিশ্রুত মৌলিক অধিকার ও ভারতের সদ্যোজাত গণতন্ত্রকে একই সঙ্গে বিধ্বস্ত করতে।

৫

ভাষা-কমিশন গঠিত হয়েছিল একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে : ভারতের সরকারী ভাষা কী হ'তে পারে সে-বিষয়ে ভারত-সরকারকে পরামর্শ দেবেন তাঁরা। কিন্তু এই কমিশন কার্যত তাঁদের অধিকার লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছেন ; সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়েও আলোচনায় তাঁরা কার্পণ্য করেননি। এবং যেহেতু শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সাধারণত সাহিত্যের পাঠক ও লেখক হ'য়ে থাকেন, আমাদের প্রসঙ্গের পক্ষে এই অংশই প্রয়োজনীয়। শিক্ষার বাহন পরভাষা হওয়া অনুচিত এই সূত্র অবলম্বন ক'রে কমিশনের অধিকাংশ সভ্য ইংরেজির বিরুদ্ধে প্রভূত বাক্যব্যয় করেছেন এবং শিক্ষার বাহন হিশেবে ইংরেজির অপসারণ বিষয়ে আমরা তাঁদের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে একমত। এর পরের প্রশ্ন : শিক্ষার বাহন কী

হবে—এর আংশিক মীমাংসা ইতিপূর্বেই হ'য়ে গেছে ; ভারতের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই আজ শিক্ষার বাহন সেই-সেই রাজ্যের মাতৃভাষা ; ইংরেজি এখনো বাহনরূপে স্বীকৃত আছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়িক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায়, তাও সর্বত্র ও সর্বতোভাবে নয়। এখানে মাতৃভাষার দাবি এতই অপ্রতিরোধ্য যে কমিশনের সদস্যেরাও তা ঠেলতে পারেননি, অন্তত মৌখিকভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন ; এবং প্রসঙ্গত ভারতীয় মাতৃভাষাসমূহের (তাঁদের মতে 'আঞ্চলিক' ভাষা) উদ্দেশে যে-সব সহৃদয় মন্তব্য করেছেন, তাঁদের মূল বক্তব্য মনে রাখলে সেগুলোকে মনে হয় কুম্ভীরের অশ্রুপাতের মতোই করুণাশীল। শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই মর্মে স্বীকারোক্তির পর তাঁরা বলছেন যে নিখিলভারতের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চোদ্দ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত হিন্দি ভাষা শেখানোই চাই। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাহন কী হবে সে-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ তাঁরা দিচ্ছেন না কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মাতৃভাষা, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হিন্দি, এমনকি কোন-কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি থাকতে পারে, এই তাঁদের পরামর্শ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ-বিষয়ে তাঁদের নিজ-নিজ বুদ্ধি-অনুসারে মনস্থির করুন, এতেও তাঁদের মৌখিক আপত্তি নেই। কথাটা শুনতে মন্দ না, কিন্তু এর পরেই তাঁদের আসল অভিপ্রায় অব্যর্থভাবে ব্যক্ত করে আমাদের, যখন তাঁরা বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়িক স্বারাজ্যই শেষ কথা নয়, রাষ্ট্রভাষা-প্রয়োগের নীতিকে শেষ পর্যন্ত সবার উপরে স্থান দিতে হবেই ('…the principle of "autonomy of Universities" can, in the final analysis, have only a qualified bearing and the national language policy must ultimately prevail')। এ-কথার অর্থ কী, তা বুঝতে একটুও দেরি হয় না। যদি কমিশনের অনুমোদন-সমূহকে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ব'লে ধ'রে নেয়া যায়, যদি ভারত সরকারের ভাষা-সংক্রান্ত নীতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন না ঘটে, তাহ'লে সরকারী তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হিন্দি বিষয়ে কী-রকম পরামর্শ, নির্দেশ, প্রলোভন বা তর্জনবাক্য পৌঁছতে থাকবে, তা ধারণা করতে হ'লে দৈবজ্ঞ হবার প্রয়োজন করে না। এবং যে-ভাষা হবে লোকসভার, আইনপ্রণয়নের, সুপ্রীম কোর্টের ও সর্বভারতীয় সরকারি পরীক্ষাসমূহের অন্যতম বাহন, যে-ভাষায় হাইকোর্টের বিচারপতিরা রায় দিতে বাধ্য থাকবেন, যে-ভাষা প্রাদেশিক সরকারের পরীক্ষা-

গুলিতে ব্যবহৃত হ'তে পারবে, এবং যে-ভাষায় নিম্নতর আদালতেও ওকালতি করার বাধা থাকবে না - সেই ভাষাকে অহিন্দিভাষী সর্বভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির কণ্ঠনালীতে প্রেরণ করা খুব বেশি কঠিন হবে না, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সহ্য না হোক, গিলতেই হবে; মরতে হ'লেও গিলতে হবে। যদি তার ফলে কালক্রমে ভারতের অহিন্দিভাষী বিশালতর অংশে, শিক্ষা, স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে, তাহ'লেও 'রাষ্ট্রভাষা'কে সবার উপরে স্থান দিতে হবে—'the national language policy must prevail'। ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের যেগুলি বিশেষ অনুমোদন—বিদ্যালয়ে হিন্দি শিক্ষার আবশ্যিকতা যার অন্যতম—তার সার অর্থ এই যে হিন্দি-না-জানা ভারতীয় প্রজা আর ভারতীয় প্রজা বা নাগরিক ব'লেই গণ্য হ'তে পারবে না। উচ্চশিক্ষার বাহন হিশেবে মাতৃভাষা ও ইংরেজির সম্ভাবনা স্বীকার ক'রে নিয়েও সদস্যেরা বহু যুক্তিসহকারে বুঝিয়েছেন যে সর্বভারতে উচ্চশিক্ষার অনন্য বাহন যদি হিন্দি হয়, তাহ'লেই ভারতীয় ঐক্য বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি—অতএব সেই পন্থাই সবচেয়ে প্রশস্ত। প্রসঙ্গত আর-একটি কথা তাঁরা বলেছেন, যা প'ড়ে তাঁদের ভয়াবহ অভিসন্ধি বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। ভারতের সব 'আঞ্চলিক' ভাষা থেকে শব্দ-সংকলন ক'রে হিন্দিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা হোক, তাহ'লে হিন্দিও সর্বপ্রকার কাজের পক্ষে উপযোগী হ'য়ে উঠবে, এবং কালক্রমে ভারতের সবগুলি আঞ্চলিক ভাষা পরস্পরে মিশ্রিত হ'য়ে একটিমাত্র হিন্দিতে পরিণত হ'তে পারবে—যে ভাষা হবে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌম বা ন্যাশনাল, এবং ভারতীয় ঐক্যের স্থায়ী ভিত্তি। অর্থাৎ, এই অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছা, ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলি অশিক্ষিতের উপভাষায় পরিণত হোক, হ'য়ে যাক কালক্রমে অচলিত ও লুপ্তপ্রায়, ত্রয়োদশ-ভুজধারী হ'য়ে বিরাজ করুক একমাত্র হিন্দি। এবং তাঁদের সব অনুমোদনের পিছনে, প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে, এই উদ্দেশ্যই কাজ করছে। বলা বাহুল্য, এই দেশপ্রেমী পরিকল্পনার মধ্যে সংস্কৃতের স্থান হ'তে পারে না, কেননা শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দির এক বিরাট প্রতিযোগী হবে সংস্কৃত। বাংলা অসমিয়া উড়িয়া আর থাকবে না, থাকবে না গুজরাটি বা মরাঠি, পাঞ্জাবি আর উর্দু তো ইতিমধ্যেই হিন্দির মধ্যে গৃহীত হয়েছে, তামিল তেলুগু কানাড়া মলয়ালি আবদ্ধ হবে ঠাকুমা-দিদিমার প্রবচনে—এমনকি সংস্কৃতের

শেষ স্নান হবে জাদুঘরের শ্মশানভূমিতে। এক পক্ষের এই আত্মত্যাগ ও অন্য পক্ষের এই পরস্বাপহরণের হেতু কী? না, ভারতীয় ঐক্য রক্ষা করা চাই। ঐক্যের নামে এই রকম ভাষামেধ-যজ্ঞের ষড়যন্ত্র অন্য-কোনো জাতির ভাগ্যে ইতিপূর্বে ঘটেছে কিনা জানি না।

আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি না; সদস্যগণের সুখস্বপ্নকে বাস্তবের ভাষায় অনুবাদ করছি। যদি তাঁদের অনুমোদনগুলি কার্যে পরিণত হয়, আর তার পরে এক শতক বা অর্ধ শতক ধ'রেও ভাষাবিষয়ে একই ব্যবস্থা টিঁকে থাকে, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষার, এবং সেই সব ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্রমিক অবক্ষয় অনিবার্য। এক শতক বা অর্ধশতক জাতির জীবনে অত্যল্পকাল এ-কথা এখন আর সত্য নেই আধুনিক সংঘপ্রকরণ ও যন্ত্রবিদ্যা তথাকথিত প্রগতির বেগ অত্যন্ত দ্রুত ক'রে দিয়েছে। আমরা যেন না ভুলি যে আজকের দিনের রাষ্ট্রের শক্তি অপরিমেয়: অতীতের কোনো অধ্যায়ে, ইতিহাসের নৃশংসতম অত্যাচারী সম্রাটের যুগেও রাষ্ট্র এমন পরাক্রান্ত ছিলো না। ছিলো না, তার কারণ এমন কোনো যন্ত্র বা ব্যবস্থা তখন আবিষ্কৃত হয়নি, যার দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, দিনের পর দিন, কর্মের ও বিশ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে সমগ্র প্রজাবৃন্দের মনের উপর রাষ্ট্র তার অভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উপরন্তু, গণতান্ত্রিক দেশ হ'য়েও ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রে একনায়কত্বের কোনো-কোনো লক্ষণ অঙ্গীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রসমূহের তুলনায় এখানে স্বাধীন উদ্যমের ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ। আমাদের বাণিজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের অনুগামী। আমাদের শিক্ষাতন্ত্র সম্পূর্ণ আত্মবশ নয়, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনীর বদান্যতায় পুষ্ট হ'তে পারে না, তাদের জীবিকার প্রধান বা অনন্য নির্ভর রাজকোষ। আমাদের রেডিওতে ইংলণ্ডের মতো স্বায়ত্তশাসিতা বা মার্কিনদেশের মতো স্বাধীনতা নেই: তা একান্তভাবে রাষ্ট্র-কর্তৃক অধিকৃত। আমাদের সংবাদপত্রগুলির আইনত যতদূর পর্যন্ত স্বাধীনতা আছে তা সত্য, কিন্তু সে-স্বাধীনতা তাঁরা যে সব সময় ব্যবহার করতে চান বা করতে পারেন এমন প্রমাণ আমরা এখনো পাইনি: কোন নেপথ্যসংকেতে তাঁদের কোনো মূলনীতি বা কর্মসূচির রাতারাতি বদল হ'তে আমরা দেখিনি তা নয়। আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব চলে না, সেখানেও পরোক্ষভাবে প্রভাব-বিস্তারে আমাদের রাষ্ট্র ক্রমশই অধিকতর সচেষ্ট হচ্ছেন। সাহিত্য নাট্য ও

ললিতকলার আকাদমি এর উদাহরণ, গ্রন্থ ও চিত্রের জন্য পুরস্কারঘোষণা এর উদাহরণ, রেডিও কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য-সমারোহ' এর উদাহরণ, আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়িক যুব-উৎসবও এর উদাহরণ। সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিপোষণের জন্য আমাদের রাষ্ট্র যে অকস্মাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রজার অর্থ ব্যয় ক'রে বড়ো-বড়ো কার্য্যালয় স্থাপন করেছেন, এই ব্যাপারটাকে, একজন সাহিত্যিক হিশেবে, আমি সুলক্ষণ ব'লে মনে করতে পারি না : আমার মতে আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পীদের বিষয়ে উদারতম আচরণ হ'লো উপেক্ষা, একটি পরিচ্ছন্ন ও নিরভিমান উপেক্ষা। সেকালে রাজাদের পোষকতায় সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হ'তে পেরেছিলো, এই নজির এখানে একেবারেই অচল ; কেননা সেকালে রাজা ছিলেন একজনমাত্র ব্যক্তি ; তাঁর শক্তি ছিলো, আধুনিক মানে, অতিশয় সংকীর্ণ, এবং কখনো-কখনো তিনি সজ্জনও হতেন। তার উপর, বিক্রমাদিত্য থেকে ফ্রেডেরিক দি গ্রেট পর্যন্ত, কবিদের পোষণ ক'রে তাঁরা ব্যক্তিগত অহমিকারই তৃপ্তিসাধন করেছেন, অন্তরালে কোনো রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য তাঁদের ছিলো না। ফলত, কবিরা তাঁদের মৌখিক চাটুকারিতা করলেও—ভলতেয়ার ফ্রেডেরিককে তাও করেননি—স্বকর্মে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ক'রে চলতে পারতেন। কিন্তু একালের নৈর্ব্যক্তিক, যান্ত্রিক অতিকায় ও সার্বিক-শক্তিশালী রাষ্ট্র যখন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষণের ভার নেয়, তার অর্থ দাঁড়ায় সেই স্বাধীনতার সংকোচন বা বিলুপ্তি, যে স্বাধীনতা, শুধু শিল্পীর নয়, দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। শিল্পীর জীবিকার জন্য সুখদায়ক ব্যবস্থা ক'রে রাষ্ট্র তার জন্য যে মূল্য আদায় ক'রে নেয় সেই মূল্যই পরম ও একমাত্র ; তা ধ্বংস হ'লে শিল্পীর পক্ষে আরাম, সম্মান বা নিরাপত্তার কোনো অর্থ আর থাকে না, সমাজ হ'য়ে ওঠে কারাগারের মতোই, সুশৃঙ্খল, নিয়মাধীন ও দুঃসহ। স্বাধীনতাই এই মূল্য, চিন্তার স্বাধীনতা, 'মানবো না' বলার স্বাধীনতা, দল ছেড়ে একলা হবার স্বাধীনতা। এরই ফলে যুগে যুগে সমাজের নাড়ি নতুন ছন্দে সাড়া দেয়, সভ্যতার স্রোত ব'য়ে চলতে পারে। এই মূল্য যেখানে দলিত, সেখানে শিল্পীকে খাইয়ে পরিয়ে মোটা করে তুলে তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়, সেখানে শিল্পের নামে কী-ধরনের প্রভূরঞ্জন জড়বস্তু নির্গত হ'তে থাকে, তার উদাহরণ আজ বহুদিন ধ'রে সোভিয়েট দেশ পৃথিবীর সামনে উপস্থিত রাখছে।

সমাজের মধ্যে যে-অংশ স্বভাবত সজাগ ও স্বনিষ্ঠ, সেই শিল্পীদেরও ক্রীড়নকে পরিণত করার শক্তি যখন আধুনিক রাষ্ট্র ধারণ করে, তখন তার পক্ষে এক দেশের বারোটি বা তেরোটি ভাষার বিলোপ ঘটিয়ে মাত্র একটিকে স্ফীত ক'রে তোলাও সম্ভবপরতার পরপারে নয়। এই কথাটি খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে হবে আমাদের : আজ ভাষা-কমিশন কাগজে-কলমে যে-সুখস্বপ্ন দেখছেন, আগামী পঞ্চাশ বছর, এমনকি পঁচিশ বছরের মধ্যেও তাকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রের, সত্যি-সত্যিই 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রচণ্ড দাবিতে অন্য প্রত্যেকটি ভাষার অস্তিত্ব শুদ্ধ বিপন্ন হ'তে পারে, যদি না এখনই, এইমুহূর্তে আমাদের ভস্মাচ্ছাদিত শুভবুদ্ধি জ্বালাতে পারে একটি প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ, দাঁড় করাতে পারে একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিরোধ। 'কেন্দ্রিক ভাষা হিন্দি হয় তো হোক না, রাজ্যের মধ্যে মাতৃভাষা তো রইলোই', 'সরকারি কাজে ক-জন লোক আর যোগ দেবে, আর সেই ক-জনকে হিন্দি শিখতে হ'লে ক্ষতি কী', 'আমরা বাঙালিরা হিন্দির চাপে বাংলার চর্চা ভুলে যাবো? পাগল!'—এই ধরনের চিন্তা বা চিন্তাহীনতার মূলে কত বড়ো আত্মপ্রতারণা বিরাজ করছে, একটুখানি বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়ে। যদি—কমিশনের দুটি মাত্র অনুমোদন বেছে নেয়া যায়—যদি ভারতের সরকারি সিংহাসনে হিন্দিকে অনন্তভাবে বসানো হয়, আর প্রত্যেক ভারতীয় প্রজাকে বাধ্য করা হয় শৈশব থেকে বা শৈশবকালে হিন্দি শিখতে, তাহ'লে অন্যান্য ভাষা প্রথমে যদি বা চামরধারিণী বা করঙ্ক-বাহিকার মর্যাদা পায়, শেষ পর্যন্ত তাদের স'রে যেতে হবে নেপথ্যে, ভারতীয় পটভূমি ছেড়ে অপরিচয়ের ধূসরতায়। ভারতবাসী তাদের ভাষা বলতে হিন্দিকেই বুঝবে, সারা জগৎ ভারতীয় ভাষা বলতে শুধু হিন্দিকেই বুঝবে। আর তা ঘটতে খুব বেশি দেরিও হবে না, কেননা ইতিমধ্যেই—স্বাধীনতার পর মাত্র এই দশ বছরের প্রচারের ফলে—সোভিয়েট রাশিয়া হিন্দিকেই মেনে নিয়েছে ভারত-ভাষার নামান্তর ব'লে, চীনও তা-ই : পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে হিন্দির চর্চা বর্তমান, এবং আমরা নিজেরা—এমনকি বাঙালিরাও—মাতৃভাষাকে 'আঞ্চলিক' ও হিন্দিকে 'জাতীয়' ভাষারূপে অক্লেশে উল্লেখ ক'রে থাকি। হিন্দি ভারতের একমাত্র সরকারি ভাষা—শুধু এই সূত্রটি গৃহীত হ'লে অন্য সব স্বতই ঘটতে থাকবে ; আইনত আবশ্যিক না হ'লেও ছাত্রগণ নিজের গরজেই হিন্দি শিখবেন, যাঁরা রাজনৈতিক বা রাজপুরুষ, বাণিজ্য বা জ্ঞানজীবী হবার

উচ্চাশা রাখেন শুধু তাঁরাই নন, কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকার উপরে অল্প একটু আকাঙ্ক্ষা করলেও হিন্দি ভিন্ন এগোনো যাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সরকারি কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দেবেন, এমন লোকের সংখ্যা অচিরেই নগণ্য ছেড়ে অগণ্যে পৌঁছবে; পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের পারম্পর্যের ফলে রাষ্ট্রের কুটিল শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়বে লৌকিক জীবনের স্তরে-স্তরে, জীবিকার এমন ক্ষেত্র কমই থাকবে যাতে সরকারি প্রভাব কোনো-না-কোনো ভাবে প্রবিষ্ট হবে না। আর এ-কথাও ভুলে থাকা অসম্ভব —কেননা এখনই তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—যে একবার 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা'রূপে প্রতিষ্ঠা পেলে হিন্দি হ'য়ে উঠবে কৌলীন্যের ধ্বজা, ফ্যাশানের আশ্রয়, স্বরাজির একটি প্রধান সরঞ্জাম; শুধু চাকরিতে উন্নতির জন্য নয়, জাতে উঠতে হ'লেও প্রয়োজন হবে তার এমন সুখীজন যাঁরা অবশিষ্ট থাকবেন যাঁদের দায়ে প'ড়ে শিখতে হবে না, তাঁরাও অনেকে গায়ে প'ড়ে হিন্দি শিখবেন। এবং যাঁরা রাষ্ট্রপোষিত কৌলীন্যের বাইরে নিজ-নিজ বিনীত কর্ম নিয়ে জীবন কাটাবেন, সেই বিরাট জনসাধারণের মনেও হিন্দির একটি বিশেষ স্থান অবধারিত হবে: জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীতের মতো 'জাতীয় ভাষা'ও হ'য়ে উঠবে একটি প্রতীক, চিন্তাহীন ভক্তি ও আত্মনিবেদনের অধিকারী, গ্রামের চাষি, ঘরের বৌ, মফঃস্বলের ছোটো দোকানদার—এমন কেউ থাকবেন না যিনি এক বর্ণ হিন্দি না-জেনেও, বা হিন্দির দ্বারা কোনো সুবিধা না-পেয়েও, ঐ ভাষাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা না করবেন। সব ভাষাকেই শ্রদ্ধা করা ভালো; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার সঙ্গে থাকবে নিজ-নিজ মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা, এবং সেই অবস্থাটা মারাত্মক। এই যে মনস্তত্ত্বগত প্রভাব, এর শক্তি হিশেব ক'রে বোঝা যায় না: আইনের দ্বারা হিন্দির অধিকার যতই বেঁধে দেয়া হোক, সংবিধানে অন্যান্য ভাষাকে যে-কোনো ভাবেই স্বীকার করা হোক না—'হিন্দি ভারতের জাতীয় বা রাষ্ট্রভাষা' শুধু এই সূত্রটি সর্বসাধারণের মনে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করবে। এরও প্রমাণ ইতিমধ্যে আমরা পাচ্ছি না তা নয়; পশ্চিম বাংলার বহু বেসরকারি বিদ্যালয়ে হিন্দি এখনই আবশ্যিকভাবে পড়ানো হচ্ছে, যদিও সে বিষয়ে সরকারের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষের যুক্তি বোধহয় এই: 'কিছুদিন পরে তো শিখতেই হবে, এখনই আরম্ভ করা ভালো।' আজ যেটা প্রস্তাব, সেটা যদি দুদিন পরে তথ্য হয়ে ওঠে তা'হলে

এই যুক্তি আরো কত বিরাট আকারে সর্বভারতে ব্যাপ্ত হবে, সে কথাও কি বুঝিয়ে বলা দরকার? সর্বসাধারণ কোনো কথাই তলিয়ে ভেবে থাকে না—সেটা আশা করাও সম্ভব নয়—'জাতীয় ভাষা'র প্রতীকী মূল্যের জন্যই তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তারা। তাছাড়া উন্নতি জিনিষটা সকলেরই কাম্য, ব্যক্তিগত ও বংশগতভাবে এক ধাপ উপরে উঠতে না চায় এমন লোক সর্বত্রই বিরল; এবং হিন্দি না জানলে উন্নতি যদি অসম্ভব হয় তাহ'লে, কাগজে কলমে তার 'চাপ' যতই মৃদু হোক না, অহিন্দিভাষী ভারতীয় প্রজা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করতে ইচ্ছুক অথবা বাধ্য হবে।

এখানে ইংরেজির কথা আর একবার বিবেচ্য: কেন, যদি ইংরেজ আমলে ইংরেজির প্রভাবে মাতৃভাষাকে আমরা উপেক্ষা না ক'রে থাকি, হিন্দির জন্যেই বা মাতৃভাষাকে ভুলতে হবে? এর উত্তরে বহু কথা বলা যেতে পারে, আমি শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। আজকের দিনে হিন্দি যেমন সর্বভারতে সর্বসাধারণের সমগ্র জীবনকে অধিকার করতে চাচ্ছে, এই রকম বিরাট দাবি ইংরেজি ভাষার কখনোই ছিলো না, তা সম্ভবও ছিলো না তার পক্ষে। ইংরেজ রাজত্ব ছিলো বৈদেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ক্ষীণ ছিলো তার সংযোগ; কলকাতা দিল্লীর ঘটনাবলি বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন থেকে কোটি কোটি গ্রামীন মানুষ বংশ পরম্পরায় তাদের অভ্যস্ত জীবন যাপন ক'রে গেছে। কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্রের প্রভাব সর্বত্র পরিকীর্ণ, এবং সেই প্রভাব থেকে সর্বসাধারণের হৃদয়াবেগও মুক্ত নয়, কেননা তার পিছনে আছে স্বাধীনতা লাভের গৌরব, স্বজাত্যবোধের অভিমান। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের প্রভাব যত ব্যাপক, 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রভাবও ঠিক তা-ই হবে। ইংরেজির যা ছিলো না—আর এখন নেই—হিন্দির আছে সেই স্বদেশীয়তার স্বাক্ষর; সেটা তার মস্ত সুবিধে, আর সেই জন্যই সে এত বেশি বিপজ্জনক। হিন্দিকে আত্মনিবেদনের চরম অর্ঘ যে মাতৃভাষার প্রতি চরম প্রতারণা—এই কথাটা অধিকাংশের মনে ধরা দেবে না, এবং অধিকাংশকে বোঝানো কঠিন হবে। প্রশংসনীয় দেশপ্রেমের প্ররোচনায় হিন্দিকে গ্রহণ করবো আমরা, নিজে না-জেনে ও না-বুঝে ক্রমশঃ মাতৃভাষাকে ভুলতে থাকবো। ভুলতে থাকবো তার কারণ এই মনোভাব তৈরি হ'তে দেরি হবে না (এখনই কিছুটা তৈরি হয়েছে) যে হিন্দি যেহেতু ভারতীয় ভাষা, এবং আমরা সকলেই ভারতীয়, তাই হিন্দিকে

আমাদেরই স্বভাষা বললে ভুল হয় না। অন্য দিক থেকেও মাতৃভাষার বিনাশের আশঙ্কা ভয়াবহরূপে বাস্তব, বিশেষত উত্তরভারতের পক্ষে। শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে বাংলা আর হিন্দি খুব কাছাকাছি ভাষা ব'লেই, বাঙালি শিশুকে হিন্দি শেখানো হ'লে সে বাংলা নামে যে ভাষাটি শিখবে সেটি আর ঠিক বাংলা থাকবে না। এই দুই ভাষায় বহু সামান্য শব্দ আছে, কিন্তু তাদের বানানে ও উচ্চারণে মিল নেই একই সঙ্গে 'দশ' আর 'দস', 'কাহিনী' আর 'কহানী' শেখানো হ'তে থাকলে শিশুর শুদ্ধাশুদ্ধ-জ্ঞান বিপর্যস্ত হবে। ফলত সে খুব সম্ভব বাংলা বা হিন্দি কোনটাই ঠিকমতো শিখবে না, দুয়ের মিশ্রণে তৈরি ক'রে নেবে এক হিন্দি ঘেঁষা বাংলা অথবা বাংলা-ঘেঁষা হিন্দি। এবং এই দুর্বিপাকের সম্মুখীন হবে উত্তর ভারতের প্রত্যেকটি ভাষা, দক্ষিণী ভাষাগুলিও এই সংকট পুরোপুরি এড়াতে পারবে না। আর যেহেতু ভাষা-কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সর্বভারতের সকল প্রজাকে হিন্দি শিখতে হবেই, কিন্তু হিন্দিভাষীকে অন্য কোনো ভাষা না-শিখলেও চলবে, তাই এই চোদ্দমিশেলি নবব্যঞ্জনের প্রধান উপাদান হবে হিন্দি, অন্যান্য ভাষা হিন্দির গড়ন এড়াতে পারবে না, কিংবা অন্য সব ভাষা ক্রমশঃ ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে পুষ্ট ক'রে তুলবে একটিমাত্র ভারতীয় ভাষাকে যা ঠিক এখনকার হিন্দিও হয়তো আর থাকবে না, কিন্তু যাকে হিন্দি ব'লেই নির্ভুলভাবে চেনা যাবে—বাংলা অথবা মারাঠি অথবা তেলুগু ব'লে কখনোই ভুল হবে না। অর্থাৎ, ভাষা-কমিশনের উদ্ভট উচ্চাশা পূর্ণ হবে তখন, হিন্দির মধ্যে অন্য সব ভারতীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটবে।

স্বাভাবিক 'জাতীয়' ভাষা তাকেই বলে, যে-ভাষা একটি দেশের সমগ্র বা বহুলভাবে অধিকাংশ প্রজাবৃন্দের মাতৃভাষা। এই অর্থে ভারতবাসীর কোনো সামান্য বা 'জাতীয়' ভাষা অতীতের কোনো অধ্যায়েই ছিলো না। তা নিয়ে কোনো আক্ষেপও ছিলো না কারো মনে, কেননা কোনো পরযুগে নেশন অর্থে জাতি ছিলুম না আমরা। 'নেশন' শব্দের কোনো প্রতিশব্দও নেই ভারতীয় ভাষায়, ন্যাশনাল অর্থে 'জাতীয়' কথাটা এখন পর্যন্ত কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক শোনায়। অন্য অনেক কিছুর মতো, নেশনত্বের ধারণাও আমরা পশ্চিম থেকে আহরণ করেছিলাম, এবং আজকের দিনে, স্বাধীনতার পরে, বৈধিক ন্যাশনালিজম-এর বেলায়, আমরা কিছুটা করুণভাবে বদ্ধপরিকর

হয়েছি পুরোপুরি ও পাকাপাকি একটি নেশন হ'য়ে উঠতে। যেহেতু ভারত-বাসীরা এক জাতি বা নেশন, সেহেতু ভারতে একটি 'ন্যাশনাল' ভাষাও চাই এই যুক্তির যান্ত্রিক উপযোগে অনেকেই সম্মোহিত হ'য়ে আছেন। তাঁরা, পুরোপুরি হিন্দিকে সমর্থন না-ক'রেও, প্রায়ই ব'লে থাকেন, 'অতীতে ছিলো না ব'লে ভবিষ্যতেও কি একটি সামান্য ভাষা হ'তে পারবে না আমাদের? তা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?'—কিন্তু কোনো কিছুকে বাঞ্ছনীয় ব'লে স্বীকার করতে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই আমাদের কর্তব্য, এবং সামান্য বা 'জাতীয়' ভাষাকে বাঞ্ছনীয় বলার অর্থই হ'লো হিন্দির একাধিপত্যে সানন্দ সম্মতিদান। আসল প্রশ্নটা এই: কোনটা বেশি বাঞ্ছনীয়—একটি 'জাতীয়' ভাষাকে নির্মাণ ক'রে নেয়া, না কি আমাদের নিজ-নিজ মাতৃভাষার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ? কোনটা আমাদের মনুষ্যত্বের পক্ষে বেশি জরুরি—নিজ-নিজ মাতৃভাষার সমৃদ্ধি, না কি এমন একটি ভাষা যা এই মহাদেশতুল্য ভারতভূমিতে সকলেরই ব্যবহার্য হবে? সংলগ্ন আর-একটি প্রশ্নও উত্থাপন করতে হয়: ভারতীয় চিত্তের পুষ্টি ও প্রকাশের পক্ষে কোনটা বেশি অনুকূল: বৈচিত্র্য না একীকরণ, স্বরসংগতি না ঐকতান? এবং এ'দুয়ের মধ্যে যেটি কাম্যতর, অন্যটি যদি স্পষ্টত তার বিরোধী হয়, তাহ'লে আমাদের কর্তব্য কী?

খুব সম্ভব আগামী পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই একটি 'জাতীয়' ভাষার অধিকারী হ'তে পারি আমরা, যদি ভাষা-কমিশনের মূল প্রস্তাবগুলিতে সম্মত হই। সেই প্রস্তাবগুলি—শুধু মেনে নিলে নয়, প্রয়োগের জন্য একযোগে সচেষ্ট হ'লে, তবেই তা সম্ভব হ'তে পারে। নচেৎ কোনোমতেই নয়। যদি 'জাতীয়' ভাষাই কাম্যতর মনে হয়, তাহ'লে মাতৃভাষার প্রতি ওষ্ঠপ্রীতি পরিহার ক'রে হিন্দিকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে আমাদের। মাতৃভাষার বিকাশ ও 'জাতীয়' ভাষার উত্থান—এ দুই ভারতভূমিতে যুগপৎ সম্ভবপর, কেউ যেন এমন মোহকে ভ্রমক্রমেও প্রশ্রয় না দেন। ভারতবর্ষে একটি 'জাতীয়' ভাষা বা সামান্য ভাষা তৈরি হ'য়ে উঠতে পারে শুধু এই শর্তে যে অন্য প্রত্যেকটি ভাষার গতিপথ রুদ্ধ ক'রে দেয়া হবে, এবং সেই অবরোধে সহায়তা করবেন তারাই, যাঁদের বলা যেতে পারে সেই-সেই ভাষারই সন্তান। সে-দুর্দিন যদি কখনো আসে, যদি জাতীয়তাবাদের ক্ষুটন্ত কটাহে ভারতবাসীরা তাঁদের প্রাণরস পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হন, তাহ'লে দুটির মধ্যে একটি সম্ভাবনাকে নিশ্চিত ব'লে

ধ'রে নেয়া যায়। এক হ'তে পারে—বাঙালি, মরাঠি, তামিল প্রভৃতি অভিজ্ঞান ভুলে গিয়ে আমরা সকলেই 'ভারতীয়' নামক এক অর্ধ-কাল্পনিক ধারণার মধ্যে নিবিষ্ট হবো, আমরা যে মূলত মানুষ, সেই মহাসত্যকে অস্বীকার ক'রে হ'য়ে উঠবো শুধুমাত্র প্রজা, একটি প্রয়োজনীয় জীব—কিংবা জীব পর্যন্ত নয়, বৃহদাকার রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি আণুবীক্ষণিক অংশ মাত্র। কিংবা, যেহেতু তামিল, মারাঠি, বাঙালি প্রভৃতি অভিজ্ঞান এক-একটি সপ্রাণ পদার্থ, যার পিছনে আছে বহুযুগের বিশেষ-বিশেষ সাধনার ধারা, সেইজন্য এমন সম্ভাবনাও প্রবল যে কিছুদিন পরে, আপন-আপন ভাষা ও সংস্কৃতির অবমাননা ও অবক্ষয় লক্ষ্য ক'রে, অহিন্দিভাষী সমগ্র ভারতে বিচ্ছেদপ্রবণ বিদ্রোহ জেগে উঠবে। দুয়ের মধ্যে প্রথমটি মনুষ্যত্বের প্রতিকূল, দ্বিতীয়টি আমাদের রাষ্ট্রিক ঐক্যের পক্ষে মারাত্মক। প্রথমটির অর্থ ভারতবর্ষের আবহমান ইতিহাসের প্রত্যাখ্যান, দ্বিতীয়টির অর্থ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন ক'রে তোলা। যে-বৈচিত্র্য বিন্যাসে ভারতবর্ষীয় প্রতিভার মৌলিক বৈশিষ্ট্যতারই মূলোচ্ছেদ হবে প্রথমটিতে, আর দ্বিতীয়টি ঘটলে আমাদের স্বাধীনতাই রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ। এ'দুয়ের মধ্যে কোনোটাকেই কাম্য বলা যায় না। অতএব এই সমস্যার সমাধানে আপোশ অথবা বিলম্বের অনুমোদন করলে কিছুই লাভ হবে না। সবচেয়ে ভালো এখনই এমন কোনো ব্যবস্থা করা, যাতে আমরা নিজেদের বাঙালি ব'লে অনুভব করতে পারি, ভারতীয় ব'লে জানতে পারি, আর সর্বোপরি ভুলে না যাই যে আমরা মানুষ এবং ব্যক্তি, রাষ্ট্রের কলে তৈরি মানুষ নয়।

('কবিতা'র সৌজন্যে)

প্রাগাধুনিক ভারত সংস্কৃতিতে বাংলার ভূমিকা

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

কবি হলেন বিশ্বের নাগরিক।

অন্ততঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একাধিক সাধকের কথা স্মরণ ক'রে একথা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না, যে তাঁরা বিশ্বপৃথিবীর সব ঠাঁই নিজের ঘর খুঁজে না পেলেও ভারতের অনেক অঞ্চলেই নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। বাংলার মধু-বঙ্কিম-রবি-শরৎ বাংলা সাহিত্যে যতখানি স্বীকৃতি লাভ ক'রেছেন ভারতের অন্যান্য সাহিত্যে অনুবাদে অনুসরণে তার চেয়ে কম স্বীকৃতি লাভ করেন নি। তার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। আধুনিক যুগে নৌসাধনোদ্যত ইংরাজের প্রসাদপুষ্ট হ'য়েছিল ভারতবর্ষের তিনটি বন্দর সহর—ক'লকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ। তাই ক'লকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য উত্তরভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে পশ্চিমী প্রসাদ লাভে অগ্রণী এবং অগ্রগণ্য হয়েছে। কিন্তু প্রাগাধুনিক সাহিত্য কি ক'রে প্রদেশের পরিমিতত্বের বন্ধন থেকে কবিকে উদ্ধার ক'রে তাঁকে ভারতের নাগরিক ক'রে তুলল? আধুনিক বাংলা সাহিত্য রাজনৈতিক কারণে ইংরাজ-রাজ-সংস্কৃতির পীঠস্থান ক'লকাতা থেকে বিকশিত হ'য়েছিল। তাই অন্য প্রদেশের সাধকেরা বাংলাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের সাহিত্যসাধনা সুরু করেছিলেন, কিন্তু প্রাগাধুনিক বাংলা কোনও কারণেই সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ছিল না···তবে কি ক'রে বাংলার সাহিত্য বাংলার বাইরে আপনাকে প্রসারিত করল? এর কারণ রাজনৈতিক নয়, ধর্মনৈতিক।

প্রাদেশিকতা নামক ব্যাধিটি আধুনিক কালের। যেদিন প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিকতার পাঁচীল ওঠেনি, সেদিন দেশ দেশান্তরের মানুষ বাঁধা পড়েছে ধর্মের বাঁধনে, দেশদেশান্তরের ভাষাও ধরা দিয়েছে মিশ্রসুরের বাঁধনে। হাজার বছর পূর্বে বৌদ্ধগান ও দোহা রচনায় বাঙ্গালী প্রাচীনতম বাংলা ভাষার সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশে (বা 'হিন্দী'র প্রাক্তনী ভাষায়) কবিতা রচনায় দ্বিধাবোধ করেনি। সেই বাঙ্গালীই বাংলার সঙ্গে 'ব্রজবুলি'তে পদ

রচনা করেছে পাঁচশ বছর ধরে—শ্রীচৈতন্যের যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল অবধি। হিন্দীর সাথে হাত মিলিয়েছে কোথাও শব্দের প্রয়োজনে (বৈষ্ণব পদাবলী হতে ভারতচন্দ্র) কোথাও ভাবের প্রয়োজনে (যেমন আলাওলের 'পদ্মাবতী')। কিন্তু একথা যেমন বাংলার ক্ষেত্রেও সত্য, অন্য ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সত্য! প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাহীন বাঙ্গালী যেমন অন্য প্রদেশ হ'তে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছে অন্য প্রদেশও তেমনি বাংলার সঙ্গে সুরের বাঁধনে নিজেকে জড়িয়েছে।

বাংলার শাক্ত পদাবলী এবং মঙ্গলকাব্য ব্যতীত বাংলা সাহিত্য সর্ব্ব-ভারতীয়ত্ব লাভ ক'রেছে। নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, "নির্গুন" সাহিত্য (বাউল) কেবল বাংলার বলে চিহ্নিত ক'রলে ভুল হবে। এ সব সম্প্রদায়ে পূর্ব্বাঞ্চলের গুরু পশ্চিমের শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়েছে, পশ্চিমের গুরু পূর্ব্বাঞ্চলের শিষ্যকে আপন ক'রে নিয়েছে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অধ্যাপনা ক্ষেত্রে প্রদেশের সীমার বন্ধন দেখা দেয় নি। তাই বাংলার চর্য্যাপদের বাণী কবীরের কণ্ঠে বেমানান শোনায় না, মিথিলার বিদ্যাপতি বাংলার কবিগুরু; বাংলার নাথ সাহিত্যের প্রতিধ্বনি পাঞ্জাবী-হিন্দী-গুজরাটিতে। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যের দাক্ষিণ্য-ধন্য, আবার শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু দক্ষিণের গোপাল ভট্ট। মীরাবাঈ জীবগোস্বামী প্রভাবান্বিত। শ্রীচৈতন্য-শ্রীরূপের প্রভাব বল্লভাচার্য-বিট্ঠলনাথে সম্প্রসারিত। বাংলার ভাব সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে কত জনের প্রাণে। বাংলা ভাষা শোনা যায় নেপালী নাটকের মধ্যে, হিন্দী নাথ সাহিত্যে। হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতে চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের দানও অসাধারণ।

এমনি ক'রে বাংলা সাহিত্য নিখিল ভারতীয় সাহিত্যের অঙ্গ এবং অংশ হয়েছে। প্রথমেই ধরা যাক কবীরের কথা। তাঁর আবির্ভাব আমাদের অজ্ঞাত তবে প্রকট হয়েছিলেন কাশীতে। মসী কাগজ তিনি ছোঁননি, তবে বলেছেন 'ঘর তাঁর পুর্ব্বে', বা 'বোলী তাঁর পুর্ব্বে'। এ পুর্ব্ব শব্দের অর্থ কি আমরা জানি না, কিন্তু পুর্ব্বভারতের চর্য্যাপদের সঙ্গে তাঁর পদের আত্মিক যোগ আছে, যোগ আছে বিদ্যাপতির সঙ্গে, সাদৃশ্য আছে চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে। চর্য্যাপদের একটি পদে পাই :

"ভলই বিআলজল পবিআ বাহে
নিচা ঢুহিএ এ তিআ ণাহে।

নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝজ
চেণ্টন পাএর গীত বিরলে বুঝজ।"

[বলদ বিয়োল, গাই বাঁঝা। এ তিন সন্ধ্যা বেলায় 'পিটা' বা কেঁড়ে ভর্ত্তি দুধ। নিতি শিয়াল সিংহের সমান জুঝছে। চেণ্টন পাদের গীত বিরলেই বোঝে।]

কবীরেও[১] পাই—

বৈল বিয়াই গাই ভই বাঝ।
সহরা দুহৈ তীন্যু সাঁঝ॥
নিত উঠি স্যাল সংঘ সু জুঝৈ।
কহৈ কবীর কোঈ বিরলা বুঝৈ॥

বিদ্যাপতির

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ সঙ্খমতি ছার রে……

অথবা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সকলি আমার।
কিত্তিঅঁ। পেলাইবোঁ পঞ্চ মুকুতার হার॥……

এবং কবীরের—

ক্যা চুরা পাইল চমকাবৈ।
কহা ভরা কিছুবা ঠমকাবৈ॥

একই সুরে বাঁধা।

কবীরের মধ্যে দেখি "রোদে পুড়ে ছায়া চাইলাম তরুর কাছে। তরুর মাঝে বেরোল আগুন। কোথায় অঙ্গ জ্বালা নিবারণের সম্ভাবনা? যদি বনে আগুন দেখা দেয় ত শীতল জল মনে ক'রে জলের দিকে ধাবিত হই। কিন্তু জলের মধ্যে যদি আগুন বেরোয় ত আর দ্বিতীয় (আশ্রয়স্থল কোথায় বা) কি রইল?"

ধূপ মাহতে ছাহ তকাঈ, মতি তরবর সচ পাউঁ।
তরবর মাঁহৈ অগনি বিকসৈ, তো ক্যা লেই বুঝাউঁ॥
জে সর জলৈ ত জল কূ ধাবৈ, মতি জল সীতল হোই।
জলহী মাহি অগনি জে বিকসৈ, উর ন দূজা কোই॥

কবীরের ঐ পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়:—

---

১ লেখকের 'কবীর ও পূর্ব্বভারতীয় সাধনা' নিবন্ধ দ্বাষ্টব্য। তুলনীয় আলোচনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দ্রষ্টব্য (ঐ, ৬৯-৭০ সংখ্যা, ১৩৮০)।

ছায়া দেখি বসি আছি তরু লতা বনে।
জ্বলিয়া উঠেছে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥

কবীরের ভাষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। তাকে বলা হয়ে থাকে 'খিঁচুড়ী' ভাষা। এই 'খিঁচুড়ী ভাষা'র মধ্যে হিন্দী 'কবীর গ্রন্থাবলী' গ্রন্থের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস বাংলা ভাষার একটি স্তরকে আবিষ্কার করেছেন। সেখানে বাংলার ✓আছ, ✓পার (হিঁ সকনা) ধাতুর ব্যবহারের কথা প্রসঙ্গে সম্পাদক কবীরের দূরদূর ভ্রমণ ও নানা দেশের শিষ্য-সাধকদের কথা স্মরণ করেছেন। কবীর সম্বন্ধীয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রবন্ধে লেখক এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে দেখান হয়েছে অতীতে 'ইল', ভবিষ্যতে 'ইব'-প্রভৃতিরও ব্যবহার কবীরে পাওয়া যায়।

শুধু কবীরের মধ্যেই বাংলার সাহিত্য ও ভাষার একটি সম্প্রসারিত রূপ লক্ষ্য করি তা নয়, বাংলার নাথ সাহিত্যও অন্য আঞ্চলিক নাথ সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মপথের সহযাত্রী। ডক্টর সুকুমার সেন এবং শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল নাথ সাহিত্যের উৎপত্তিস্থল বাংলা দেশ বলেই গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন নাথগুরু মছন্দর-গোরখনাথ কাহিনী, বা নাথশিষ্য গোপীচাঁদ-ময়নামতী কাহিনীতে হিন্দী নাথ সাহিত্য বাংলা নাথ সাহিত্যের নিকট ঋণী। আমরা দেখেছি বাংলা ভাষাও কবীরের রচনায় ব্যবহৃত। বহির্বঙ্গীয় নাথ সাহিত্যেও বাংলা ভাষার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। লাহোর পিঞ্জি জৈন লাইব্রেরী ২৬৯ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে নাগরী অক্ষরে চৌরঙ্গীনাথের গল্লের মধ্যে বাংলা ভাষায় আমরা নিম্নলিখিত অংশ পাই :—

সত্য বচন চৌরঙ্গীনাথ আদি অন্তরি স্থনৌ ত্রিতাত্ত সালবাহন ঘরে হমারা জনম উৎপতি সতিমা ভূট বোলীলা॥ ১॥

অমৃহারা ছইলা সাসত পাপ কলপনা নহীঁ হমারে মনে হাথ পাদ কটায় রখাছলা নিরঞ্জন বনে দোখ সন্তাপ মনে পরভেস সনমুখ দেখীলা শ্রীমছন্দ্রনাথ গুরুদেব নমস্কার করীলা নামাইলা মাথা॥ ২॥

আদীরবাদ পাইলা অমৃহে মনে ভইলা চরখিত হোটকণ্ঠ তাসুকারে হুকাইলা. যমনা রূপ মছন্দ্রনাথ স্বামী॥ ৩॥

এ প্রসঙ্গে 'নাথ সম্প্রদায়' গ্রন্থে ডক্টর হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেছেন—

"নহি হী রহ ভাষা পুরবী হৈ। যদি প্রাণসংকলী সচমুচ চৌরঙ্গীনাথ কী রচনা হৈ তো মাননা পড়েগা কি চৌরঙ্গীনাথ পুরবী প্রদেশকে রহনেবালে থে।"

চৌরঙ্গীনাথ ও কোলকাতার চৌরঙ্গী. ধর্মতলা নামকরণ ঐতিহাসিকদের গবেষণার বস্তু। এখানে সে আলোচনা না করে নাথ সাহিত্যের অন্য অংশের বিশ্লেষণ করা যাক।

হিন্দী 'গোরখ বানী'র কিয়দংশ এবং বাংলা "শ্রী গোর্খ সংহিতা" একেবারে ধ্বনি প্রতিধ্বনি···অবশ্য এখানে কেউ কাউকে ব্যঙ্গ করছে না এবং প্রতিধ্বনি যে ধ্বনির কাছে ঋণী তা ধরা পড়লে কোনও ক্ষতি নেই। ডক্টর সুকুমার সেন বাংলা 'শ্রীগোর্খ সংহিতা'কে 'হিন্দীর প্রতিধ্বনি বলেছেন, শ্রীমণ্ডল হিন্দীকে বলেছেন বাংলার প্রতিধ্বনি। যাই হোক, নাথ সাহিত্যে বাংলা হিন্দীর ভাবগত-ভাষাগত লেন দেনের এটি একটি দুর্লভ উদাহরণ।

হিন্দী "গোরখবানী"	বাংলা শ্রীগোর্খ সংহিতা
গোরখ—স্বামী কৌণ মূল কৌণ বেলা কৌণ গুরু কৌণ চেলা ॥ কৌণ ক্ষেত্র কৌণ মেলা। কৌণ তত্ত্ব লে কিরৌ অকেলা ॥ মছিন্দ্র—অবধূ মন মূল পবন বেলা। সবদ গুরু সুরতি চেলা ॥ ত্রিকুটী ক্ষেত্র উলটি মেলা। নিরাশ তত্ত্ব লে কিরৌ অকেলা ॥ ইত্যাদি	গোর্খনাথবাচ—শুন গোসাঞি, কেমন গুরু কেমন চেলা. কেমন মূল কেমন বেলা। কেমন তত্ত্ব লেকে ক্ষেত্রে একেলা। কহে মছদলি হুনে গোর্খ চেলা। মছদলিনাথ—অবধূ, মন মূল পবন বেলা সবদ গুরু সুরত চেলা। নির্মল তত্ত্ব লে কে কিরে একেলা। কহে মছদলি হুনে গোর্খ চেলা। ইত্যাদি

"নাথশিষ্য গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনী বাংলা ছাড়া গুজরাটী-মরাঠী-পঞ্জাবী-ওড়িয়া-হিন্দীতেও আছে। এ সকল রচনায় বাংলার উল্লেখ, বাঙ্গালী গোপীচাঁদের উল্লেখ, বোন চম্পাকে বাঙ্গালী বলে স্বীকৃতি এবং গোপীচাঁদের বাংলা দেশে আগমনের বিবরণ আছে (**Proceedings & Transactions of the Sixth All India Oriental Conference** দ্রষ্টব্য)। গোপীচাঁদ কাহিনীর মূল নিঃসন্দেহে বাংলা। তবে এ কাহিনী কেবল বাংলার নয়, বহির্বঙ্গীয় নাথ সাহিত্যেই তার প্রতিধ্বনি কেবল নেই, আমরা কবীরেও উল্লেখ পাই গোপীচাঁদের—

ভরথরী গোরখ গোপীচন্দা" (বীজক মূল রামন দাস : পৃ, ২৬৬)। উল্লেখ পাই জায়সীর 'পদ্মাবৎ'-এ (পদ্মাবৎ : তৃতীয় সং, পৃঃ ৫৫) :—

"গোপীচন্দ নহিঁ সাধত জোগ।"

গোপীচাঁদ কাহিনী বাংলা হ'তে নেপালে গিয়েছে। সেখানে নেপালী (নেওয়ারী) ভাষার নাটকে নেওয়ারী সংলাপের সঙ্গে আজও বাংলা ভাষার সঙ্গীত সংরক্ষিত হয়েছে। নেপালী নাটকে অন্তর্ভুক্ত বাংলা গান—

চন্দ্রকেতু নাম রাজা/এই সঙ্গে ছিল।
রাজ্যখানি আছে পড়া / রাজা কোথা গেল ॥১

নাথসম্প্রদায়ের যে-পদগুলি হিন্দী ভাষায় সংগৃহীত হয়েছে তাতে নাগরী অক্ষরের অন্তরালে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত অনেক স্থলেই বাংলা ভাষা চাপা রয়েছে। অনেক তীর্থ ভ্রমণ করে অনেক হিন্দী পাণ্ডুলিপি লক্ষ্য ক'রে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন বলেছেন—

নাথ সম্প্রদায়ের নব নাথের যে-সব বাণী দাদূ পন্থীরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এখনও তার মধ্যে বাংলা ভাষের পদ দেখিলে অবাক হইতে হয়।

ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বরথ্‌বাল হিন্দীতে 'গোরখবানী' প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি হিন্দী 'গোরখবানী'র মধ্যে গুজরাটী-মরাঠী শব্দের মিশ্রণও লক্ষ্য ক'রেছেন। একটু আলোচনা ক'রলে এর মধ্যে বাংলার গভীর প্রভাবও পাওয়া যায়। 'শব্দ' বা 'সবদী' অংশকে 'গোরখবানী'র সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রামাণ্য অংশ বলে সম্পাদক ডক্টর বরথ্‌বাল গ্রহণ ক'রেছেন। এই 'গোরখবানী'র বাংলা ভাষা-স্তর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইংরাজীতে অন্যত্র ক'রেছি। সংক্ষেপে এখানে বলি যে এর মধ্যে ভবিষ্যতে ইব', অতীতে 'ইল', √আছ √থাক ধাতু এবং সর্বনাম 'তিনি' শব্দের অজস্র প্রয়োগ আছে। হিন্দীতে 'ইব' নেই। রাজস্থানী গুজরাটীতে 'বা' আছে হিন্দী'-না' বাংলায়-তে অর্থে (অর্থাৎ হি°—করনা ; বা°—করিতে ; গু°—করিবা)। বাংলার 'ইবা', 'ইব' ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপক। রাজস্থানীতে এই ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক 'ইবা' ঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দী 'গোরখবানী'র নিম্নোদ্ধৃত অংশের 'ইবা' নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ কালজ্ঞাপক। যেমন—

নাসিকা অগ্রে ভ্রমণ্ডলে অহনিশ রহিবা থীর।
মাতা গর্ভি জনম ন আইবা, বাহুরি ন পিয়বা খীর ॥

অর্থাৎ 'নাসিকা অগ্রে ভ্রমণ্ডলে অহর্নিশ থীর রহিবা (দৃষ্টি ?) (ফলে পরবর্ত্তীকালে) মাতা গর্ভি জনম ন আইবা, বাহুরি খীর ন পিয়বা'। এ কেবল

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন, ২য় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৩৮-৭৪)

ভবিষ্যতের 'ইব' নয়, মধ্যযুগের পূর্বাঞ্চলের বাংলার অবিকৃত ছাপ এখানে স্পষ্ট। "অহঙ্কার টুটিবা নিরাকার ফিটিবা" বা 'অহঙ্কার টুটবে নিরাকার প্রকাশিত হবেন'—ভবিষ্যতের 'ইবা' এবং মধ্যযুগের পূর্ব্বাঞ্চলীয় বাংলার প্রতিধ্বনি মাত্র। এই ধরণের অজস্র 'ইল' ব্যবহার গোরখবানীতে লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার অতীত জ্ঞাপক 'ইল' (অনেক ক্ষেত্রে মরাঠী অতীতের 'ইল' দিয়ে এর ব্যাখ্যা সম্ভব, কারণ 'গোরখবানী' মরাঠী নিঃসন্দেহে আর একটি স্তর) অজস্র শব্দে ব্যবহৃত যেমন—

তজিলা, সোসিলা, রচিলা, থাপিলা, ঢুকিলা, খাইলা, যাইলা, আইলা, জপিলা, বিচারিলা, ছুটিলা, হইলা।

হিন্দী 'গোরখবানী'র পাণ্ডুলিপিগুলিতে চন্দ্রবিন্দুর বালাই নেই। সম্পাদক বলেছেন "প্রতিয়োঁ সেঁ কহী চন্দ্রবিন্দু নহীঁ হৈ।" মনে রাখতে হবে নাথ-ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে পূর্ববাংলার যোগ ঐতিহাসিক সত্য রূপে গৃহীত, এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষায় চন্দ্রবিন্দুহীনতা ভাগাতাত্ত্বিকদের পরিজ্ঞাত সত্য।

বাংলার পয়ার ছন্দের ন্যায় ছন্দের বন্ধন 'গোরখবানী'তে পাওয়া যায়। বাংলার পাশে ভোজপুরীতে পয়ারসম ছন্দ থাকলেও হিন্দীতে তা আগন্তুক। মনে হয় পয়ার ছন্দে বাংলা ভাষায় বিরচিত নিম্নের অংশটি হিন্দী 'গোরখ-বানী'তে নাগরী অক্ষরের ছদ্মাবরণে আত্মগোপন ক'রে আছে—

ওঁ নমো সিবাই বাবু / ওঁ নমো সিবাই
অহনিসি বাই মন্ত্র / কোঁনে রে উপাই।
ভিন্নে ভিন্নে অথ্যয়ে জে / দেবৈ রে বুঝাই
তাকা মই চেলা বাবু / সে গুরু হামার।
মন আদি মন অন্ত / মন মধে সার।
মন হী তে ছুটৈ বাবু / বিষয় বিকার।
যহন্ত গোরখ হম। হরিপদ জানা।

অথবা—

আপন হী সিংহ বাঘ / আপন হী গাই।
আপন হী মা(আ) বীলা / আপন হী খাই।

অথবা—

বাই জব বিরি হএ / মহারস পীবৈ।
কোট্যা মধে গুরুদেব গোটা এক বুঝৈ

ইত্যাদি অংশে ছন্দ কি হিন্দী ?

সম্পাদন-ত্রুটিতে কয়েকটি শব্দ বাঙ্গালীত্ব হারিয়ে মারাত্মক অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়েছে। 'গোরখবানী'তে একস্থলে আছে—

'ভিড়ি ভিড়ি বাঁধি লৈ রতন অমোলে'

(সম্ভাব্য মূল 'ভিড়ি ভিড়ি বান্ধি লএ রতন অমূল্যে' ধরলে পয়ার ছন্দ এবং মধ্যযুগের পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা পাওয়া যায় কি ?)

'ভিড়ি ভিড়ি' শব্দকে হিন্দী রূপে গ্রহণ ক'রে সম্পাদক অর্থ ক'রেছেন "অগ্রসর হো হো" (অগ্রসর হ'তে হ'তে) অর্থাৎ সমস্ত বাক্যটির সম্পাদক-কৃত অর্থ হ'ল, "অগ্রসর হ'তে হ'তে তিনি বাঁধলেন অমূল্য রতন।" কিন্তু 'অগ্রসর হ'তে হ'তে' বাঁধার কাজ কি সম্ভব ? কাঠের গোছায় দড়ির পাঁট দিতে গেলেও কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়, অমূল্য রত্ন অগ্রসর হ'তে হ'তে বাঁধা ত দূরের কথা। বাংলা (ওড়িয়াতেও) 'ভিড়ি ভিড়ি' শব্দের অর্থ হ'ল "দৃঢ় রূপে বাঁধা"। (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে, "ভিড়ি আলিঙ্গন দিতে না পারিল এ শাল রহিল বুকে")। এখানে সমস্ত বাক্যটির অর্থ হ'ল, 'তিনি অমূল্য রত্নগুলিকে বাঁধলেন দৃঢ় ভাবে।'

হিন্দী 'গোরখবানী'তে একাধিক স্থলে 'দেবী মনসা'র উল্লেখ আছে। অর্থাৎ হিন্দী 'গোরখবানী'র একটি স্তর যে বাংলা তাতে সন্দেহের কিছু নেই।

পঞ্জাবের শিখগুরু নানক সম্বন্ধে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থে শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস লিখেছেন :—

"পাঞ্জাবের গুরু নানক যখন বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিতে গমন করেন তখন কি ধর্ম্মে কি শিক্ষায় বঙ্গে স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মে তখন বঙ্গ প্লাবিত হইয়াছিল। তিনি চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও সংস্কারে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

উল্লিখিত গ্রন্থেই লেখক বলেছেন, "গুরু নানক শ্রীমন্নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এই সকল উক্তি কতখনি যুক্তিনির্ভর আমরা জানি না তবে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার।

হিন্দীর নির্গুণপন্থী সাহিত্যিক দাদূ প্রসঙ্গে আলোচনা ক'রে পণ্ডিত ক্ষিতি-মোহন দেখিয়েছেন যে দাদূ পূর্ব্ববঙ্গের নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে এসেছিলেন

শিক্ষার্থী হ'য়ে। বাংলার ভাব ও ভাষা এখন সেই দাদূর হিন্দী বাণীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন লিখেছেন—

> দাদূর বাণীর মধ্যে এমন বাণী আছে যেগুলি বরং ঐ দেশে প্রচলিত ভাষার পক্ষে একটু অদ্ভুত কিন্তু পূর্ব বাংলায় প্রচলিত প্রাচীন যোগীর গানের সহিত যাহার আশ্চর্য মিল আছে।
>
> যেমন দাদূর—
>
> উত্তা মারূঁ বৈঠা মারূঁ মারূঁ আসত সূতা।
> তীনলোক ভগজাল পসারূঁ কহাঁ জায়গা সূতা।
>
> পূর্ববঙ্গে যোগীর গানে আছে—
>
> উঠ্যা মায়ুম টৈয়াঠা মায়ুম মায়ুম জাগা সূতা।
> তিন ভবে ভগজাল বিছাইমু কই যাইবে সূতা॥

এছাড়া দাদূর "প্রশ্নোত্তর ঘটিত সমস্ত যোগিবচনগুলিই যে মূলে পরিব্রাজক যোগী ভিক্ষুদের দ্বারা বাঙ্গালা দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া বাহিরে গিয়া ভোল বদলাইয়াছে ও প্লাবিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।" একথা শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন।

প্রাগাধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্য আছে। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব প্রাক্‌চৈতন্য বাংলা দেশে, পরিপুষ্টি চৈতন্য-সাময়িক বা পরবর্তী বৃন্দাবনে ও বাংলায়। বাংলার চৈতন্য সম্প্রদায় ছাড়া বৃন্দাবন অঞ্চলে অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিকাশ লাভ করেছে। হিন্দী সাহিত্যক্ষেত্রে বল্লভাচার্যী, রাধাবল্লভী, হরিব্যাসী সম্প্রদায় এখান হতে বিকশিত হ'য়ে চিরন্তন দান রেখে গেছেন। চৈতন্য সমসাময়িক বা অল্প পরবর্তী এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্য সম্প্রদায়ের স্থান প্রধান কেন, তা আলোচনা কালে মিঃ এফ, এস্ গ্রাউস্ তাঁর "মাথুরা, এ ডিষ্ট্রিক্ট মেমোয়ার" গ্রন্থে (সং ১৮৮০, পৃঃ ১৮৩) বলেছেন—

> "The first named community (Bengali or Gauriya Vaishnavas) has had a more marked influence on Brindaban than any of the others, since it was chaitanya, the founder of the sect, whose immediate disciples were its first temple builders"

চৈতন্য-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কীর্তন ব্যবস্থা প্রচলিত করেন। চৈতন্য-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদর্শে কীর্তন ব্যবস্থা গৃহীত হয়

বল্লভাচার্যী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ে। 'সুরদাস' বল্লভাচার্যী সম্প্রদায়ে প্রথমে কীর্ত্তন গানের ভারপ্রাপ্ত হন।

ডক্টর সুকুমার সেন 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—

The early Brajbhākhā poets on the Kṛṣṇa legend were all under the influence of Caitanya Vaisnaviam. Vallabha Bhaṭṭa (Vallabhācārj), their leader came in direct touch with the Great Master (Caitanyadeva) and Gadādhara Paṇḍita (CC. II. 19 iii. 7.). He was a friend of Rupa Goṣvāmin (cf. Bhakti-ratnākara, p. 272). Vallabha's son Viṭṭhala-nātha was a follower of Raghunātha-dāsa, if not actually his disciple (cf. Bhakti-ratnākara. pp. 197, 210 f.). The Rādhā-Kṛiṣṇa literature in Brajbhākhā can thus be looked upon as an offshoot of the Neo Vaisnava literature of Bengal.

—A History of Brajabuli Literature; pp. 378/9.

ডক্টর সেন হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যকে বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি শাখা বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মত যে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য তা নীচের আলোচনা থেকে দেখাবার চেষ্টা ক'রব।

হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-সকল চৈতন্য-বৈষ্ণব ভক্তের দান বিশেষ ভাবে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে গদাধর ভট্ট, গোপাল ভট্ট পুরোভাগে। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আজও হয়নি। ডক্টর হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর "হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা" গ্রন্থে (পৃঃ ২) বলেছেন :

"চৈতন্যদেব কী শিষ্যপরম্পরা মেঁ অনেক বৈষ্ণব কবি বঙ্গলা ঔর হিন্দী মেঁ মধুর পদাবলী কী রচনা কর গয়ে হৈঁ। অতীতক ইস দশা মেঁ হিন্দী মেঁ বিশেষ কাম নহী হুআ হৈ।"

পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে হিন্দী সাহিত্য ক্ষেত্রে গদাধর ভট্টকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রেছেন। হিন্দী সাহিত্যের ব্রজভাষা শাখায় সুরদাসকে প্রাচীনতম বৈষ্ণব কবি বলা হয়ে থাকে। পণ্ডিত শুক্লের বিশ্লেষণে চৈতন্য-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত গদাধর ভট্টকে হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যক্ষেত্রে সুরদাসেরও পূর্ব্ববর্তী বা সমসাময়িক সাহিত্যিক বলা হয়েছে। কারণ, হিন্দীতে গদাধর ভট্টের রচনারম্ভকাল আনুমানিক ১৫৮০ সম্বৎ বা ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ বলে গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত গর্ভিত হিন্দী পদরচনায় গদাধর ভট্ট অসাধারণ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।

চৈতন্য সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্থানীয় ছয়গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের

স্থান নির্দ্দেশ ক'রতে গিয়ে ডক্টর হজারী প্রসাদ দ্বিবেদী লিখেছেন, "হিন্দী সাহিত্য মেঁ গোপাল ভট্ট কা মহত্বপূর্ণ স্থান হৈ।" ইনি স্থরদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলে সন্দেহ হ'লেও, পরবর্ত্তী যে নন সে বিষয়ে কারুর কোনও সন্দেহ নেই। নিচের পদটি বাংলার বৈষ্ণব 'পদকল্পতরু'তে ১০৮৮ সংখ্যক পদ রূপে গৃহীত। 'খড়ী বোলী হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে ব্রজরত্ন দাস এই পদটি চমৎকার খড়ী বোলী হিন্দী কবিতার উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত করেছেন। পদটি কি সুন্দর দেখুন :—

দেখ রী সখী কল্প নয়ন কুঞ্জ মো বিরাজে হৈঁ
বাস মে কিশোরী গোরী, আলস অঙ্গ অতি বিভোরী
হেরি শ্যাম নয়ন চন্দ মন্দ মন্দ হাঁসে হৈঁ।
সারী শুক করত গান ভ্রমরা ভ্রমরী ধরত সান
ধুনি নুনি ধুনি উঠ বৈঠত চোর কপল গাত হৈঁ।
শ্রীগোপাল ভট্ট আস বৃন্দাবন কুঞ্জবাস
সয়ন স্বপন নয়ন হেরি ভূলো মন আপ হৈঁ।

হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতে স্থরদাসের অবিস্মরণীয় দান। কিন্তু স্থরদাস ভনিতা-যুক্ত যে হিন্দী বৈষ্ণব পদগুলি (ব্রজভাষায়) সংগৃহীত হয়েছে তার অনেকগুলি কিন্তু চৈতন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সমসাময়িক আর একজন 'স্থরদাস মদনমোহন' বিরচিত। এঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পণ্ডিত শুক্ল বলেছেন যে ইনি "জাতিকে ব্রাহ্মণ থে ঔর গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব থে"। এঁর কবিতা এত সুন্দর ছিল যে হিন্দীর বিখ্যাত কবি শূরদাসের 'স্থরসাগর'-এ এঁর অনেক পদঅন্তর্ভুক্ত হয়েছে ("ইন কী কবিতা ইতনী সরস হোতী থী কি ইন কে বহুৎ সে পদ 'স্থরসাগর' মেঁ মিল গয়ে")। পণ্ডিত শুক্লর মতে ইনি আনুমানিক ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে পদ রচনা করেন। ('স্থরদাস' ভনিতা যুক্ত একটি বাংলা পদ—'কানাই আমার জগ মনমোহন রাখাল' ইত্যাদি—'কৃষ্ণ-পদামৃত-সিন্ধু' সঙ্কলন গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় গৃহীত হয়েছে। এই পদটির ভনিতার 'স্থরদাস' কে তা নিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন 'History of Brajabuli Literature (পৃ: ৪৫৭) তে প্রশ্ন করেছেন। হয়ত গ্রন্থ রচনা কালে ডক্টর সেন এই 'স্থরদাস মদনমোহন' এর অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিলেন না। আমার মনে হয় উল্লিখিত পদটি 'স্থরদাস মদনমোহন' বিরচিত। (এবং 'স্থরদাস মদনমোহন' কেবল গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ছিলেন না গৌড়ের লোকও ছিলেন।) 'স্থরদাস

মদনমোহন' বিরচিত (ব্রজভাষা) হিন্দী পদ পণ্ডিত শুক্ল তাঁর গ্রন্থে উদ্ধার ক'রেছেন। ষোড়শ শতকের হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্য ক্ষেত্রে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 'হিত হরিবংশ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে পণ্ডিত শুক্ল জানিয়েছেন যে, তিনি প্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোপাল ভট্টের শিষ্য ছিলেন পরে তিনি নিজেই 'রাধাবল্লভী' সম্প্রদায় স্থাপন করেন। তাঁর শিষ্য 'হরিরাম ব্যাস'ও প্রথমে চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে রাধাবল্লভী হন। 'হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস' গ্রন্থে ডক্টর রামকুমার বর্মা (৮৬৯ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, "সঙ্কীর্তন কা ভাব হরিব্যাস মুনিনে চৈতন্য সে হী গ্রহণ কিয়া থা।" ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি মীরাবাঈ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেছেন, 'মীরাবাঈনে পহলে জীব গোস্বামী সে দীক্ষা গ্রহণ কী থী' (হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা : পৃ ৫২)। ডক্টর রামকুমার বর্মা (হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস : পৃঃ ৮৩৩) বলেছেন, "মাধুর্যভাব কী উপাসনা কে কারণ উনহেঁ মহাপ্রভু চৈতন্য সে প্রভাবিত কহা জাতা হৈ, যদ্যপি মীরা কী ব্যক্তিগত ভাবনা অত্যন্ত স্বতন্ত্র হৈ।"

মধ্যযুগের হিন্দী-মরাঠী-সাহিত্যে সন্ত তুকারামের (১৭শ শতাব্দী) নাম এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 'খড়ীবোলী হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে ব্রজরত্ন দাস লিখেছেন, "স্বপ্ন মেঁ চৈতন্য মহাপ্রভু সে 'রাম-কৃষ্ণ-হরি কা গুরুমন্ত্র গ্রহণ কিয়া। ইসকে অনন্তর তুকারাম জী কবিতা বনা কর ভগবান কা গুণগায়ন করনে লগে।"

জাতীয় শিক্ষা মাতৃভাষা ও রবীন্দ্রনাথ

[শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের তরফে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে এবিষয়ে যে সংকলন প্রকাশ করেছিলেন তার থেকেই যথাযথভাবে মূল বক্তব্যটিকে উপস্থিত করা হয়েছে। স : উত্তরসূরী]

আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনই সে বড়ো হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে।·····বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ।·····আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড়ো হওয়া, তাহাকে কোনো জাগ্রত সত্তা বড়ো-হওয়া মনে করিতেই পারেনা।·····বস্তুত সে ছোটো হইয়া বাঁচিতে চায়, বড়ো হইয়া মরিতে চায় না·····এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষার যে একটি নিজত্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটাই প্রধান বাধা। অথচ বাংলাভাষার যাহা কিছু শক্তি যাহা কিছু সৌন্দর্য সমস্তই সেই নিজত্ব লইয়া।·····

আজ বাঙালি বাংলাভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দীভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়ো রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দীর ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে। এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিবে না।·····

একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন—বাঙলা সাহিত্য যতই উন্নতি লাভ করিতেছে, ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে, কারণ এ-সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে·····তবে ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলাভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য সাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলাভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।·····

সকল প্রকার ভেদকে ঠেকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের

মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা, বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দুর্দিনের ফাঁকি। বিশেষত্বকে মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

বাঙালিকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর সমস্তই স্বাধীনপন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি।.....

এই অন্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে। সেই মুক্তিই তাহার দেশের মুক্তির সত্যকার ভিত্তি। চিত্তের মধ্যে যে মানুষ বন্দী, বাহিরের কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।.....

বর্তমান কালে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে.....কোথাও যদি দলে-দলে দুঃসাহসিকেরা দারুণ দুঃখের পথে আত্মহননের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে, সে বাঙলা দেশে। ইহার অন্যান্য যে কোনো কারণ থাক একটা প্রধান কারণ এই যে বাঙালির অন্তরের মধ্যে বাঙলা সাহিত্য অনেক দিন হইতে অগ্নি সঞ্চয় করিতেছে, তাহার চিত্তের মধ্যে চিন্তার সাহস আনিয়াছে। তাই কর্মের মধ্যে তাহার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়।...

.....শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালিই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, ভোজন পংক্তির বন্ধনচ্ছেদন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বাধা মোচন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালিই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি করিয়া আপন ধর্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার চিন্তার জ্যোতির্ময় বাহন সাহিত্যই সর্বদা তাহাকে বল দিয়াছে।.....এই অধ্যবসায়ে বাংলা যদি বিশেষ গৌরব লাভ করে সে কি সমগ্র ভারতবর্ষের সামগ্রী হইবে না?.....গাছের যে শাখাতেই ফুল ফুটুক সে কি সকল গাছের নয়?.....

বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিরোধ করতে পারিনি কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে-ক্রমে স্বতঃই স্বীকার

ক'রে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বগ্রাসীতা, নানাধারায় এর অবাধ প্রবাহ। এর মধ্যে নিত্য উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্গম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবির ভাবে বদ্ধ নয়..... সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্য তার প্রয়াস।

বাঙালির চিত্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলা ভাষায়। কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জন করা আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া একই জাতীয় মূঢ়তা।...

একবার ভাবিয়া দেখুন বাঙালিকে যে আমরা বাঙালি বলিয়া অনুভব করিতেছি তাহা মানচিত্রের কোনো কৃত্রিম দেখার জন্য নহে। বাঙালির ঐক্যের মূল সূত্রটি কি? আমরা এক ভাষায় কথা কই—আমরা দেশের এক প্রান্তে যে বেদনা অনুভব করি, ভাষার দ্বারা দেশের অপর সীমান্তে তাহা সঞ্চার করিয়া দিতে পারি।...

এই জন্যেই যে যত দূরেই থাক আপন ভাষার গৌরব বোধের সূত্রে বাংলার বাঙালির সঙ্গে তার যোগ সুগভীর হ'য়ে রয়েছে। এই যোগকে ছেদন করতে তার ব্যথা বোধ হয়, একে উপলব্ধি করতে তার আনন্দ।...

বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করতো তবে আজকে হয়তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ ক'রে বসতাম। কিন্তু ভালো জিনিষের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে কেলে ফরমাশে গড়া যায় না।.....

কোনো-শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে চির-পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে-ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরে অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করতে পারে। সমস্ত জাতির জীবন-ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগ সাধন হয়।

ভাষা কমিশনের প্রস্তাবের মূল অর্থ ও তার প্রতিক্রিয়া

(১) হিন্দি ভারতের একমাত্র সরকারি ভাষারূপে, এবং কালক্রমে নিখিল-ভারতের রাষ্ট্র, শিক্ষা ও শাসন-সংক্রান্ত সর্ব ব্যাপারের একমাত্র সামান্য ভাষা-রূপে স্বীকৃত হোক

(২) ইংরেজি, যা বর্তমানে বৈকল্পিক সরকারি ভাষারূপে চলছে, তাকে যথাসম্ভব শীঘ্র অপসৃত করা হোক ;

(৩) সমগ্র অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলে মধ্য-বিদ্যালয়সমূহে হিন্দি ভাষাকে শিক্ষার একটি আবশ্যিক অঙ্গ করা হোক ;

(৪) শিক্ষার বাহন যেখানে হিন্দি, এমন কোনো স্কুল বা কলেজকে যে-কোনো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধ ও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকবেন, এবং হিন্দি ভাষায় শিক্ষাদানের দাবি উঠলে যে-কোনো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সেই দাবি পূরণ করতে বাধ্য হবেন

(৫) ১৯৬৫-র পর থেকে সর্বভারতীয় পরীক্ষাসমূহ হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজি বর্জন ক'রে একমাত্র হিন্দিকেই পরীক্ষার বাহন ব'লে মেনে নিতে হবে।

(৬) অ-হিন্দিভাষী প্রত্যেক রাজ্যের সরকারি পরীক্ষাসমূহের বাহনরূপে সেই-সেই 'আঞ্চলিক' ভাষার পাশাপাশি হিন্দিকেও স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

(৭) লোকসভায় একমাত্র হিন্দি ব্যবহৃত হবে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারে ও বিভিন্ন রাজ্যসমূহে আইনপ্রণয়নের জন্যও একমাত্র হিন্দি ব্যবহৃত হবে ;

(৮) হিন্দি কালক্রমে হবে সুপ্রীম কোর্টের একমাত্র ভাষা, হাইকোর্টসমূহে রায় দিতে হবে হিন্দিতে, এবং ভারতের সর্বত্র নিম্ন আদালতেও সেই সেই 'আঞ্চলিক' ভাষার পাশাপাশি হিন্দির ব্যবহার চলতে পারবে ;

(৯) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারসমূহের সমস্ত কর্মীগণ হিন্দি শিখতে বাধ্য থাকবেন এবং শিখতে না পারলে বা না-চাইলে শাস্তি পাবেন ;

(১০) অ-হিন্দিভাষীদের মধ্যে হিন্দিভাষা প্রচার, হিন্দি সাহিত্যের উন্নয়ন, আইন ও শাসন-সংক্রান্ত ভূরিপরিমাণ রচনাবলির হিন্দি অনুবাদ, বিবিধ সরকারি কর্মের জন্য হিন্দিকে উপযোগী ক'রে তোলা—এই সব কর্ম সম্পাদনের

জন্য প্রত্যেক রাজ্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ বা মন্ত্রীদপ্তর স্থাপন করবেন : এবং

(১১) সংখ্যায় বৃহত্তর অ-হিন্দিভাষী প্রজাগণ যদিও হিন্দি শিখতে বাধ্য থাকবেন, হিন্দিভাষীদের জন্য একটি ভারতীয় ভাষা না-শিখলেও চলবে, তার বদলে তাঁরা একটি অ-ভারতীয় ভাষা বা মানবধর্ম (Humanities)-সংক্রান্ত অতিরিক্ত একটি বিষয় শিখবেন।

এই প্রস্তাবসমূহ কার্যকরী করলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত নিম্নলিখিত সমস্যা তীব্র ভাবেই দেখা দেবে :

(১) ভারতের প্রজাসমূহ সুতীক্ষ্ণভাবে দুই দলে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে : একটি সুবিধাপ্রাপ্ত স্বল্পসংখ্যক হিন্দিভাষী গোষ্ঠী, যাঁরা নিতান্তই জন্মসূত্রে হিন্দিভাষার অধিকারী ব'লে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে শ্রেয়তর সুযোগ পাবেন, এবং একটি অধিক সংখ্যক বিরাট অ-হিন্দিভাষী গোষ্ঠী, যাঁদের উচ্চাশা ও স্বাভাবিক ক্ষমতা, নেহাৎই হিন্দিভাষায় যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে, পদে-পদে লাঞ্ছিত ও ব্যাহত হবে।

(২) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অতি উন্নত ভাষাসমূহ পার্থিব উন্নতির পক্ষে ক্রমশই অধিকতর নিষ্প্রয়োজন হ'য়ে পড়বে, আর সেই কারণে, যে-সব অঞ্চলের তারা মাতৃভাষা, সেখানেও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সেই-সেই ভাষাকে ক্রমশই অধিক উপেক্ষা করবেন।

(৩) যেহেতু অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলসমূহে হিন্দি হবে শিক্ষার একটি আবশ্যিক অঙ্গ, যে-হিন্দি বুদ্ধিবৃত্তির উন্নত চর্চার জন্য কমই কাজে লাগবে, অথচ হিন্দি-ভাষীদের শিক্ষার অঙ্গ হবে একটি অ-ভারতীয় ভাষা অথবা মানবধর্ম-সংক্রান্ত একটি অতিরিক্ত বিষয়, সেইজন্য অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলের তুলনায় হিন্দিভাষী অঞ্চলের শিক্ষার মান অধিক উন্নত হবে।

(৪) ভারতে যদি ইংরেজি বর্জিত হ'য়ে তার বদলে হিন্দি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে আমরা বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা ও মানবিক বিদ্যায় বিশ্ব-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বো, এবং আধুনিক জগৎ থেকে গোঁড়ামি, প্রাদেশিকতা ও মধ্যযুগীয় মনোভাবে আমাদের পশ্চাদপসরণ ঘটবে।

(৫) নিখিলভারতের একটি সামান্য ভাষা না-থাকলেই চলে না, কোনো এক

গোষ্ঠীর এই অতি সরল ধারণার জন্য সর্বভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৬) নিখিলভারতীয় শ্রেষ্ঠতার আসনে হিন্দিকে অধিষ্ঠিত করার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে যদি স্বতন্ত্র বিভাগ বা মন্ত্রীদপ্তর স্থাপিত হয়, তার অর্থ এই যে, অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলের প্রজাগণকে আপন-আপন ভাষা ও সংস্কৃতির ধ্বংসের জন্য অর্থব্যয় করতে হবে।

(৭) এক ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের জন্য কোনো-এক গোষ্ঠী বদ্ধপরিকর হবার ফলে ১৯৪৭ সালে যে-ভাবে ভারত বিভক্ত হয়েছিলো, সেই ভাবেই সর্বভারতে একই 'আঞ্চলিক' ভাষা বলপূর্বক চাপাবার চেষ্টার ফলে বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র বহু অংশে খণ্ডিত হ'য়ে যাবে। যদিও ভারতীয় ঐক্যের লোহাই দিয়েই হিন্দিকে অনুমোদন করা করা হচ্ছে, ভারতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার পক্ষে এর মতো নিশ্চিত উপায় আর-কিছুই নেই।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ-পত্রের সারাংশ :

(১) ভাষা-কমিশনের অনুমোদনগুলি কার্যে পরিণত হ'লে ভারতে অবিলম্বে দুই শ্রেণীর প্রজার সৃষ্টি হবে : 'হিন্দিভাষী প্রথম শ্রেণীর প্রজাবৃন্দ, যাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের ভাষার বলে অসংখ্য বিশেষ সুবিধা পাবেন, এবং অ-হিন্দিভাষী দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজাবৃন্দ, যাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের ভাষারই জন্য বহু স্থায়ী অক্ষমতার ভুক্তভোগী হবেন।'

(২) যেহেতু হিন্দি ভারতের অন্যান্য ভাষার উপর কোনো সাংস্কৃতিক প্রাধান্য লাভ করেনি, তাই হিন্দির দাবি অত্যন্ত দূরপ্রসারী ক'রে তোলার প্রচেষ্টার একমাত্র অর্থ হ'তে পারে 'একটি জায়মান "হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ", যা জাতীয়তা-বোধের অধিকতর বিরোধী হবে।'

(৩) 'ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দিকে স্থাপিত ক'রে অ-হিন্দিভাষী সকল অঞ্চলে হিন্দিকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য' এই অধীর প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় ঐক্যের পক্ষে একটি গুরুতর বিপদ দেখা দিয়েছে, যথা ভাষাগত প্রাদেশিকতা।

(৪) হিন্দী ভারতের সরকারি ভাষারূপে প্রস্তাবিত হয়েছে, কিন্তু হিন্দির সমর্থকগণ সর্বত্রই এর চেয়ে অনেক বেশি দাবি ক'রে থাকেন। তাঁরা বলেন যে

ভারতের জাতীয় ভাষা হিন্দি এবং **ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাও** হিন্দি। কেউ-কেউ এমনও একটি স্লোগান তুলেছেন: 'হিন্দ, হিন্দু, হিন্দি—এই তিন এক।'

(৫) আমাদের প্রধান মন্ত্রী বহুবার এই মত প্রকাশ করেছেন যে **ভারতের জাতীয় ভাষা একটি নয়, চোদ্দটি**।

(৬) গদ্যের খাড়িবোলি হিন্দি, যা হিন্দুস্তানি বা উর্দুকে সরিয়ে দিয়ে আজ সাধারণভাবেই হিন্দি নামে চলছে, এবং যা সংবিধানে ভারতের **সরকারি ভাষারূপে** উল্লিখিত হ'য়ে আজকের দিনে **ভারতের জাতীয় ভাষা** হবার উচ্চাশা রাখে—আঠারো শো পঞ্চাশের আগে এই ভাষার প্রায় অস্তিত্বই ছিলো না। কিন্তু উত্তর ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষার বয়স অন্তত এক হাজার বছর, এবং দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহ আরো পুরোনো।

(৭) রাজস্থানি, কোশলি, ভোজপুরি এবং মৈথিলি ভাষার সঙ্গে অন্যায়ভাবে একত্রিত ক'রে 'হিন্দি'-ভাষীর সংখ্যা স্ফীত ক'রে তোলা হয়েছে, কিন্তু উক্ত ভাষাসমূহের কোনো-কোনোটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা।

(৮) অনেক তথাকথিত হিন্দিভাষী ব্যক্তি, যাঁরা খাড়িবোলি হিন্দিকে গ্রহণ ক'রে 'কার্যত তাঁদের স্বদেশীয় ভাষা বা প্রকৃত মাতৃভাষাগুলিকে দমিত করছেন', তাঁরা সাধারণত বুঝতে পারেন না 'বাঙালি, উড়িয়া, অসমিয়া, গুজরাটি, মরাঠি এবং দ্রাবিড় জাতিসমূহ তাঁদের নিজ-নিজ মাতৃভাষার প্রতি কী তীব্র ভালোবাসা অনুভব করেন।'

(৯) শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাবিষয়ক নীতি নির্ধারণ ক'রে মাদ্রাজ-সরকার ইংরেজিকে আবশ্যিক ও হিন্দিকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করেছেন ও তাঁদের মতে '**আধুনিক সৃষ্টিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রত্যক্ষভাবে দ্বার খুলে দেয়, হিন্দি তা পারে না।**' এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের কোনো সমর্থনের প্রয়োজন করে না, এবং একে অস্বীকার করাও অসম্ভব।

(১০) বর্তমানে ইংরেজি একটি বিশ্বসভ্যতার সামান্য ভাষা হ'য়ে উঠেছে, এবং যে-সব ভারতীয় ইংরেজির পক্ষপাতী, তাঁরা নিজ-নিজ মাতৃভাষাকে ভালো-বাসেন ব'লেই ইংরেজিকে রাখতে ইচ্ছুক। তাঁরা চান যে ইংরেজির সাহায্যে তাঁদের মনীষীবৃন্দ বিশ্বচিন্তায় সহজ ও সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করুন, এবং তার ফলে তাঁদের নিজ-নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি আরো বেশি সমৃদ্ধ হোক।

ইংরেজি-রক্ষার এই ইচ্ছার কারণ জাতীয়তাবোধের অভাব বা মানসিক কোনো বিকার নয়, এর মূল একটি সুগভীর মানবধর্মী আদর্শবাদে। সেই আদর্শ অনুসারে ইংরেজি ভাষা সেই উপায়, যার দ্বারা আমরা সমগ্র মানব-জগতের অন্তর্ভূত হ'তে পারি।

(১১) ভারতভূমি থেকে ইংরেজিকে অপসারিত করার ইচ্ছার কারণ একটি মিথ্যাশ্রয়ী জাতীয়তাবোধের গর্ব, যা প্রায় হীনমন্যতার সামিল। কিংবা এর কারণ এই সুস্পষ্ট তথ্য বিষয়ে স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতা যে ভারত একটি বহুভাষী দেশ, যেখানে কোনো-একটি ভাষা সর্বসাধারণের ইচ্ছাপ্রসূত বশ্যতা লাভ করতে পারে না।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য :

(১) ভারতে কোনো সময়েই **একটি** জাতীয় ভাষা ছিলো না। পুরাকালে সংস্কৃত ছিলো একটি সীমাবদ্ধ অভিজাত সমাজের ভাষা, এবং সেই সমাজের মধ্যেও শুধুমাত্র পুরুষের ভাষা। মোগল আমলে পারস্য ভাষা শুধুমাত্র রাজদরবারে ব্যবহৃত হ'তো।

(২) যে-অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা ইংরেজি, সে-অর্থে ভারতের কোনো একটি স্বাভাবিক জাতীয় ভাষা নেই। সমগ্র ভারতভূমিতে কোনো-একটি ভারতীয় ভাষা স্বাভাবিকভাবে বলা হয় না বা বোঝা যায় না।

(৩) হিন্দি ইতিমধ্যেই ভারতের **সামান্য ভাষা** (lingua franca) হ'য়ে উঠেছে, এই দাবি ভিত্তিহীন। ব্যাকরণ ও অন্বয়-বর্জিত কতিপয় বিকৃত শব্দের যে সমষ্টিকে 'বাজার-হিন্দি' বলা হয়' তা ভারতের অনেক অংশে চলিত হ'তে পারে ; কিন্তু প্রকৃত (খাড়িবোলি) হিন্দির প্রচার নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

(৪) ভাষা-কমিশনের বিবৃতি (পরিচ্ছেদ ৪, অনুচ্ছেদ ১৭, পৃষ্ঠা ৪৯) দাবি করেছেন যে, হিন্দিভাষী জনসংখ্যা 'ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৪২ এবং সংবিধানের অষ্টম অনুসূচিতে উল্লিখিত ভাষাভাষীদের মধ্যে শতকরা ৪৬।' এই দাবি স্পষ্টত ভুল, কেমনা সেই একই বিবৃতিতে বলা হয়েছে (পরিচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ৬, পৃষ্ঠা ২৮) যে হিন্দি, হিন্দুস্তানি, উর্দু ও পঞ্জাবির সম্মিলিত জনসংখ্যা ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৪২·০১।

(৫) হিন্দি ভারতের সরকারি ভাষারূপে নির্বাচিত হয়েছিলো জনসাধারণের

প্রতিনিধিদ্বারা সংগতভাবে গঠিত লোকসভায় নয়, সংবিধানসভায়, এবং এই নির্বাচন সম্ভব হয়েছিলো ভোটের অতিশয় সংকীর্ণ আধিক্যের জোরে।

(৬) ইতিমধ্যেই, সর্বভারতীয় প্রয়োজনের নামে, ভারতের একটি বিশেষ 'আঞ্চলিক' ভাষা, অর্থাৎ হিন্দি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে। হিন্দি ভাষার লেখক ও বক্তারা বহু প্রকার সুবিধা পাচ্ছেন, এবং অ-হিন্দিভাষীকে হিন্দি শেখাবার জন্য উচ্চ বেতনে হিন্দি শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছেন। এই সব ব্যয় যে-রাজস্ব থেকে নির্বাহিত হচ্ছে, তা ভারতের সমগ্র প্রজাসমূহ দিয়ে থাকেন, এবং এই ব্যয়ের ফলে এমনকি তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষাও বহুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

(৭) একটি সামান্য বা জাতীয় ভাষা জাতিগঠনের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম রিপাবলিক সুইৎসারল্যাণ্ডে তিনটি জাতীয় ভাষা চলে, বেলজিয়মে দুটি।

HINDI SHOULD NOT BE IMPOSED

C. RAJAGOPALACHARIAR

The language issue is not a simple issue. One question is, what should be the medium of instruction in schools and colleges? That is not in fact a matter at issue now, and I shall not detain you on this except to state straightaway that the language through which we should teach, through which we should learn the subjects taught in the schools, should be the mother-tongue, that is to say, the language of the particular region, because we have quite a number of mother-tongues in India. In this part of the country, it should be Tamil ; that is, whatever we learn we should learn through Tamil in the schools and that is my view.

Medium of Teaching

Again in respect of the teaching medium, what should be the medium in schools, and what should be the medium in higher institutions, colleges and in the higher forms of the high schools? I should say, there also the medium of instruction should be the regional language in each State —in Madras, the regional language of this State, namely Tamil, in Bengal the regional language of that State. So also in Gujerat, Poona and so on. Instruction should be given and taken in the regional language, not only in schools, but also in colleges. There is not much difference of opinion about this medium of instruction in schools. But in regard to the medium of instruction in colleges there is some difference of opinion. Because I stand up for English as the official language, some people believe that I might also be advocating English as the teaching medium in colleges. I do not. My view is that the medium of instruction even in colleges should be, generally speaking, the mother-tongue of the boys and girls of the area concerned.

অনুবাদে ভাষার তীব্রতা, আবেগ ও সরলতা কিছু পরিমাণে হ্রাস পাবে বলে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর ইংরেজী রচনাটি অবিকৃত ভাবেই প্রকাশিত হোল। স : উত্তরসূরী

I say *generally* because there may be certain institutions which are specifically allowed to have a large number of students from outside so that there may be some place where such students may get instruction. We may have to provide for such special cases. But generally speaking, even in higher education we ought to have the mother-tongue as far as possible for teaching the various subjects including sciences.

There is again another confusion which I would like to clear up at the outset. Supposing you have a subject like science and it should be taught in the mother tongue. It is generally thought that words for oxygen, hydrogen, electricity should be laboriously worked out by Tamil Pandits, that we should find out new words for these words. I say I do not agree. I think we should save time and energy by utilising the technical and scientific words that are in common use in the world, that have been used in India for a long time now, during the last more than hundred years, in the teaching of the science subjects and such other subjects. We should therefore teach chemistry, even high chemistry, through mother-tongue of the area, by using all these words that are for the present being used in the teaching of the subjects through the English medium. In my opinion there should be no change in these technical terms. I repeat that while the teaching should be in the mother-tongue, the technical terms now in use may be used as such.

It is absolutely necessary that we should maintain the study of English language and literature as one of the important subjects to be pursued in higher education. All students should study English language and literature, although the lectures on the various subjects may be in the Indian languages. English language and literature should be studied, so that there will be no difficulty in maintaining a sound knowledge of the English language all through. The present textbooks could be continued to be used just as you can have the Sanskrit textbook of *Bhagavat Gita*, and have lectures in Tamil on the way of life the Gita teaches. We could likewise teach chemistry in Tamil, botany in Tamil, having English textbooks, and

utilising them fully. Students may read them but they may not be compelled to express themselves in every context in the English language. They may talk and write in Tamil, and they may freely use English books. I have dwelt so long on the medium of instruction because it generally is the subject matter of confusion. My main point is that the mother-tongue should be freely used, and that English should be maintained and should be studied because it is necessary in the modern world when we educate our young men and women that they should be conversant with one important international language, and that is English.

Inter-State Correspondence

The real position about the official language is divided into two parts. There is the question about the official language of the State and there is the question of the official language of the Union of India, and the inter-State official language. So far as the State official affairs are concerned, my view is that we should use the language of the State. For example, in this State, Tamil should be the official language of the State; in Malabar Malayalam, in Mysore Kannada and so on. But for inter-State official work, a report which is to go from Madras to Delhi, or a report which is to come from Delhi to Madras, or correspondence between the officials of the Fort St. George Secretariat in Madras and the officials in Hyderabad or Bengal, what should be the language? The issue now disputed is this question, namely, what should be the language of the Union Government official work and inter-State official work? I say and I maintain that it should be English and not Hindi, whereas the Government of India's desire is to make Hindi replace English. The State language should be the official language of the State, the official language of the Union and the language for inter-State correspondence should be English and not Hindi as proposed.

But, what exactly are the facts at the outset in this matter on which we have a quarrel with the Upper India people? We should understand the facts and analyse them and discuss them without passion or prejudice. There is no use acting on prejudice or passion. Let us see how

things stand now. What is the claim for Hindi? If you take Hindi to be the language of the majority of the people of India you would be wrong. It is not the language of the majority of the people of India. The position is that only two-fifths of the population of India could claim to have Hindi or some variation of Hindi as their mother-tongue, and three-fifths of the population of India speak other languages. But it is true that these two-fifths are the largest group, while the three-fifths are divided into a number of groups. We are not fighting that position now. Those who speak Tamil, Malayalam or other languages together make up the three-fifths of the population. But the two-fifths are a compact population in Central India and U.P. The two-fifths are not spread all over India. The people who speak Hindi are not spread all over India. They are in Central India and U.P.

Only Two-Fifths

If you go, say to Bengal, compact masses of humanity speak Bengali ; if you go west, compact masses of people speak Gujerati, Marathi and so on. Likewise people speak Punjabi in the north. In the south, compact masses of people speak Tamil, Telugu, Kannada or Malayalam. If the Hindi-speaking population had been spread all over, although only two-fifths, there would be some meaning in claiming the right to push their mother-tongue as the official language. But for the present, because the non-Hindi people are cut up into definite masses of people speaking different languages, it would be oppressive to have Hindi as the official language.

No man is able to put himself in another man's place, and that is the misfortune in the world. Every man thinks his own convenience is the convenience of everybody. So people in Upper India imagine that Hindi is easy, that it is an easy language, and therefore it should be learnt. All of us would be of the unanimous opinion that Tamil is an easy language. But I will give 25 or 30 or 50 years to the Upper India people, would they be able to read and write Tamil as well as we? Not at all. They would not be able to do that.

Language of the Educated

So far as the English language is concerned, it is the language of our diplomatic corps, the diplomatic department, it is our language when we go to America or France. The question now here is shall we accept Hindi as between Delhi and Madras? Speaking illustratively, the same thing applies to the case of Delhi and Hyderabad. Imagine the difficulties that will arise then. It is true that because we had prejudice, and we so disliked the Englishmen, we said we shall not have English, we shall have Hindi. Now that we have sent away the Englishmen, the anger has gone, and we have become calm and quiet. We now ask, why should is it, as we say in Tamil, your grandfather's property? The Englishman has left it here, it is not his property. So far as property is concerned, you can remove it, and you can leave it in one place, and if you do so, you cannot have it in another place. So far as English is concerned, this law does not apply. English remains here, it remains in England, why, the English people went to America, and it is the language of the Americans. After 200 years here in India, English has become the language of all educated people in India. It is the one language which is the language of every educated person in India, wherever it be, whether Calcutta, Bombay, Hyderabad or Madras. It is the one language which all educated people know in this country. Because it was the result of foreign domination, must we throw away English along with the Englishman? I do not say we should. I say we should not. We have not thrown away the railways, the telegraph wires, we have not even sent away the statues that remain here. I for one would not like to send away Munroe's statue, though his people may like to have it for themselves. There are certain things which should remain over, the English language should so remain over. It is not something which you can remove. It is a treasure which you cannot remove. A number of people know English and English they consider is our language. All these things cannot be given up. It is a treasure which cannot be valued in terms of rupees, it is much more valuable than the railways, the telegraph wires etc. They have left it behind

and the English language is there in India, and to replace it would be foolish and bad.

There is one strong point in the argument on the other side. They say the language of the Government should not be a language which is strange to the people that are governed. This is no doubt a very important principle. The language of the people in Madras is Tamil, that in Mysore is Kannada. The Government of Madras and that of Mysore will conduct their official work, according to my formula, in Tamil and Kannada. I say therefore there is no divorce between the language of the people and the language of the Government.

It is only in regard to correspondence between State Governments, and correspondence between a State Government and the Centre, that I suggest that English should be retained. So far as the people are concerned, throughout the length and breadth of India, according to my formula, the language of the people will be the language of the Government. The language of the State Government in each case will be the language of the people of the area concerned. But if the Delhi Government corresponds with Fort St. George in English, it makes no difficulty for the common man. The work of the State Government will all be done by the Government in the language of the State, and thus there will be no divorce between the language of the Government and the language of the people in actual fact. The argument is therefore wrong that the principle of identity of language between the Government and the people should support Hindi as the official language. The argument is wrong in two ways. Even though the official language of the Centre and of the State which corresponds with it is English, the people and the Government speak the same language in every State. In another way, I say, the argument is wrong. Supposing it is done in Hindi. Is it the language of the people of either Madras or Mysore or Malabar? No. Then there would be complete divorce in certain provinces, and in other parts, (three-fifths of India) say in areas where Marathi, Bengali or Tamil is spoken, there would be no identity between the language of the people and that of the Government. So the argument that

the Government should be run in the same language as the language the people speak, cannot apply to India as a whole, because we are a multi-lingual nation. The very fact which was pointed out against freedom by the people who did not want to lose their domination over India has not altered now, and it remains. We cannot therefore make the wish the further to the thought and say that all people here speak Hindi. We cannot make such a statement. There is no use in granting that Hindi is the language of the Union. It will be a strange language to many people, as strange, perhaps a little less strange but nearly as strange as any other language. There is no advantage whatever in making Hindi the official language even in respect of that argument put forward by them. I therefore say that English should remain.

Should Not A Man Change?

It would be unfair, it would not be just, to make a permanent advantage for those to whom Hindi is the mother-tongue and to make a permanent disadvantage for those to whom Hindi is not the mother-tongue. Apart from justice, a whole mass of people would be relegated to a politically subordinate position. In order to realise what I mean, you have to be older than you are. If you are older, then you will know how everyone who spoke English, every Englishman used to be looked upon as of a higher caste. Therefore I say, everyone who has his own mother-tongue as the official language will be looked upon as of a superior status hereafter. If Hindi is imposed in the place of English, a whole mass of people will be relegated to a position of subordination. They would have to look upon the Hindi-speaking people to whom Hindi is the mother-tongue as superior because thep speak it much better than we can possibly do. People speaking Hindi as their mother-tongue would be looked upon as a superior sort of people, having a superior status in the governance of India. It would be an unfair position which cannot be tolerated. Even if practicable, this would be wrong.

Some of you know that there is an article in the Constitution which was resolved upon by the Constituent

Assembly that Hindi should be the official language of the Union. At the time the Constitution was made, we did not see how things will shape. We have had the reorganisation of States which we did not think of at the time. The reorganisation has created new State boundaries, dividing up the States mostly according to the languages. When each State maintains its own language, it is time that we should reconsider the position regarding the Union language. The Constitution should therefore be altered. English should be retained as the official language of the Union. But how are we to change the Constitution? We have changed the Constitution several times even during the last ten years. So we have to ask the Indian Government to change the Constitution, if necessary. My own view is that if the Government of India make up their mind, they can even without changing the Constitution do the right thing. But if necessary we may change the Constitution also, there will be no harm in doing so. This is what we should get done and in order to get it done, public opinion should be formed, especially among the younger people.

হেমিংওয়ের জন্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্রণাই চেয়েছিলে। শ্বাসরুদ্ধ কান্নার আবেগে
মনপবনের ডিঙ্গা ভাসিয়ে অপ্রেম থেকে দূরে
আরো দূরে চেয়েছিলে চ'লে যেতে যেই দেশে কোন
মুখ নেই, স্মৃতি নেই। কিন্তু তীব্র তমসায় পুড়ে

কী আশ্চর্য স্বর্য তুমি! নির্বোধের গভীরে কী গান
তোমাকে রাঙালো! আমরা অর্দ্ধ পশু, অর্দ্ধেক ঈশ্বর
আনন্দ এবং ঈর্ষা বুকে নিয়ে প্রেমে ও অপ্রেমে
জ্ব'লতে জ্ব'লতে নিভে যাই। আর তুমি জ্ব'লেও অমর

আনন্দের পুত্র। তাই সমুদ্রের অমাবস্যা ছিঁড়ে
তোমার অপূর্ব মাছ মুখ তুললো বৃদ্ধ ধীবরের
সহোদর। দেহ তার কোমল প্রেমের মত, তার
চোখ নীলকান্ত মণি, সন্ধ্যার রক্তের রহস্যের

স্বাদ নিতে যেই মাছ বেছে নিল মৃত্যুর অমোঘ
সমাধান। যেন সেও কণ্ঠে নিল সমুদ্রের রোগ॥

তিনটি কবিতা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সিঁদুর প'রো না তুমি (Rispetto)

চিহ্ন-ধারণ বর্বর-প্রথা—একথা হয়তো মানো
দাস-মনোভাব থেকে উদ্ভূত—সিঁদুর প'রো না চুলে।
এ বিষয়ে তুমি আমার প্রকৃত মতামতটা তো জানো
অন্তর্হিত সিঁদুর মাখাক মুখে, চোখে, সিঁথিমূলে!

সেটাই তো ভালো, সিঁথি শাদা থাক, সরল রেখার সিঁথি—
কিছুদূর গিয়ে চুলের গহনে মিলায় মিলাক বীথি
নিরুদ্দেশের সীমন্তে মন হারাবার ইঙ্গিত
সে-পথেই বাজে যতো অবেলার আলোকের সংগীত।

প্রহর যখন ছিলো ছোটো (Rondlet)

প্রহর যখন ছোটো বিশ্রব্ধ-কূজনে
মনে আছে স্বপ্ন-ভরা সেই সুসময়?
প্রচিত প্রাণোত্থ প্রেম যে-লগ্নে দু'জনে
বিনিময়ে করা হ'লো সেই সুসময়?

ঊষর-আকাশযাত্রী আজ পাণ্ডু চাঁদ
পাড়ি দিয়ে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে হ'লো শীর্ণ ছোটো
চিরন্তন ক'রে কেন রাখোনি প্রমাদ
প্রহর যখন ছিলো ছোটো।

তিনটি কবিতা

তাকে আমি প্রাণ ভ'রে ছুঁই (Rondlet)

তাকে প্রাণ ভ'রে ছুঁই এমন দুরাশা
ভুলেও কখনো মনে পোষণ করিনি
পবিত্র দূরত্বে থাক কল্পনার বাসা
স্নেহস্পর্শে সে-সুষমা শোষণ করিনি।

মন যদি ক্ষেপে ওঠে চাওয়ার প্রলাপে
যে-পথে সে যায় তারি পথধূলি ছুঁই ;
যে-বাতাস তাকে ছুঁয়ে কামনায় কাঁপে
তাকে আমি প্রাণ ভ'রে ছুঁই।

ভুল ভালবাসা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে ঘরে
সে যদি আবার সেই ম্লানতার ছবি খুলে দেখে
যা রয়েছে বুকে তার শয়নে জাগ্রতে নীতে অরে,
যাকে মনে রেখে তার অন্য সবই গেছে একে একে—
তার সেই নীল চোখ প্রসন্ন উদাস মায়াময়
ছেলেবেলাকার মনে আশ্চর্য কঠিন ভাললাগবার মত,
চেখে কিংবা চোখে দেখা যে-তন্ময় হয়েছে মন্ময়,
মুখরাখা সভ্যতায় কেন তাকে করো ফের দুঃখভারানত ;

তাকে কেন ভাবলে চোর, কেন ভাবো শস্যময় ক্ষেতে
মশালে আগুন জ্বেলে দস্যুর মতন একদিন
সে আসবে দ্রুতপায়ে একান্ত কঠিন
তোমার সোনার রাজ্যে দুটি ক্ষুদকুড়ো শুধু পেতে—
কেন বা ভিখিরী ভাবো তোমার দ্বারের কাছে বলে,
হৃদয় তোমারও আছে একথা সে সাধারণ জানে—

উত্তরস্থরী

অথচ তাকেই তুমি কাকতাড়ানোর মত কালো ছেঁড়া কাঁথা
চুণকালিমাখা হাঁড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছ হেসে মনেপ্রাণে ;

পরাজিত সব ক্ষেত্রে হয় ত সে তুমি যা যা জানো
আশ্চর্য প্রক্রিয়া কত আনন্দের তুমি মনে রাখো
কী ভাবে নিজেকে ভুলে অন্যকে ভুলিয়ে পথে আনো
এবং পথের প্রান্তে জ্যোতিষীর ছক-দাগ আঁকো—

দেখো সে আরেক দিকে দাঁড়িয়েছে বকুলের মত
যেখানে এসেছে ফিরে তার মালা গাঁথবার স্মৃতি
যেখানে খঞ্জনীবাদ্যে বাউলের উদাসীন গীতি
ফেলে আসে অন্য সত্য, মিথ্যা আজ যাকে তুমি বলো অবিরত—

বুক যদি খুলতো সে দেখা যেত শিরাউপশিরা
সুন্দর নদীর মত বারবার পথ ভুল করে,
ভুলের আনন্দ নিয়ে বেজেছে মন্দিরা—
যতক্ষণ ভুল শুধু ততক্ষণ তার মন ভরে।

অবিনশ্বর

রাধারমণ প্রামানিক

না, তোমাকে তো পাই নি, পাবোও না—
তবু তুমি পূর্ণিমার নিঃসঙ্গ শয্যার
পাশে যেন এক শুভ্র রজনীগন্ধার
প্রথম উপমা।

তুমি আর ঈশ্বরের মুখ পর পর—
কখনো তোমাকে দেখি, কখনো ঈশ্বর,
কখনোবা অবিরল জ্যোৎস্নার মতো
স্বপ্ন সত্য প্রেম অবিনশ্বর।

সেণ্ট পল্‌স ক্যাথেড্রালে সন্ধ্যা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

উন্মোচিত সবুজে প্রথম দিনের আনন্দরা পায়ে পায়ে ঘোরে।
তাদের ছোট ছোট মুখে কোমল আলোর পশ্চিম।
আসে, হাওয়া আসে পবনপদবী ছুঁয়ে
এলোমেলো চুলের অরণ্যে সম্মিলিত হ'তে।
এপাশে তখন প্রতিবেশী জলের প্রশান্তিতে গীর্জার ছবি কাঁপে,
ওপাশে ক্রুশের গায়ে নিঃসঙ্গ ঈশ্বর।

অনন্ত নির্জন নিয়ে কোন সন্ধ্যায় এখানে আসো যদি তুমি
দেয়ালের অন্তপিঠে দেখবে তখন অন্য এক স্বর্গের অভিমান ;
আর
সারাদিনের অর্জিত বেদনাগুলো
সমস্ত বাগান জুড়ে মিলিত ফুলের পবিত্রতায়
প্রথম দিনের আনন্দ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ॥

রূপসীর খেদ

সামসুল হক

রূপসী মধুর কথা : সেই সাথে যদি নাম হয়
কুন্তলা—একদিন শকুন্তলা ছিল যাহা, আর
ছোটবেলা, বেবী-টুটু। পড়শীরা বলতো : নিশ্চয়
অমুকের মেজমেয়ে রাজরানী হয়ে যাবে, তার
চিবুকে একটি তিল—এই ব'লে পান মুখে দিয়ে
হাসে। কার বৌ কলসী কাঁকে ঘোমটার আড়ালে
বাদাম তলায় বলে : লক্ষ্মীর রূপ গায়ে নিয়ে
মেয়েটি এসেছে যেন, উর্বশী ছিল কোন কালে।

উত্তরস্থরী

কি মাসের ক' তারিখ মনে নেই। জামতলা বেয়ে
কার রূপ চুপি চুপি সরে এসে ময়নাদীঘির
কালো জলে ডুবে গেল : (আহা জানিনাতো কার মেয়ে !
বয়স বা কত ! চিবুকে কি তিল ছিল !) অস্থির
পায়ে ছাদ থেকে নেমে এসে ঘুম দিতে ভোর হোল।
সে-কথা ভুলেছি। তবে, মেজবাবু কেন যে সেদিন
হেসেছিল, কিছুটা বুঝতে হোল। (মনে টলোমলো
ভাব যে আসেনি মোটে,—এটা বলবো না কোনদিন।)

তবুও বলতে হবে : কোন এক যুবকের কথা
সে আমাকে চেয়েছিল। ঈশ্বরীপুরে তার গ্রাম।
বাবা তার বড়লোক। দেখাতো সে কত সরলতা
লাম্পট্যের ভংগি নিয়ে। (কি যে হোল পরিণাম !)
বোস-সেন হালদারের দুধ খেকো কত ছোট ছেলে
(মা-বাপ বলতো কিনা) নায়কের অভিনয়ে কত
সুনিপুন ছিল (আহা, বেচারীরা)। সব অবহেলে
অশ্বিনী মামা ঠিক ক'রে বিয়ে দিলো মন মতো

পাত্র দেখে। কিন্তু সে কিছুকাল পরে বলে দিলো :
তোমার চরিত্র নেই, সুতরাং চলে যাও। তাই
নটী সেজে ভরিয়ে তুলছি মন। যত সাধ ছিল,
আমার তাতার রূপ লুটে নিল। এতোটুকু চাই
প্রেম-মন (কেউ যদি দিতে পারে)। জীবনে আবার
সাধারণ মেয়ে হ'য়ে জবা-শ্যামা-মাধুরীর মতো
একবার যদি বাঁচি। কেউ যদি রূপের বাহার
পুড়িয়ে, সোহাগে ডাকে—ভ্রমর ! বৃষ্টি নামে কতো ॥

প্রবাস

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

যখন ষ্টেশন আমার চোখ থেকে মুছে গেল, তখনো তুমি আমার চোখে, হাওয়ায় সন্ধ্যালোকে একটি যুঁথির মতোন শুভ্রতায় রইলে। ফুলের বিচিত্র পাঁপড়ির বর্ণ মেখে আলো, স্নিগ্ধ সবুজ প্রান্তরে হারাল যখন, অন্ধকারে দলা দলা জ্যোৎস্না এল সুন্দর আদরের মতোন। বিস্তীর্ণ শূন্যতায় তোমার সান্ত্বনা আর তারাদের দুরন্ত গানের নীলোৎপলে ভালবাসামাখা আহ্বান শুনলাম—অন্ধের গর্ভ থেকে ঝিকিমিকি ইসারা মৃত্যুর মতো কাঁপতে রইল; তারপর বৃষ্টির ভিজে কণা এল, জ্যোৎস্নার ধূসর কান্নার মতো ঘুমিয়ে পড়ার আগে।

মৃত্যুর পরেও অতসী স্মরণ রৌদ্রে চমকাল বিন্ধ্যাচলে—জন্মান্তরের ঘুঙুর তীর্থ যাত্রীর পায়ে যেমন করে বাজে; কে যেন বড় চেনা, তারা প্রবাসের দরোজায় কথা বললে, হাসলে, মকাইয়ের শুভ্রতার দুধে পিছলে যখন পেড়িয়ে এলাম সেই দুঃসহ রৌদ্র—তার কাছে নিরন্তর ছায়াময়ী যে আমাকে ভোলায় তার কাছে।

হাওয়ার হরিণ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

যতদূর দেখতে পাই : হাওয়া
এদিক ওদিক মাঠে দ্রুত ব্যস্ত করে আসা যাওয়া।
কখনও কিশোর ক্ষণে ঠেলা দিয়ে সহজ উল্লাসে
হা-হা ক'রে হাসে!

আকাশের দক্ষিণ দুয়ার
আচমকা কখন খুলে দলে দলে ছিটকে এল ওরা;
প্রবল জোয়ার।

উত্তরস্থরী

আঁকাবাঁকা শিঙে শিঙে জঙ্গলের সরল পসরা
ছড়িয়ে মাঠের পরে মাঠ,
ছুটছে ওরা পার হয়ে সোনালী স্বর্ষের মত দিন।
সামনে দীঘি পেরুলেই নীল চাঁদ ম্লান রাজ্যপাট
নিয়ে বসবে। থামবে ওরা নিরাকার অজস্র হরিণ!

পিছুটান

কমলেশ চক্রবর্তী

পরিবাদ আমি জীবনে পেয়েছি প্রচুর
তবু পিছুটান স্মৃতির ধূসর পাত্রে ;
বৃষ্টির দিনে, দগ্ধ-আকাশ গাত্রে,
হানা দেয় তবু পুরোণো অন্ধ ময়ূর।

দিক-দেশ-কাল হয় আলো বিভ্রম,
পারাপার চলে একালে ওকালে নিত্য,
অশ্বের মত ধাবমান তবু চিত্ত—
স্মৃতির কণিকা, তা'কে পেতে এত শ্রম!

একালে যদিও বিশাল হৃদয় জোড়া
রয়েছে সুরভি, প্রচুর অংগসজ্জা
মনে তবু নাই একটুও হীন-লজ্জা,
প্রকাশেই চলে স্মৃতির পুকুর খোঁড়া।

'ওকালে আকাশ দিয়েছে আমাকে সুধা
এ যুগ শুধুই নিষ্ঠুর পরিবাদ'—
কখনো হয়নি একথা বলার সাধ,
যদিও আমার ও যুগ মেটালো ক্ষুধা॥

অতৃপ্তির রূপ

উৎপলকুমার বসু

গোলাপ তুই পুষলি বুকে কাঁটা
আমার ভালবাসাও হ'ল বিক্ষত
তবু গোলাপ কেউ তো নয় তোর মত !

প্রেমিকা আসে ভোরের বেলা বাগানে
লুটিয়ে ঝরে রাতের বাসি ফুল
কি দিয়ে ওগো রাঙাবে কালো চুল
শুধালে হাসে—একটি ফুল জানি ।

হায়রে, প্রেম তখনই তোরে ছলেছে
ফুরাবে জেনে রক্তে রাঙা প্রলাপ
মধুরা বলে আমি কি নই গোলাপ ?

বাগানময় কুয়াশা জড়াজড়ি
অচেতনায় কত যে কাল গেল
মধুরা কাঁদে এবার ছুঁড়ে ফেল
চম্‌কে বলি কোথায় তোর কাঁটা ?

ট্রিওলেট

সুরজিৎ কুমার দাশগুপ্ত

কিছু নেই, এত শূন্যতা বলো কি দিয়ে ভরাই !
অশ্লীল হাওয়া মাতামাতি করে । বৃষ্টির দিন ।
যে দিকেই ফিরি দেখি অবিরল বিষণ্ণতাই ।
কিছু নেই, এত শূন্যতা বলো কি দিয়ে ভরাই !

উত্তরস্থরী

সঙ্গী আঁধার কথা বলে নাকো বয়সে প্রবীণ।
নাচঘরে নেই আকাশিনী নটী রূপসী রঙিন।
কিছু নেই, এত শূন্যতা বলো কি দিয়ে ভরাই!
অন্ন.ল হাওয়া মাতামাতি করে। বৃষ্টির দিন।

অঙ্গার

পরিমলকুমার ঘোষ

প্রেমে অপ্রত্যয় তার চিরসঙ্গী বুঝি। অথবা সে
জীবন দেখেছে সেই সংশয়ের ত্রিকোন মুকুরে
যাকে লোকে ঘৃণা বলে। যদি সে কখনও ভালবাসে
পৃথিবীর কোন নারী তাকে সে সযত্নে দূরে দূরে,
দৃষ্টির আড়ালে রাখে। যেন তার সমস্ত সময়
আশঙ্কাকে ঘিরে আছে অনির্দিষ্ট, অহেতুক ভয়।

নিজেকে সান্ত্বনা দিতে বরং সে তীর্যক উল্লাসে
রাত্রির সহর টুঁড়ে কিছু মত্ত মুহূর্ত কুড়োবে।
তারপর, নির্বিকার ব্যস্ত দিন চেতনার পাশে
অনুতপ্ত উপস্থিতি ভুলে থাকতে সন্ধেবে উড়োবে
দুঃখ, প্রেম, সুখ, অশ্রু, অনর্গল, অস্থির খেউড়ে।
রুক্ষ চোখে লেখা থাকবে কতো যে মরেছে অঙ্গে পুড়ে॥

মুসৌরীর কবিতা

প্রণব মিত্র

১

আমি এখানেতে পঁচিশ বছর আছি
গতায়ু শ্রীমতী পুত্র বিদেশগত,
বললেন ডক্ ফাল্গুনী অধিকারী
সংহত বাক অভিজাত সংযত ;

মুসৌরীর কবিতা

আঁকাবাঁকা পথ, ওক-পাইনের সারি
বুনো ডালিয়ার উজ্জ্বল সফলতা
শৈবাল-দেহে রাস্তার বাহুলতা
পথের প্রান্তে একটু আলাপচারী ॥

২

এই ছিলো ফগ্, এই এলো রোদ্দুর
লালডিব্বার পথ বলো কতদূর
লাল নীল স্ল্যাকস্-পথিক-বধূর চোখে
আলো যেন সেই উজ্জয়িনীর ভাষা ;
এখানে কারুর মন ভরে নিকো শোকে,
এখানে বিগত বিস্মৃত অভিমান,
উজ্জ্বল খুশী প্রগলভ ভালবাসা
মেখে নিয়ে হোলো মুসৌরী ছানায়টী ।
হায়গো আমারো নেই কোন অভিমান
পাইনের চারা তুলে আনি মনে আশা
অভিনব হবে আমার পঞ্চবটী ॥

সেতু

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সব শিবিরের চূড়া পুড়ে যাবে নিঃসহায় ;
পিতামহ, আমাদের বৃদ্ধ বয়সের দেরি আছে ।
সমস্ত পুড়িয়েছি পিতা, বাকি ওই নগ্ন চূড়াগুলি—
নগরীর শেষ সৎ গৃহগত, কোনোরূপে বাঁচে ।
বেস্তালয়ে মাছি পড়ে । কেউ যেন টলে না সোহাগে ;
ধূলো গাদ পারা ফোটে, একসার চোখ ছোটো আলো
কাকে টানে মদ মাংসে ? পুরাতন হিংস্র নীল স্মৃতি ।
আমি সর্বনাশ থেকে দূরে নেই—বেঁকা, খণ্ড, কালো ।

কে সর্বনাশিনী ভয়, পাতকীর দুচোখের মায়া
আমাকে পোষ্যের মতো বিন্দু বিন্দু আদর যতনে—
তিলোত্তমা পাপী করে—নষ্টফল, প্রচণ্ড চটকানো।
কে সর্বনাশিনী ভয় ? পাপ দৃঢ় গিলেছি যখন !
পিতা, তুমি পুণ্য যতো নির্ভাবন পান ক'রে গেলে—
আমরা পানীয় বলে নদী থেকে গরল গণ্ডুষ,
আকণ্ঠ বোঝাই করি, মাতাল, ক্ষুধার্ত, শক্ত পাপে—
নির্লিপ্ত যোগীর মতো স্যাংটো দীর্ঘ শীতল বেহুঁস।

প্রেমের পাঁচালীগান আমি শুনে রুগ্ন, নিরুৎসুক।
(প্রণয়ে আশ্রিত যীশু, নিরস্ত্রেরা, বৃদ্ধ মহাশয়)
আমরা রক্তের মতো লাল কালো গম্ভীর লম্পট—
অধরোষ্ঠে স্রাব লাগে, নোন্‌তা বুনো কর্দমাক্ত হয়।

পৃথিবীর শেষ কটি শিবিরের চূড়া, জ্বলতে হবে।
অবরুদ্ধ যৌনতা দিয়ে খণ্ড খণ্ড ভুক্ত রমণীরা
নিষ্ফল আয়ুষ্কালে একটি মাত্র যুবক পেয়েছো।
দ্রুততম গান করো, শেষ গান, দীর্ঘ রতিক্রীড়া।

মহৎ পাপিষ্ঠ দেহ ভাসছে দেখো নোয়ার নৌকায়
পুরণো আগুন নীল, নদী নীল পরস্পর মিতা।

বিশ্বস্ত হাত

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে পরিচিত প্রীত হাওয়া আসে
তাকে বলি, যেয়োনাকো—আমি ভালো আছি :
আশ্চর্য খুসির মর্তে গভীরে সে হাসে
তারপর সেই হাওয়া সহজ উত্তাসে
বুকের আলোর মতো ঘোরে কাছাকাছি

বিশ্বস্ত হাত

সরষে শশার ক্ষেতে ঘুরি সারাবেলা
জানি সে এইতো আছে অবারিত নদী,
ঘাসে ঘাসে চমকানো উন্মোচিত খেলা।
রোদ্দুর মেড়েছে যেই অবাক একেলা,
খুঁজি তাকে মুক্ত হাওয়া ঘর পায় যদি।

অসুখ

জ্যোৎস্না ভড়

গভীর রাত্রিকে ভুলে যে যুবক শুতে গেল তার বিছানায়—

বেদনার সব মোহ ভুলেছে অনেক আগে, কেননা জীবন
অপরূপ বানবিদ্ধ, ভাঙাচোরা জীর্ণ স্তূপে যুবকের মন
বারে বারে ছড়া কেটে জানিয়েছে : অন্ধকার আকাশ-ছায়ায়
প্রেমের কঠিন স্পর্শ লজ্জার দুহাতে বেঁধে আর কত যাবে !

সারাদিন ঘুরে ফিরে আড্ডায় অনেক কথা এঁকেবুকে রেখে
এতক্ষণ ভুলেছিল জীবনের এতগুলো আহত সময়
এমনি গিয়েছে কেটে—কোলাহল পার্কে মাঠে ; এত অপচয়
দু'চোখে পড়েনি তবু। অনন্ত হৃদয় তার মরা ঘাসে ঢেকে
কখন রেখেছে তাকে—(হে আকাশ, যুবক কি সমুদ্রকে পাবে !)

তারপর একদিন কোনো এক যুবতীই টোকা দিল বুকে
যুবকটি ভুলে গেল একবার ভুগেছিল কঠিন অসুখে ॥

ত্রিকোণ

দেবব্রত চৌধুরী

সেতো তার পথে গেছে শেষে পৃথিবীর চিরন্তন
নীতি মেনে অন্য এক পুরুষের ঘরে যার আছে
মাটি, ভিটে, মোটা মাইনের টাকা, এখন এমন
পুরুষ কচিৎ মেলে ; সেওতো সুন্দরী—তার কাছে

উত্তরস্থরী

সঙ্গমের প্রার্থনায় বিজয়ী পুরুষ, চেয়ে আছে
অর্ধনীমিলীত চোখে, অত্যন্ত রমণে মগ্ন মন
তার। আর হুত দিন উন্মীলিত হয়ে পড়ে পাছে
অভয়ে সে নারী স্বপ্ন দেখে 'শিশু' সহজে এখন।

এবং অন্য কোন লোক মাতালের মতো নেশা ক'রে
একাকী নিভৃতে বাঁচে কবরের কংকাল ঘেটে
নিমগ্ন নিশুত রাতে। শুধু হৃদয়ের মাটি খোঁড়ে;
রক্তস্নানে মজেছে সে, সে একক সত্তা নিয়ে, ওরে
ধ্যান তার ভাঙবে নাকি? মহাতাপসের মতো হেঁটে
অন্ধকারে, বলো বলো তার মুক্তি হবে কোন ভোরে?

অভিজ্ঞান

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

যে-তুই নির্জনে আজ অন্ধকার অবয়ব নারী—
নদীর সন্ন্যাসী যাকে বলাৎকারে হানে অভিশাপ,
সে-তুই জননী জানি, সুদিনের স্বর্ষমুখী, তার-ই
আকাঙ্ক্ষায় কামুকের মুখে দিস্ কলংকের ছাপ।

আমি যে প্রেমিক তোর চিরস্থায়ী জীবনে মরণে—
এ আমার অঙ্গীকার। আজ শুধু কুঞ্চিত ললাটে
এ-যুগের সত্যবান মূর্চ্ছাহত যৌবনের বনে,
দিনের প্রত্যাশা আঁকি অন্ধকার রাত্রির মলাটে।

আজ তুই অন্ধকার, কলংকিনী মিথ্যা অপবাদে
অথচ আমিতো জানি—আমার অপার সান্ত্বনা,
জীবনে যৌবনে-প্রেমে, প্রত্যহের লক্ষ অবসাদে?
কাঞ্চনে মেলে না তাকে; ভালবাসা কখনো ভ্রান্ত না।

কল্যাণী হাতের স্পর্শে জানি তোর সাবিত্রী মহিমা
মৃত্যুকে সুদূরে রেখে খুলে দেবে আশ্চর্যের সীমা॥

আলোচনা-সাহিত্য

চিঠিপত্র—৬ষ্ঠ খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত। পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত। বিশ্বভারতী।

চিঠি কেবল একজনকে লেখা হয় এবং শুধু একজনেরই জন্য। সর্বসাধারণের দৃষ্টির বাইরে, সর্বক্ষণের ধূলিমাটির পৃথিবীর নেপথ্যে, কোনো এক অস্পষ্ট আলো-আঁধারের জগতে চিঠিটি যাঁর লেখা ও যাঁকে লেখা এই দুজনের দেখা হয়। সেটা অলৌকিক সাক্ষাৎকার। বিষাদ বা মধুর, চিঠির সুর যাই হোক্, সেই জগতের বাতাস একজনের শরীরের স্পর্শ-ই অপরের কাছে নিয়ে যায় না, সে-বায়ু বয় দুই হৃদয়ের বার্তা নিয়ে, কেবল দুটি মনেরই কাছে। কেবল একজনের জন্যই নিজেকে প্রকাশ করা, আর একজনের এমন নিভৃত ও বিশেষ আত্মপ্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া—এই দুটো ঘটনা প্রতিটি জীবনেরই একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। অপরের চিঠি পড়া ও সুরত-মত্ত ক্রৌঞ্চ বধ একই স্তরের পাপ। তবু একসময় অপরের চিঠি পড়তে হয়, জানতে হয়। সেটা তখন পাপ থাকে না। কারণ, সেই জানা চিঠির সংকলন পাঠককে সেই জগতে নিয়ে যায়, যেখানে দূর থেকে তিনি পত্র-লেখকের আর একটি নিভৃত রূপ দেখতে পান—আর তার সম্পর্কে নতুন একটা বোধ নিয়ে বর্তমানে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে দীর্ঘ আটাশ বৎসর ধরে যে-ছত্রিশখানা চিঠি লিখেছেন, তারই একটি সংকলন সম্প্রতি বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন। তারপরও সাতখানি চিঠি আছে—বিজ্ঞানীজায়া অবলা বসুকে লেখা। সবশুদ্ধ সঙ্কলনের পত্রসংখ্যা তেতাল্লিশ, যাতে ধরা পড়েছে কবিজীবনের আটত্রিশটি বৎসর।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমপত্র নেই। কেবল বন্ধুর কাছে লেখা চিঠির সংখ্যাও নগণ্য। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলনা। প্রথম জীবনে গুটিকয় মাত্র। পরে তাও নয়। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের চিহ্ন আছে চিঠিগুলোতে, তারপরের সম্পর্কের কিছুটা দূরত্বের-ও।

বধূ, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, দাদা, বৌদি, কন্যাস্থানীয়া—ইত্যাদিকে লেখা কবির অনেক চিঠির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। সেখানে আমারা কবিকে স্বামী, পিতা, ভ্রাতা—এই সমস্ত বিশেষ চেহারায় দেখতে পাই।

কিন্তু এমন অনেক কথা আছে, যেগুলো ওদের কাউকে বলা যায় না, অথচ বন্ধুকে বলা যায় স্বচ্ছন্দে; বন্ধুদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে কথা কইতেন, এ-বিষয়ে আমরা একেবারে অজ্ঞ। অথচ প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এ-সিদ্ধান্তে আমরা সতত পৌঁছই যে পারিবারিক দায়িত্ব-পূর্ণ সম্বন্ধের আলখাল্লা খুলেই বন্ধুদের দায়িত্বহীন বৈঠকে বসতে হয়। তখন-ই চেনা যায় লোকটি কেমন। রবীন্দ্রনাথ মানুষটি যে কেমন ছিলেন—এ-জিজ্ঞাসার জবাব আমরা এখনো পাইনি। জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্কলন তাই স্বভাবতই আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসার জন্ম দেয়।

সংকলনের ছত্রিশটি চিঠির মধ্যে প্রথম বাইশটি লেখা মাত্র চার বছরে—১৮৯৯—১৯০৩। বাকি চোদ্দটি অবশিষ্ট চব্বিশ বছরে লেখা। এই চব্বিশ বছরের মাত্র একটা চিঠি। তার মধ্যে আবার সবশুদ্ধ তের বৎসর (১৯০৪, ১৯০৬—৭, ১৯০৯—১১, ১৯১৫, ১৯১৮, ১৯২০, ১৯২৩—১৯২৫, ১৯২৭) একটি-ও চিঠি নেই।

বলাবহুল্য সব পত্র-সাহিত্যে যেরূপ, এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। এই আটাশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের বয়স বেড়েছে, পরিবেশান্তর ঘটেছে। মেজাজ বদলেছে। পদ্মা ছেড়ে তিনি বিশ্বভারতীতে এসেছেন। চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সেই ক্রম-পরিবর্তমান মনের পরিচয় স্বাভাবিক ভাবেই মেলে।

চিঠির সময়, সে-সময়ে দেশ বা সমাজের কোনো বিশেষ ঘটনা; কবির তৎকালীন সাহিত্যের পরিচয় চিঠিতে অভিব্যক্ত কবিমন-কে এভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে দেখা যেতে পারে :

১৮৯৯—১৯০৩ (পত্র সংখ্যা ১-২২) বাঙলাদেশে নতুনভাবে জাতীয়তার উন্মেষ হচ্ছে, শিল্প ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে, পরাধীনতা যে আত্মার জাগরণের পক্ষে ক্ষতিকর—তা সবার কাছেই ধরা পড়েছে। কবি লিখছেন কল্পনা (১৯০০) কথা ও কাহিনী (১৯০০) ক্ষণিকা (১৯০১) নৈবেদ্য (১৯০২)। সামগ্রিকভাবে

দেশে আর বিশেষ করে কবির মনে একটি পৌরাণিক ভারতের কল্পনা বিশেষ স্থান লাভ করেছে। চারখানি কাব্যগ্রন্থের মূল রস পৌরাণিক।

এই পর্বে লেখা বাইশটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে পৌরাণিক ভারতের প্রতিনিধিরূপে অভিহিত করেছেন। জগদীশচন্দ্র যাতে তাঁর গবেষণা শেষ না করে কিছুতেই দেশে ফিরে না আসেন—তার জন্য কবি বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজার সহায়তায় জগদীশ-চন্দ্রের অর্থসমস্যার সমাধানে অতিব্যস্ত। প্রতিটি চিঠিতে তিনি খোঁজ নিচ্ছেন কাজ কতদূর এগুলো। এই চিঠিগুলো পড়লে মনে হয় জগদীশ-চন্দ্র পৌরাণিক ভারতের তপোবনে একনিষ্ঠ গবেষক। জর্মানি, আমেরিকা সর্বত্র জগদীশচন্দ্র যেন ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করে আসেন, কবির এই-ই বিনীত নিবেদন ও একান্ত কামনা।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেখানেই তাঁর বিশ্ব-ভারতীর রূপদানে ব্রতী।

১৯০৫—৮ (পত্রসংখ্যা ২৩, ২৪,) বাঙলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা থেকে কবি হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিলেন। খেয়ার আধ্যাত্মিক চেতনায় মনের বেদনাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলেন: 'মগ্ন হলেম আনন্দময় অগাধ অগৌরবে।' গীতাঞ্জলি-ও লেখা চলেছে।

দেশের রাজনীতিক নীচতায় কবি ব্যথিত ও বিচলিত। গৃহবিবাদে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা কবি দেখতে পাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনে একটির পর একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটছে। স্ত্রী মরে গিয়েছেন, মধ্যমা কন্যা রেণুকা ১৯০৩ সালে আর কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্র-নাথ ১৯০৭ সালে মারা গেলেন। দেশ পরিবার সবার কাছে থেকেই রবীন্দ্রনাথ আহত।

২৩ আর ২৪ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বিষণ্ণ, ঈষৎ ক্লান্ত, কিছুটা আত্মমুখী, নিজের মনের কথাই যা-লিখেছেন, জগদীশচন্দ্রের কাজ সম্বন্ধে খুব উৎসাহ-ও আর নেই। সব বিষয়ই নিরুৎসুক।

১৯১২—১৭ (পত্র-সংখ্যা ২৫—২৯) রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা ও লণ্ডন ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমা, চিত্রাঙ্গদা, ডাকঘর—ইত্যাদি। বিদেশে কবিকে নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। আমেরিকাতে

কবি বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন। লণ্ডনে নিজের গ্রন্থ পড়েছেন। অবশেষে ঐতিহাসিক নেবেল পুরস্কার লাভ।

পাঁচটি চিঠিতে কবির বিদেশি সমালোচনার প্রতি ঈষৎ উন্মুখ মনের পরিচয় মেলে। অবশেষে 'খ্যাতি প্রতিপত্তির ঝোড়ো হাওয়ার' মধ্যে কবি অন্যমনা—'একটুখানি নিভৃতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি'।

১৯১৬ সালে কবি জাপানে ও আমেরিকায় গেলেন। ইতিমধ্যে জগদীশ-চন্দ্রও বিশ্বস্বীকৃতির মর্যদা পেয়েছেন (পত্র ২৭)। কবির মন ও বৈজ্ঞানিকের মন দেশের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছায় উন্মুখ (২৮)।

কবি তবু ক্লান্ত। সব কিছু থেকে অবসর নিতে চান। বাইরে কবি বিশ্বের, ভেতরে বঁড়ো একা (২৯)।

১৯১৯—২২ (পত্রসংখ্যা ৩০—৩২) রবীন্দ্রনাথ এখন খ্যাতি ও অখ্যাতি, নিন্দা প্রশংসার উর্ধে, দেশের হৃদয়াসনে আসীন। তাঁর চিঠিগুলিও চিঠির মর্যাদা ধীরে ধীরে হারাচ্ছে। তার কারণ প্রথমেই ব্যাখ্যা করা গেছে। তবু এরি মধ্যে 'অব্যক্ত'র জন্য কবির প্রশংসা, বিশ্বভারতীর গঠনতন্ত্র রচনা ইত্যাদি কথার মাঝখানেও ৩০ সংখ্যক চিঠিটি পুরনো দিনের কথাগুলো মনে করিয়ে দেয়।

১৯২৬—২৮ (পত্রসংখ্যা ৩৩-৩৫)—কবি ১৯২৬ সালের মে মাসে কিছু-দিনের জন্য বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ডিসেম্বরে ফিরে এসেই জগদীশ-চন্দ্রকে লিখছেন—"অবশেষে দেশে এসে পৌঁছলুম।" কিন্তু "চারিদিকে ক্ষুদ্রতা ও বীভৎসতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।" জগদীশ-চন্দ্র কবিকে Nervous mechanism in plants—উৎসর্গ করেছেন। ৩৩ নং পত্রের শেষে কবি লিখছেন "তোমার আশ্চর্য কীর্তির বিবরণ মাঝে মাঝে পড়ি।" রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের আত্মিক বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত স্মৃতি নির্ভর হয়েই বেঁচেছিল অনেকটা, অবিশ্যি তা-ছাড়া উপায়-ও ছিল না। দুজনই তখন সমষ্টিক শ্রদ্ধার এতো উচ্চতায় অধিষ্ঠিত, যে ব্যষ্টিক আত্মীয়তার সমতলে নামা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

৩৬ নং চিঠিটির তারিখ নির্ণয় করা যায় নি বলে, সর্বশেষে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

'আর্যা' অবলা বসুকে লেখা সাতখানি চিঠির মধ্যে আগ্রহের বিষয় প্রচুর

আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় চিঠিখানি যথাক্রমে ১৯০১ ও ১৯০২ সালে লেখা। সম্বোধন 'মাননীয়াসু', খুব ভদ্রতামূলক চিঠি। জগদীশচন্দ্রকে লেখা প্রথম দিকের চিঠিগুলিতে বৈজ্ঞানিকের গবেষণা বিষয়ে কবির উৎকণ্ঠা এ-পত্রগুলিতেও আছে। তৃতীয় পত্রটি ১৯০৩ সালে লেখা সবই পূর্ববৎ। কেবল প্রথমদিকে কবি যেন আরো একটু আন্তরিক "বিদ্যালয় আজ খুলিয়াছে।··· এখন হইতে এই কাজের মধ্যেই আমার বিশ্রাম—এই কাজের মধ্যেই আমার শরীর মনের চিকিৎসা। কাজ হইতে দূরে গিয়া কি আমার মন শান্ত হইবে?"

চতুর্থ পত্রটি ১৯০৬ সালে লেখা। আর্যার সঙ্গে কবির সম্পর্ক যে কতো আন্তরিক আংশিক উদ্ধৃতি-ই তার পরিচয়: "আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন, আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলাম—তাঁকে হারানোর পর দ্রুতপদবিক্ষেপে আমার বয়স বেড়ে উঠেছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে হয়রান্ হয়েছি। কিন্তু আপনার কাছে এরকম নৃশংসতা প্রত্যাশা করি নি।··· আমাকে যদি 'আপনি' বলা ছেড়ে দিয়ে "তুমি" বলবার চেষ্টা করে কৃতকার্য হতে পারেন ত উত্তম—যদি অসুবিধা বোধ করেন তবে পত্রে শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি বিভীষিকা প্রচার করবেন না। তার চেয়ে আমাকে আপনি 'কবিবরেষু' লিখবেন।"

ষষ্ঠপত্রটিতে পল্লীসংগঠনের বিবরণ আছে। সপ্তম পত্রটি দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসর পর লেখা, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বিজ্ঞানীজায়াকে সান্ত্বনাপত্র।

আর বিশেষ আলোচনা করে লাভ নেই। কারণ, যিনি এই পত্রসঙ্কলন পড়বেন না, তিনি জানতে পাবেন না, কবি রবীন্দ্রনাথের সহৃদয়, বন্ধুবৎসল, নিতান্ত ব্যক্তিগত একটি রূপ কত সুন্দর ও মহৎ। অজ্ঞাত ও অখ্যাত কবি খ্যাতি ও সম্মানের উন্নত শীর্ষে স্থান পেলেন, তার পরও তিনি কতো বিষণ্ণ, কতো ক্লান্ত, ব্যক্তিগত সম্বন্ধগুলো তাঁর কাছে কেমন করে হারিয়ে যাচ্ছে—সেই ইতিহাস এই তেতাল্লিশ খানা চিঠির মধ্যে, কখনো স্পষ্টভাবে, কখনো আভাসে, কখনো নীরবতায়—লেখা রয়েছে। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে কবির কবিতা, অন্যান্য রচনা ও অন্যান্য পত্র পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থপরিচয়ে প্রতিটি পত্রের বিশেষ বিবরণ আছে। রবীন্দ্রনাথের দুয়েকটি রচনার উৎস এই চিঠিগুলিতে আবিষ্কার করা যেতে পারে। জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে।

উত্তরসূরী

এমন সুসম্পাদিত একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে এবং রবীন্দ্র জীবনের একটি অর্ধজ্ঞাত অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধিৎসা তৃপ্তির সুযোগ দিয়ে বিশ্বভারতী আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

দেবেশ রায়

রবীন্দ্র মানস : অরবিন্দ পোদ্দার। ইণ্ডিয়ানা ॥ রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় : শচীন সেন। রীডার্স কর্ণার ॥ পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ : অমল হোম। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥

রবীন্দ্র সমালোচনার পক্ষে বিরাট বাঁধা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, কর্মজগতে তাঁর পরিচয় এত ব্যাপক এবং গভীর যে সমকক্ষ সমালোচক দুর্লভ তো বটেই এমন কি প্রত্যাশা বোধ করি বাতুলতা মাত্র। শুধু মাত্র কবিতা বা গদ্য রচনায় সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা দুষ্কর। তিনি শিল্পী হলেও কর্মী, জ্ঞানী হলেও ধ্যানী এবং তন্ময়তার যে উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিলেন, সে-উন্নতি একক জীবনে সম্ভব কিনা বিচার্য। তিনি যা রেখে গেছেন আমাদের পক্ষে তা এত দুঃসহ যে রবীন্দ্র প্রতিভার বিচারে হয় তাঁকে স্তুতি ও প্রসংশা দিয়ে ইতি করি, না হয় তাঁর উজ্জ্বল সূর্য সম প্রতিভাকে মসিলিপ্ত করার দুর্বল চেষ্টা করি। উভয় পদ্ধতি আমাদের অক্ষমতা অথবা রবীন্দ্র অগ্নিমান্দ্যের প্রকট প্রকাশ। তবু রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্লেষণের প্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন জানাবো এবং সে-বিশ্লেষণের সহৃদয় সমালোচনার আয়োজন করবো। "রবীন্দ্র-মানস" প্রণেতা অরবিন্দ পোদ্দার গতানুগতিক প্রথায় রবীন্দ্র-বিচারে ইতি না টেনে সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ-বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। এজন্য তিনি এমন অনেক অনেক কথা বলেছেন যে তত্ত্বে একমত হওয়া সকলের সম্ভব নয়। গুরুগম্ভীর আলোচনার দিন গত হয়েছে বলে যাঁরা আক্ষেপ করে থাকেন অরবিন্দবাবু তাঁদের কাছে মস্ত প্রতিবাদ। রবীন্দ্র মানস, রবীন্দ্র-হিউম্যানিজম, রবীন্দ্র এস্থেটিকস্ প্রবন্ধে তিনি বহু চিন্তাপূর্ণ কথা বলেছেন। পাঠক সহজে অরবিন্দ বাবুর কথায় সায় দেবেন না, তবু অরবিন্দ বাবুর উক্তি অনেককে ভাবিয়ে তুলবে। অবশ্য, "তাঁর পূর্ব সাধকদের মত তিনিও সমস্ত চরাচরে শুধু ভাবের খেলাই দেখেছেন। বস্তুকে দেখেননি।" অথবা "জীবন প্রবাহের সহিত

সম্পর্কহীন বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক সত্য একালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে তার মধ্যে পেয়েছে সত্য ; কিন্তু জঙ্গম জীবন সংগ্রামের আবর্ত কবিকে সমগ্রভাবে পায় নি—" ইত্যাদি মন্তব্য যথেষ্ট দায়িত্বের সংগে বলা হয় নি বলে আমার বিশ্বাস ; তবে বিশেষ আনন্দের কথা, কয়েকজন রবীন্দ্র-সমালোচক যেমন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করেছেন, তেমন স্পষ্ট যান্ত্রিকতা অরবিন্দ বাবুর রচনায় প্রকট নয়। ভাষার ব্যবহারে তাঁর শৈথিল্য অমার্জনীয়। চল্‌তি বাঙলায় প্রবন্ধগুলি লেখা অথচ মাঝে মাঝে এমন সব তৎসম তিনি ব্যবহার করেছেন যেখানে যে-কোন পাঠক হোঁচট খেতে বাধ্য। অরবিন্দ বাবু এদিকে মনোযোগী হলে রবীন্দ্র মানসের উৎকর্ষতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেতো সন্দেহ নেই। অন্যপক্ষে ডক্টর শচীন সেন রবীন্দ্র সাহিত্য পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্র চিন্তা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কাব্যের ভূমিকা প্রস্তুত করে। রবীন্দ্র কাব্যের ভূমিকা অংশটি বিস্তৃত এবং যথেষ্ট উদাহরণ সহযোগে তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক, যদিচ উপন্যাসের আলোচনায় তিনি যথেষ্ট কৃপণ। 'গোরা'র মত দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের আলোচনা মাত্র চার-পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করেছেন। উপন্যাস আলোচনায় শচীন বাবু অত্যন্ত দ্রুতগতি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়েছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় পুস্তকটি ছাত্র ছাত্রীদের কাছে মূল্যবান। "পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ" কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধ ঠিক নয়, লেখকের কয়েকটি ভাষণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লেখক প্রবীণ সাংবাদিক, সেজন্য লেখায় সাংবাদিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। ভাষা ব্যবহারে সেই ভংগী অতিমাত্রায় প্রকট। মাঝে মাঝে মনে হয় লেখক প্রথমে ইংরেজীতে ভেবে নিয়েছেন তারপর তার বাংলা প্রতিরূপ দিয়েছেন। অবশ্য ভাষণ বলে এগুলির দোষ তত ভয়াবহ নয়। "পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ" এ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানা যায় যদিও তিনি পুরুষোত্তম কেন এবং কিসে তার কোন সদুত্তর উক্ত পুস্তকে মেলা ভার। প্রথম প্রবন্ধটির নামানুসারে গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে অথচ অন্য প্রবন্ধগুলির সংগে পুস্তকের নাম শীর্ষক প্রবন্ধটির কোন যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না, তবে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের ব্যাপক পরিচয় পেয়ে আমরা লেখককে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কার্তিক লাহিড়ী

অবসান

হগো ফন্ হফ্‌মান্‌স্টাল্

উজ্জ্বল রূপালি বাষ্পে আলোকিত সারা উপত্যকা,
মেঘ-চোঁয়া জ্যোৎস্না যেন যদিয়ো এখন রাত্রি নয়।
আমার সমস্ত মৃদু ভাবনা যে গলে গলে মেশে
রূপালি রহস্যে এই। জীবনের তীর ছেড়ে আমি
ধীরে ধীরে ডুবে যাই সেই স্রোতে—স্বচ্ছ সাগরের।
সেখানের ফুলগুলি অনন্ত হৃদয়ে অপরূপ।
দাঁড়িয়ে ওষধি ঘন, তা থেকে নির্গত আলো এক,
গলানো ধাতুর মতো সোনালি রক্তিম,
উষ্ণ এক ব্যথা হানে। প্রান্ত হতে প্রান্তের অবধি,
শোনো, সেই উপত্যকা ভরে আছে বিষণ্ণ সঙ্গীতে। সেই গান জানি আমি,
কী মর্ম বুঝি না সে-গানের, তবুও সে-গান জানি :
সেই গানই স্বয়ং মরণ। মরণই তো গান হয়,
অতি সূক্ষ্ম অসাধ্য বুননে, অন্ধকারে ভরা, তবু উজ্জ্বল মধুর,
গাঢ়তম দুঃখের মতন।

তবু কী অদ্ভুত—

অনামী প্রতীক্ষা এক কাঁদে কেন আমার হৃদয়ে
নিঃশব্দে তা কাঁদে শুধু, জীবনের ঘরে যাবে ফিরে,
তাই কাঁদে,কাঁদে একা ; নীল সন্ধ্যা নেমে-আসা অনন্ত সাগরে
বিশাল সোনালি পাল-দেওয়া অতিকায় পোতে চড়ে
কোনোদিন আপন দেশের পাশ দিয়ে যেতে যেতে
যে-রকম কেঁদে ওঠে কেউ তার প্রিয়, অতি প্রিয় : তার আর পিতৃপুরুষের :
জন্মভূমি পানে চেয়ে। তার চোখে ভেসে ওঠে ফের সে সব পুরনো পথ :

অবসান

ফের বুঝি ভেসে আসে সে নদীর মর্মধ্বনি, লাইলাক-ঘ্রাণ
দেখে সে আবার, ছোট্ট শিশু হয়েছে নিজেই,
শিশুর আশ্চর্য চোখে বেলা ভূমে রয়েছে দাঁড়িয়ে,
একটু-বা ভীত আর কেঁদে কেঁদে লাল। দেখে সে আবার
খোলা জানালাটা তার, আলো-জ্বলা তার ছোট ঘর।
তবু সেই অতিকায় বিরাট জাহাজ ভয়ংকর নির্বিকারে ভাসিয়ে নিয়েই
যাবে তাকে
দানবিক পাল মেড়ে কালো নীল জলের উপরে॥

অনুবাদ : সুরজিৎ দাশগুপ্ত

'প্লেটেরো এ্যাণ্ড আই' থেকে

হুয়ান র‍্যামন হিমেনেথ

প্লেটেরো, আমি তো তোমাকে বলেছি, আমাদের শহরের আত্মা হলো সুরা, আমি কি বলিনি ? না : আমাদের শহরের আত্মা হলো রুটি। মোগেয়ের হলো গমের পাউরুটির মতো, ভেতর যার খণ্ড রুটির মতো সাদা, বাইরের দিক নরম ভূত্বকের মতো সোনালী।

দুপুরে, সূর্য যখন উচ্চতম হয়, শহরটি শুরু করে ধূমপান, গন্ধ নেয় দেবদারু আর গরম রুটির, গোটা শহর মুখ ব্যাদান করে, কখন তাকে মনে হয় রুটি-খেকো বিরাট এক মুখ। রুটিই জীবন। প্রতিটি জিনিষের সাথে আছে সে : তেলের সাথে, স্টু, পনির আর আঙুরের সাথে বিলায় তার চুম্বন আঘ্রান ; সুরার সাথে, স্যাপ, হাম আর তার নিজের সাথে, রুটির সাথে রুটি। আবার একক রুটিও হতে পারে আশার মতো, অথবা বিভ্রম জড়িত রুটির মতো।

বেকারীর ছেলেরা আসে ঘোড়ায় চড়ে, দাঁড়ায় প্রতিটি বন্ধ দরোজার সামনে। হাত তালি দিয়ে হাঁক দেয় :

রুটি ! রুটি !

তাদের নগ্নবাহু ধরে আছে ঝুরি মিষ্টি পিঠের সাথে সিকিরুটির আর রুটির তালের সাথে বড় রুটির পড়বার শব্দ শোনে কেউ।

তারপর আসে ভিখারী ছেলের দল, দরোজার ঘন্টি বাজায় অথবা ভারী কপাটে টোকা দিয়ে চিৎকারের স্বরে বলে, তাদের চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয় অলিন্দের নীচে :

এক টুকরো রুটি দিন দয়া করে !

অনুবাদ :
ফখরুজ্জামান চৌধুরী

আলোচনা

সমকালীন বাংলা কবিতার রূপ রস ও বৈচিত্র্য

[কিছুদিন পূর্বে সংস্কৃতি পরিষদের আহ্বানে বাংলাদেশের কবিরা মিলিত হয়েছিলেন এবং আধুনিক কবিতার রূপ, রস, বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য আলোচনাগুলি প্রকাশ করা হোল।]

সঃ উত্তরসূরী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য :

(১)

কবির কবিতাপাঠ সমকালীন সাধারণ ঘটনা। তরুণ কবি যদি গদ্যরচনা মারফৎ নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা অকপটে ঘোষণা করেন, ভবিষ্যতে তাঁর কবিতাকে বুঝতে সুবিধা হবে। জীবনানন্দ দাশ-কে বুঝতে হ'লে তাঁর কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অবশ্য পঠিতব্য। পরিষদ-এর আহ্বানে যে তরুণ কবিরা আজ নিজেদের কবিতা বিষয়ক বক্তব্যকে উপস্থাপিত ক'রেছেন, একদিন তাঁদের কবিতার স্বরূপকে এই বক্তব্যই হয়তো পাঠক-হৃদয়ে স্বচ্ছরূপে প্রতিভাত করে দেবে।

(২)

আমি প্রেরণায় বিশ্বাসী। জীবনে এমন মুহূর্ত কদাচিৎ আসে যখন কবিতা আপনা থেকেই কবিকে নির্বাচন করে, কথাগুলি আসে তখন নিজের ইচ্ছানুযায়ী ; কবি সে সময় ভাবের ও ভাষার প্রকাশের মাধ্যম মাত্র।

আমার একটি মাত্র কবিতা এমনি এক লগ্নের রচনা যখন কবির চেতনা এবং কবিতার চেতনা এক হয়। (এই কবিতাটি তিনি সভায় পাঠ ক'রে শোনান। 'শর্ব্বরীর জন্যে' : পদাবলী ॥) এইরূপ প্রেরণাজাত মুহূর্ত থেকে যে কবিতার জন্ম হয়, কোন কবির রচনাতেই তার সংখ্যাধিক্য ঘটে না। কেউ জীবনে একটি কবিতা, কেউ বা কয়েকটি মাত্র লিখতে সমর্থ হন।

জীবনানন্দের সমগ্র কবিজীবনে এমনি মুহূর্তের সমাবেশ কয়েকবার ঘটেছিল ব'লে আমি মনে করি। অন্যত্র আলোচনায় এই মুহূর্ত বা মুহূর্তগুলি সম্পর্কে তিনি আমাকে ব'লেছিলেন : 'এদের অবচেতন অবস্থার সঙ্গে মেলানো ঠিক হবে না। বরং এরা হচ্ছে মানবজীবনের প্রকৃত সচেতন মুহূর্ত, অথবা সু-চেতন অবস্থা।' এই কবিতা, যাকে আমি সত্যিকারের কবিতা বলি, কখনই চেষ্টালব্ধ হ'তে পারে না। আমার 'শর্ব্বরীর জন্যে' কবিতাটির একটি শব্দও আমাকে ভবিষ্যতে পরিবর্তন ক'রতে হয় নি, তারা যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই র'য়ে গেছে। সচেতন অবস্থায় কবিতাতে অক্ষর ও শব্দের পরিবর্তন যদি বা কখনো অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, এই কবিতাতে তা সাধ্যই নয়।

অরবিন্দ পোদ্দার :

(১)

কবিতা এবং কবিতার পাঠক যখন কোন অনুভাবে একাত্মীয় হন, তখনই প্রকৃত রসাস্বাদন ঘটে। অবোধ্য বা দুর্বোধ্য কবিতা—কথাটি আজকাল প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, যদিও যে-মানসিক ব্যবধানের ফলে এইরূপ কথার উত্থাপন ঘটে তার অবসান ঘটানোর দায়িত্ব কবির নয়, পাঠকের। কোন কবি স্বেচ্ছায় অবোধ্য বা দুর্বোধ্য হন না। কখনো বা ভাব ও ভাষা প্রকাশের অস্পষ্টতায় এমন ঘটে ; কিন্তু তার চেয়ে বেশী সংখ্যক কবিতা, দুর্বোধ্য ব'লে যাদের দুর্নাম, এবং সত্যিকারের সার্থক কবিতা—যাদের রসাস্বাদনের অনুভব বা মন নেই তাঁদের কাছে প্রকৃত আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না।

জীবনানন্দ, যিনি বাংলাভাষার একজন মহৎ কবি, এমন কিছু কবিতা লিখেছেন, যাদের সম্পূর্ণ অর্থ আমার অনুভবে এখনো স্বচ্ছ নয়। যেমন তাঁর 'বিড়াল' কবিতাটি। এই কবিতাটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আমি ক'রতে পারছিনা··· এখন পর্যন্ত না। কিন্তু আমার অনুভবে কবিতাটি এক অস্পষ্ট আলোড়ন তোলে···মনে হয় আমি যদি আরো গভীরে যেতে পারি, আমি বুঝবো কবি ঠিক কি কথাটি বলতে চাইছেন। এই মানসিক আদান প্রদানের মধ্যে যে ব্যবধান তাঁর জন্য আমি কখনই কবি জীবনানন্দকে দায়ী করতে পারি না। আমার চেষ্টা থাকবে, আমি পাঠাক হিসাবে আরো এগিয়ে যাবো, আমি কবিকে বুঝবো।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :

সেই কবিতাকেই আমি কবিতা বলি যা গভীরে যায়। সেই পাঠকই এমন কবিতার রস নিতে পারবেন যিনি মানসিক যাত্রার দিক থেকে একই গভীরতার পথ জানেন। যিনি ততদূর অগ্রসর হ'তে জানেন না, এইসব কবিতা তাঁর কাছে অনেক দূরের এক অস্পষ্টতা বলে অনুভূত হয়; এবং কখনো বা তেমন পাঠক সচেষ্ট হ'য়ে বলেন: কবির কবিতা অস্পষ্ট এবং দুর্বল। কবিকে এক সীমাবদ্ধ গভীরতার মধ্যেই স্থির থাকবেন অনেকে এমত পোষণ করেন। তাদের ধারণায় অধিকতর গভীরে যাত্রা করার প্রয়াস অকবি-জনোচিত; কেন না সেই ক্ষেত্রে পাঠক যেহেতু কবির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেন না, কবিতার আবেদন সেহেতু নষ্ট হ'তে বাধ্য। আমি বলি, সীমাকে অতিক্রম করাই কবিতা, এই প্রচেষ্টাই কবি মনের নিরিখ। এই সীমাবদ্ধতায় বিচরণ পদ্য সৃষ্টির কাজে লাগতে পারে হয়ত, কবিতার নয়।

সমকালীন তরুণ কবিদের প্রতি যাঁরা কাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগ আনেন, তাঁদের প্রতি আরেকটু ধৈর্য ও সংবেদনশীলতার আবেদন জানাই। এঁদের অনেকের মধ্যেই মহৎ কবির লক্ষণ আছে বলে আমি মনে করি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত :

আমাদের বাইরে জীবন ঘটছে; ঘটনাগুলি কখনো পাশাপাশি, কখনো একের পরে এক। আমাদের ভিতরে জীবন বইছে, যেখানে স্রোতের সঙ্গে সৈকতের সম্পর্ক নিবিড় অভিমানের, ভালোবাসার। আমাদের ভিতরের জীবন বাইরের বিচ্ছিন্নতা ও বিশ্লিষ্টতার সমস্ত ক্ষতির পূরণ দাবি করে। এখানেই কবিতার শুরু। জীবন ও কবিতা দুঃখ সহোদরা, অথচ জীবন কবিতাকে তার স্বাধিকার থেকে এইজন্যেই সরাতে পারছেনা যে, কবিতা হ'লো পরিক্রত জীবন।

আমরা প্রত্যেক সময়েই একটি মুহূর্তে বাস করি। এই মুহূর্তটিকে বলা যায় The abiding moment—আমাদের জীবনের অতীত মুহূর্তগুলির প্রাণাবশেষ কিছু-না কিছু এই সদ্যস্পন্দিত মুহূর্তের চূড়ান্তে রয়ে যায়। এই মুহূর্ত থেকে পরবর্তী মুহূর্তের সঞ্চরণ পথটিকে মেনে নিলে জীবনের একটি অক্ষুণ্ণ

প্রবাহের ধারাবাহিকতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই স্বীকৃতি থেকেই আখ্যায়িকা বা narrative কবিতার জন্ম। একথা সন্দেহাতীত যে, লংফেলোর দৈর্ঘ্যসর্বস্ব কাহিনী-কথন এবং ব্রাউনিঙের বাক্‌প্রস্তুতি এ দুয়ের মধ্যে শেষের দৃষ্টান্তই আজ আমাদের বেশি টানে ; এই আকর্ষণের পটভূমিকেই আধুনিকতা বলা যায়। অনন্ত এবং মুহূর্তের দ্বন্দ্ব, calssicism ও empiricismএর বিরোধাভাস। লিরিকের ক্ষেত্র হ'লো ঐ দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত ও একাগ্র মরীয়া মুহূর্ত। আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত ও অবিদিত ভবিষ্যতের মধ্যস্থ অস্থির অভিজ্ঞান তত্ত্বভাব থেকে মুক্ত হ'লে তবেই তা লিরিকের সম্মান পায়। আমাদের ব্যক্তিস্বরূপ বহমান জীবনকে লিরিকের মধ্য দিয়েই সব চেয়ে সহজে আলিঙ্গন করতে পারে এবং এখানেই বোধ হয় জীবন ও শিল্পের পরম মুক্তি।

লিরিক কবিতায় আমার আদর্শ মন্ত্রের রহস্য, মন্ত্রের সংহতি ; আমি মন্ত্র ও সূত্রের পার্থক্যের উপরে জোর দিতে চাই। সূত্র সংক্ষিপ্ত, মন্ত্র সংহত। সূত্র জীবনকে সামান্যীকরণ বা generalisation এর নিরঞ্জন রশ্মিতে সংকুচিত করে, অর্থাৎ জীবনের বৈচিত্র্যকে অপমান করে, ম্লান করে, বিকৃত করে। পক্ষান্তরে, মন্ত্র মননের মধ্য দিয়ে যায়, এবং শেষে মননের গুরুভার থেকে আমাদের বাঁচায়। প্রাণের ভিতরে অনুভূত মননের অক্ষয় কস্তুরী হ'লো মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করছি :

অস্তি সন্তং ন জহাতি,
অস্তি সন্তং ন পশ্যতি,
দেবস্য পশ্য কাব্যং
ন মমার, ন জীর্য্যতি। (বেদ)

এর অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায় :

তিনি তো কাছে ঐ, কী অনিবার্য ;
তিনি তো ঐ তবু কি সে অদৃশ্য !
দেখো রে দেবতার অমৃত কবিতা
মরে না কোনোদিন, জীর্ণ হয়না।

আমার মনে হয় ছদ্মবেশী Symbolist কবিতা কখনো কখনো অনুষঙ্গ থেকে একেবারে বিবিক্ত হবার চেষ্টায় আরেক রকম সূত্র কবিতাতে পর্যবসিত হ'তে চায়। ভাষা মাত্রই সঙ্কেতাশ্রয়ী, কবিতার ভাষা সেই সঙ্কেতকে স্বাশ্রিত করে।

কিন্তু বহিরনুষঙ্গ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেঁকে নিতে থাকলে সঙ্কেতও হয়তো তার সাঙ্কেতিক অনিবার্যতা হারায় অর্থাৎ সঙ্কেতের ছায়াকুল হারিয়ে নীরক্ত বিবর্ণ সূত্র পরিণত হয়। কিন্তু যথার্থ symbolism হ'লো প্লেটোর সেই মৌল জীবন, প্রাথমিক ও আত্মশুদ্ধ জীবন, আমার প্রলোভন তারি দিকে প্রসারিত।

আখ্যায়িকা কবিতা একা একা আজ আর হয়তো বাঁচতে পারবেনা। কিন্তু ঘটনা ও লিরিকের মিলনে Dramatic lyrics ও কাব্যনাট্য দুয়েরই সম্ভাবনায় আমি আস্থা রাখি। বৈষ্ণব পদাবলী আমার এই আস্থার আশ্রয়-স্থল; পূর্বরাগ থেকে 'অভিসারে' যে-জীবন উদ্যত, তারি বিচলিত সমাপণ 'মাথুরে'। এই উত্থানপতন কবিতা ও নাটকের মনাঙ্গীভাবনে মীমাংসিত।

'Trouvère' বা 'Minstrel'রা যে জীবনকে ছুঁয়েছিলেন, তা হ'লো লোকনৃত্যের ঢেউকে প্রথম অস্মিতা বা individuality-র প্রাণময় আলোয় আলোকিত করার উদাহরণ। তাঁদের শুশ্রূষায় দেখা গিয়েছিল যে ব্যালাড কবিতা হলো নাচ গান ও কবিতার ত্রিবেণীশিল্পের জননী। আমি এই ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্নধারাতে বিশ্বাস করি এবং সবলা জননীর রুগ্ন শিশুর মতো দূর থেকে আরোগ্যের স্বপ্ন দেখি।

যে জীবনকে আমি ছুঁতে পারিনা তাকে ছুঁতে পারলে আমার কবিতা তথা আমার জীবন পবিত্র হবে। জীবন হলো ঈশ্বরের হাতের রুদ্রাক্ষমালা; তাঁর আঙুল কেবলি ঘুরে ঘুরে চলেছে আর একটি কেন্দ্রে গিয়ে সেই আবর্তন সার্থকতা পাচ্ছে। মানুষ প্রকৃতি ও জীবজগতের জীবন এই পরিবর্তন ও আবর্তনে চঞ্চল, চিন্ময়। পরিবর্তিত, আবর্তিত, কেন্দ্রিত জীবনের আহ্নিক ও বার্ষিক গতিকে কোনোক্রমে ঈষৎ স্পর্শ করতে পারলে আমার কবিতা আর কিছুই চাইবে না।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় :

অনুষঙ্গের সঠিক পুনঃপ্রকাশে যথাযথ চিত্রকল্প ব্যবহার—আন্তর্ভৌম সাহিত্যের ভিতরমহলে এক বয়সিনী প্রতিভা। সুতরাং সুদক্ষিণা বঙ্গসাহিত্যে তা' যে স্বভাবতই অতিমাত্রায় বর্তিয়েছে, এবিষয় দ্বিমতের অপেক্ষা রাখেনা। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ওই উত্তরাধিকার যে ততোধিক সত্য, একথারও প্রতিবাদী যুক্তি একান্ত দুর্লভ।

অনুষঙ্গ পরিবেশ মুখাপেক্ষী। এবং সমাজ নির্ভর। তাই যখন পঞ্চম ষষ্ঠ শতকে ওয়েলশ-ব্রিটন-স্কট্‌ল্যাণ্ডে সম্রাট আর্থার ও তাটিজার্ন-এর রাজসভায় দরবারে তৎকালীন খ্যাতিমান মার্লিন-এর অদ্ভুত গাথা ও উপকথাগুলির প্রভূত সমাদরের কথা শুনি, তখন ঘটনাটির সময়োচিত যৌক্তিকতা বরং আমাদের সাগ্রহ দৃষ্টি টানে। এমনকি সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বহুমুখেই শোনা যেত মার্লিন-এর নাম। যুগ পরম্পরায় এখন তা স্মরণীয় এক টুকরো ইতিহাস হয়ে আছে মাত্র। ভারতীয় সাহিত্যে বিভিন্ন উত্তরণ সংক্রান্ত ক্রমপর্যায়গুলির হিসাব-খতিয়ান অনেকেরই পক্ষে সম্ভব, অন্তত সাহিত্যে আকর্ষিত সুজনেরা উক্ত ভাবনায় যথেষ্ট অবহিত আছেন। অর্থাৎ অনুষঙ্গের বিচক্ষণ সম্পৃক্তি যে কাল ছাড়িয়ে কালোত্তর প্রশংসা ও মনোনিবেশের লক্ষ্য হতে পারে এটা স্বভাবতই হৃদয়গ্রাহ্য প্রমাণ।

যদিচ হাক্সলি একদা 'কবিতার বিষয়' সম্পর্কিত আলোচনায় একটি ব্যক্তিগত আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন—'কবিরা কেন তাঁদের একান্তভাবে স্বদেশমগ্ন মনটিকে ঈষৎ বিস্তৃততর করে ঘরের নিবিড় সীমারেখা পার হতে পারেন না' অর্থাৎ বিশ্বভুবন মেলা যে বড়ো একটি আলো-উজ্জ্বল সীমাহীনতা আছে বা উল্লসিত দিকবিজয়ের যে উৎসব তাঁদের অনির্বান নতুনের নির্দেশ দিতে পারে, তা কেন অধিকাংশ উচ্চপ্রশংসিত জনপ্রিয় কাব্যে অন্তত সামান্যের অধিকারও রাখতে পারেনা। এই যুক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ভাবনার প্রতিফলন নয়। কারণ আমরা জানি পৃথিবীতে এযাবৎ যতগুলি লোকরঞ্জক মহাকাব্য ও মহৎ কাব্য রচিত হয়েছে তাঁর সত্তর ভাগের অনুপ্রেরণা হলো দেশ, মাটি ও সমকালীন মানুষের রক্তের অনুভূতি; এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্রাট সামন্তের বীরকাহিনী আশ্রিত। এই সব রচনা অনুধাবন করলে মনে হয়, বেশির ভাগই রচিত হয়েছিলো গণ-উচ্ছ্বাসকে বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে উন্মুক্ত করার প্রয়োজনে। উদাহরণ স্বরূপ অনায়াসে হাজির করছি, ঋকবেদে ব্যবহৃত জাতীয় যুদ্ধের ললিত নির্দেশের কথা, আমাদের দেশজ বীরগাথাগুলি ও বিদেশের বার্ডদের নিপুন বাকপদ্ধতি দ্বারা দেশপ্রেম ও উপদেশের অদ্ভুত কাহিনীসহ গণমস্তিষ্ককে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রস্তুত করে তোলা, উত্তর ইয়োরোপীয় ও আদি আর্যদের উৎস থেকে প্রসবিত প্রাচীন গ্যালিক গায়কদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় উচ্চ সম্মানিত হতে দেখা, গ্রীসের হোমার

যুদ্ধের প্রতি হোমারের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন, আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারত, এমনকি মাইকেল-নজরুল কাব্য পর্যন্ত একই বাচনভঙ্গির ও বিষয়ের বিস্তৃতি। এই নমুনাগুলির মূল কথাটি যেন আরোও কঠিন আকার পায় যখন আমরা সপ্তম শতকীয় Cnedmon-এর উক্তিতে জানি, গভীর মানবিক প্রেমের আন্তরধ্বনে রঞ্জিত বিশ্বাসী হওয়া উচিৎ কবিতার অনুষঙ্গ ও পরিবেশ।

তাই প্রারম্ভেই বলে নিয়েছিলাম, অনুষঙ্গের ভাগ্যনির্দেশ পরিবেশ ও সমাজ-নির্ভর। তদর্থে স্বভাবতই বিশশতকীয় মননধর্ম যে শিল্পবিপ্লব, স্তরসংগ্রাম ও যন্ত্রবিজ্ঞান আরোপিত জটিল বৈচিত্র্যের দ্বারা আমূল প্রভাবিত হবে, এটা সহজস্বীকার্য। অতএব 'মানুষ' বলতে সেই অভ্যস্ত একত্রিত ছবিটির ধারণা আর তেমনটি থাকছে না। প্রত্যেকটি মানুষ একক সংগ্রামী শিকড়ে আলোর আকাঙ্ক্ষা করে। এবং একত্রে সমগ্র সমাজ ছড়ানো তৃপ্তির রঙে সমন্বিত আনন্দের হ'তে চায়। সমাজ যেন রৌদ্রের মতো বিভিন্ন মননের আধারে রূপাশ্রিত মুক্তির প্রার্থনা করে। প্রত্যেকে নিজের নির্জনে মুক্ত, এবং অরণ্যের অথবা নিসর্গের অন্য ঘন ঐকতানে সুস্থ গাম্ভীর্যে যুক্ত হতে চায়। বিশশতকীয় মনন তাই মানসকূটের দোলাচলে আশ্চর্য অসহায়ভাবে দুর্বল। তবু তার দ্বিতীয় এক চেতনা ও বোধের কাজ সমান্তরাল স্রোতের মতো চলে। একই হাওয়ায় বা আনন্দের অনুভবে দাঁড়িয়ে কেউ মনে করেন তাঁর মৃত্যু বেশি সুখের, এবং কারো দ্বিতীয় জন্মলাভের অনুপম চেতনার মতো এক অবিমিশ্র খুশি লাগে। নিসর্গের সমারোহের ভিতরে কেউ ক্রমাগত অভিমানের আহত ভারি পা ফেলে ফেলে হেঁটে যান অন্যমনে, অথচ সেই রঙেরই সামাজ্যে কারো-বা অপর বোধিলাভ হয়।

অন্ধকার কলরবের, অথবা নিমগ্নতার প্রশ্নটি স্বভাবতই আধুনিক কবিমনে বিশেষ অর্থবহ। আধুনিক কবিতা তাই প্রাচীন বনিয়াদে ভালপালা মেলা এক প্রবৃদ্ধ অশথের নিবিড় রহস্যময়তা, হাওয়ার বেপথু আমেজে সতত মর্মরিত রৌদ্র বর্ষার, আবেগে অবিন্যস্ত কারুকার্যের মতো। আলো অন্ধকারের স্পর্শপ্রবণ ইন্দ্রিয়ভোগে অনেক আধুনিক কবিই তাই এককপরিক্রমায় ক্লান্ত করুণ।

প্রাচীন 'ইলিয়ান হার্প' যন্ত্রের প্রবাদটি বোধকরি জানা আছে। তবু বিশদ জ্ঞাতার্থে নিবেদন করি, যন্ত্রটির একটি স্বয়ংক্রিয় বেজে ওঠার গুণ ছিলো। গা-আলগা বাতাসের অদৃশ্য হাতে আপনি বাজতো যন্ত্রটি, এবং

তার উদ্ভূত শব্দের মায়াবী মাধুরী মুগ্ধ করতো পরিবেশ, কস্তুরীমৃগের মতো। কবিদের সঙ্গে এই তুলনাটি মনে হয় যথার্থ। পরিবেশের হাওয়া তাকে বাজায়। তফাৎ শুধু তার দ্বিতীয় যন্ত্রটির উপস্থিতি, যেটি তার নির্বাচনদক্ষ মন। এই জ্যোতির্ময় যন্ত্রটির জন্ম যে, চেতনার মন্ত্রপূত অবাকুসুম অনুভূতি থেকে সেটি অনেকেই ভুলে যান। ব্যবহার করেন ইচ্ছামত, অর্থাৎ খেয়ালিপনার তিমিরে নিয়ে যান সেই কুমারী শুভ্রতাকে। কবিতাকে কিম্ভূতশিল্পের মোড়কে অহেতুক লেবেলআঁটা করে মৌলিকতার দাবী করেন। পাঠক হয়ত সময় বিশেষে নির্বোধ স্বীকার করতে পারি, কিন্তু অপাংক্তেয় নন। তাঁদের ওপর রচনার ফলশ্রুতি নির্ভর করে বই কি! চিলে কোঠায় রাখলাম সম্পদ, আর তার চাবিটিও রইলো আড়ালে; স্বীকৃতি হবে কীসে তবে। এই চাবিটি জনতার মধ্যে ছুঁড়ে দিতে যেমন বলিনা, তেমনই এই চাবিলুকানো কিম্ভূত চাতুরিও আমাকে বিরক্ত করে, বলতে দ্বিধা নেই। প্রসঙ্গতই জানাই, এ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্ট (Abstract Art) বা কিম্ভূত শিল্প অর্থে উদ্ভটত্ব বা নয় বক্তব্যহীনতা। পৃথিবীর যে ইম্প্রেশনিজম বা অভিব্যক্তিবাদ আমাদের আধুনিক কবিতার বিশেষ অংশ দখল করেছে তার বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকতে পারেনা, কিম্বা স্বল্পতম বাধা। যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে এই অভিব্যক্তি নির্ভরতা আমার পছন্দ। তবু কিম্ভূতত্ব বা অভিব্যক্তিধারা বোঝাতে আমরা নিশ্চয়ই কষ্টকৃত চিত্রকল্প ও ভাব অনুসঙ্গের বেখাপ্পা চাতুরী অবলম্বন করতে পারিনা। সেটা অসৎ কবিতার লক্ষণ। ইদানিংকালে এমন প্রচুর কবিতা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখছে, একথা অস্বীকারের নয়। এবং যথার্থভাবে ভাবনার। যে বক্তব্যহীনতা এই অকারণ আড়ালের সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে যখন পাঠকেরা দুর্বোধ্যতার অভিযোগ করেন, তখন কোন্ মঙ্গলবাচনে তাঁদের সন্তোষসাধন করা যায়?

পাঠকের পলায়নমুখী মনটিকে খামখা টানার চেষ্টা দেখতে বলিনা, সূক্ষ্ম শিল্পের রসে প্রশংসার অবুঝ মাছি আমাদের প্রার্থনা নয়; কিন্তু যে নিবিষ্ট পাঠক-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণত নিয়োজিত হয়েও একটি কঠিন লৌহদুরত্বেই সর্বক্ষণ অবস্থান, করে সে অদ্ভূত অন্ধকার দুর্গের বিশ্বাস যেন এই মুহূর্তেই বাতাস পরিবর্তন করে।

কবিতার জন্মদেশ যে, বক্তব্যের আতত রৌদ্রে ও মাটিতে, সেকথা যেন

আমরা ভুলে না যাই। এবং অনুরোধ করি একক বা স্বয়ংমগ্ন হ'লেও, তা যেন পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গের রঙ পায়। পাঠকের মনোরঞ্জন না করেও, যে বিচ্ছিন্নতার চাতুরী আমাদের মধ্যে অংশত সঞ্চারিত হচ্ছে, তার শীঘ্র বিলুপ্তি কামনা করি এই প্রসঙ্গে।

আলোক সরকার :

আমার কবিতার প্রথম বিষয় আমি। আমার কবিতার প্রথম বিষয় মানুষ। এই দুই আপাতপরস্পরবিরোধী উক্তির সমন্বয় সূত্র নির্ধারণ করা কর্তব্য। ব্যক্তিগত আমি বিস্তৃত অর্থে খণ্ডিত অথচ যথার্থ সম্পূর্ণ ঘরে সুস্থ। বিস্তৃত অর্থে যে-আমি মানুষ, সে বারেবারেই আমার ঘর ভাঙে এবং সংহত আপন ঘরও খুঁজে পায় না। সেখানে অচেতন দ্বন্দ্ব আছে, অচেতন দোলাচল আছে, পরিপূর্ণতার আন্তর আকাঙ্ক্ষা নেই।

মানুষ প্রকৃতি। প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে দেখি সেখানে বিবিধ রঙ, বিচিত্রিত রেখা অনাসক্ত অথচ সম্মিলনী প্রেমিক অভিভাবে প্রতিফলিত। প্রকৃতির সন্নিবিষ্ট বিবিধ রঙে নিয়মী সানন্দস্ত নেই। প্রকৃতির বিভিন্ন রেখার সন্নিবেশকে শিল্প-সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তারিফ করতে পারি না। প্রকৃতি যেন পুতুল-খেলার ঘর, পুতুলগুলো মস্ত বড়-বড়, রাঙা-শাড়ির দৈর্ঘ্যের কোনো হিসেবনিকেশ নেই। সেখানে ইচ্ছার, কল্পনার অসীম হৃদয়িক অবকাশ আছে, নেই পরিমিতি এবং সংহতি। মানুষ যখন প্রকৃতি, আমি যখন মানুষ, তখন বিশুদ্ধ আবেগের নির্দেশে পরিচালিত ; তখন এ-রঙের সঙ্গে ও-রঙ মেশাই, এ-রেখার পাশে ও-রেখা, তখন আমার সেই সুস্থতা নেই যে-সুস্থতা যুক্তিবাদী সচেতন ব্যক্তিগত আমার আছে, তখন আমার সেই সুস্থতা আছে যে-সুস্থতা স্বাভাবিকের, সাহজিকের, তার প্লাবিত সুন্দরতা, বিস্ময়, আনন্দের তরঙ্গিত উজ্জ্বলতা আমাকে নিরন্তর টানে।

আমি যেখানে নিরবচ্ছিন্ন আমি, সেখানে আমি মানুষ নই, অর্থাৎ প্রকৃতি নই। সেখানে আমার নির্বাচন আছে, বিবেচনা আছে, সেখানে আমি স্রোত নই, সেখানে আমি স্রোতকে দুইকূলে বাঁধতে শিখি। সেখানে আমি তন্ময় সংহত। যা-কিছু অতিরিক্ত তার প্রতি নির্মম, নির্মোহ—প্রতিবাদের বিপক্ষে প্রতিবাদ হই না, প্রতিবাদের সঙ্গে হয় মিতালি ক'রে তাকে ছন্দোময়

সমধর্মিতায় আনি, অথবা প্রতিবাদের উত্তাপ থেকে গা-বাঁচিয়ে নিজের ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে প্রদীপ জ্বালি।

এই চার-দেওয়ালের জন্য অর্থাৎ সংহত অভিব্যক্তির জন্য আমার আন্তর আকাঙ্ক্ষা। ঝড়ের হাওয়ার মতো দামাল নির্বোধ অন্ধতায় আমি অন্ধকার গাছে-গাছে মাথা-কুটতে চাই না, অথচ আমার মধ্যে যে দামাল হাওয়ার উত্তরাধিকার তাকে বিস্মৃত হ'লে নিজেকে অপমান করি। সংহতি চাই সম্পূর্ণতার। এই সম্পূর্ণতার একদিকে আছে বিবেচনা, সচেতন নিয়মানুবর্তিতা—প্রকৃতির অনুরূপ তা নিয়ম নয়, নিয়মকে অতিক্রম করার কুশলী মন্ত্র তার জানা আছে। অপরদিকে আমার মধ্যে যে প্রকৃতি, যে মানুষ সে বারবার তার অস্তিত্বের ঘোষণা করে—তার নিজের নিয়মে সে আমার নিয়ম মানে না। আমি সত্যকে চাই, সত্যের খণ্ডিত রূপের প্রতি আমার অপরিসীম অনীহা। সেই সত্য মাত্র সংহতি নয়, বিশুদ্ধ আবেগের নির্দেশে তা থরথর, হয়তো বা আপাত-এলোমেলো।

উভয়ত সম্মিলনের সাহজিক সংহতিই আমার আকাঙ্ক্ষার। আমি এবং মানুষ যুগ্মতায় আমার কবিতায় অভিব্যক্ত। যে-আমি মানুষ সে অচঞ্চল নিয়মানুবর্তিতা, করুণ ধারাবাহিকতা, এক-ই সঙ্গে সে অচেতন যুক্তিহীন, বিন্যাসে শিথিল—বিশৃঙ্খল, প্রায় শিশুর আচরণের মতো সাহজিকতায় তার চারিত্র এবং মধুরিমা। এই সাহজিক সৌন্দর্যকে আমি মনে-মনে নিবিষ্ট প্রার্থনা করি অথচ এর বিপক্ষে সপ্রতিভ প্রতিবাদ আছে। সে প্রতিবাদ যে-আমি আমি, তার। সে ঘর গুছোয়, জানলায় রঙিন পর্দা রাখে, ফুলগুলোকে অপছন্দ করে।

আমার বাসনার এই উভয় প্রবণতা ভাবনার বিষয়ে মাঝে-মাঝে আমাকে যুক্তির পথ থেকে আবেগের দিকে টানে, কাব্যকলার, বিষয়ে পরিশীলিত ব্যবহৃত ছন্দের নিয়ম অমান্য ক'রে অন্য দ্বিতীয় সংহতিকে প্রার্থনা করে। যুক্তি এবং আবেগের ভিতর দিয়ে, অন্যভাবে, ছন্দোময় উন্মাদনার ভিতর দিয়ে আমি সংহত ফুটে উঠতে চাই। সমন্বিত সংহতিকে পাবার সাধনাই আপাতত আমার।

[২]

আমার কবিতার প্রথম বিষয় আমি। আমার কবিতার প্রথম বিষয়

ভালোবাসা। আমার কবিতার প্রথম বিষয় আমি তবু সমালোচকের ভাষায় কেউ যদি আমার কবিতায় আত্মকেন্দ্রিকতার অভিযোগ আনেন, তবে, নিজের অক্ষমতা-বিষয়ে সচেতন হ'য়ে আমি বিশেষ আহত হবো। আত্মকেন্দ্রিকতা, নিমগ্ন আত্মমগ্নতা আমার আকাঙ্ক্ষার নয়। আমি অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে স্বভাবত গ্রহণ করি, যে অভিজ্ঞতা আমাকে আমার পৃথিবী দিয়েছে, প্রকৃতি দিয়েছে, আমার প্রতিবেশী, বন্ধু-আত্মীয়েরা দিয়েছেন। আমি সময়ের সঙ্গে সমধর্মী স্রোতে, যদি বা অচেতন হয়, তবু চলি। কবিসত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার বিরোধ ইত্যাদি কথার মতো বহুব্যবহৃত শিশুশোভন উক্তি যদিও আমি করতে চাই না, যদিও আমি জানি কবিসত্তাই একমাত্র সত্তা, সামাজিক সত্তার প্রতিবাদও মাত্র তার উপকরণ, যদিও আমি জানি ব্যক্তি তার পরিবেশের অনেক উপরে হিরণ্ময় ঘরের আলো-ছায়ায়, শোকে-আনন্দে স্বাধীন, তবু আমার পৃথিবীর বন্ধু-প্রতিবেশীদের উপর, তাদের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-আকাঙ্ক্ষার প্রতি আমার অসীম ভালোবাসা রয়েছে। তাদের কথা আমি আমার কবিতায় বলতে চাই, কিন্তু তাদের সঙ্গে একাত্ম হই না, তাদের আমি আমার হৃদয়লীন করি। তাদের কথা আমার কবিতায় যখন বাজে, আমারই সুরে বাজে, তাদের সুরে নয়। বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়া নয়, বিশ্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করাতেই আমার আনন্দ।

আমার কবিতার প্রথম বিষয় তাই ভালোবাসা। ভালোবাসার পরিণতি মিলনে, সমন্বয়ে। ভালোবাসার সম্পূর্ণতায় দুইটি অস্তিত্বের উপস্থিতি প্রয়োজনের। সেই দুইটি অস্তিত্ব নিজেরই দুইটি উচ্চারণ হতে পারে, একটি হৃদয় এবং অপর একটি হৃদয় হতে পারে, একটি হৃদয় এবং বহু হৃদয় হতে পারে। আমি ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি এবং একই সঙ্গে সেই অস্তিত্বের যন্ত্রণা অনুভব করি। আমি ভালোবাসতে চাই, কিন্তু আমার ভালবাসার অনুরূপ আমি হতেও চাই না, পারিও না। আমি নিজেই জানি আমার সম্পূর্ণ উপস্থিতি নিয়ে আমি কখনো কারো সামনে দাঁড়াইনি, আমার ঘরের ভিতর বিবিধ সম্পন্ন দেওয়াল রেখেছি, এবং এ-ও জানি অপর জনও আমার মতো। একটি মানুষ অন্য মানুষের মতো নয়, সেই প্রসঙ্গ আপাতত দূরে রেখে, মানুষ কখনোই তার সম্পূর্ণতায়, নিজের কাছে বা অন্যের কাছে, উন্মোচিত হয় না, এই কথা বলবো। মানুষের সঙ্গে আমার যে সংযোগ, আমার দুইটি উচ্চারণের

সঙ্গে যে সংযোগ, আমার দুই সময়ের সঙ্গে আমার যে সংযোগ, তা নির্মিত। ভালোবাসার আলোর সোনালী সুতোয় সমন্বিত। সেই ভালোবাসার আলো অবশ্য একান্ত-ই আমার নয়, তাঁদেরও, তবু আমার ভালোবাসার প্রদীপে তাদের হৃদয়কে চিনে আমি আমার ঘরে নিয়ে আসি। আমার রঙে রঙিন করি।

এই ভালোবাসা আমি আমার জীবনে চিরন্তন পেতে চাই। আমি এবং আমার ভালোবাসা আমার কবিতা রচনা করে।

টেম্পল প্রেস, ৭নং ছায়রত্ন লেন, কলিকাতা ৯ থেকে অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCU
CENTRA
LIBRARY
UNIVERS

উত্তরসূরী

পঞ্চম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ॥ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৯১

মস্কৌ সহরে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ

[১৯৩০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ মস্কৌ থেকে প্রথম চিঠি লেখেন এবং সর্বপ্রথম সোভিয়েট দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা কয়েকটি চিঠিতে জানান। তার নিঃসঙ্কোচ অভিমত এরূপ : 'যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূল প্রভেদ'। তাঁর শেষ চিঠির তারিখ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩০। ২রা অক্টোবরের চিঠি বার্লিন থেকে লেখা অর্থাৎ তিনি রাশিয়া ভ্রমণ শেষ করে পশ্চিম য়ুরোপের দিকে রওনা হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ১১ই থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, এই স্বল্প কয়েকদিনে তিনি তাঁর প্রথমবারের ভ্রমণ শেষ করেন। এই সময়টুকুর মধ্যে তিনি একটি বিরাট নবজাগ্রত দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো এবং বিশেষ করে, শিক্ষা ও সমবায় পদ্ধতির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছেন চিঠিগুলিতে তারই বিবরণ বিধৃত। তিনি লক্ষ্য করেছেন 'সেদেশে ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব', 'মানুষে মানুষে ব্যবহার কি আশ্চর্য সহজ'—সেখানে আরো দেখলেন 'বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্ত করে এম-এ পাশ করবার মতন নয়'।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন : বাংলা দেশের চাষ-বাস, ক্ষেত-খামারে তাঁর লক্ষ্য ছিল সদাজাগ্রত। সুতরাং ওদেশের কৃষিব্যবস্থার প্রতি তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। বিপ্লবের মাত্র এক যুগ কাটতে না কাটতেই তিনি দেখলেন 'দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে'।

অবশ্য রাশিয়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ধারণা অবিমিশ্র নয়। শাসনবিধি ও রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে তিনি যে সে দেশের ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে-

ছিলেন একথা মনে হয়না। 'রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল'—এমন মন্তব্য করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। পরে আরো বিশদ করে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্ক্সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এসম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি'। রবীন্দ্রনাথের এবম্বিধ মতামত যে কত দূরদর্শী ছিল তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পেরে থাকবেন। তবু একথা সত্য, মোহমুক্ত দৃষ্টি ও অন্তরে বিশ্বমানবতার মৈত্রীভাব নিয়েই তিনি সেই বিরাট দেশ পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। সঃ উত্তরসূরী]

SPEECH DELIVERED BY RABINDRANATH TAGORE

At the Dom Soyuzov—September

I am highly honored at the invitation to appear in this hall and I am grateful to Dr. Petrov for the kind words he has said about me. I am thankful to the people for giving me the opportunity of knowing this country and experiencing the great work which the people are doing in this land. My mission in life is education. I believe that all the problems, human problems, they find their fundamental solution in education. And outside of my own vocation as a poet I have accepted this responsibility to educate my people as much as lies in my power to do. I know that all the evils from which my land suffers are solely owing to the utter lack of education of the people.

Our poverty, pestilence, the communal fights and industrial backwardness, in fact all that makes our life perilous, are simply owing to the meagerness of education. And this is the reason why in spite of my advanced age and my weak health I gladly accepted the invitation offered to me to see how you are working out this great problem of education. And I have seen, I have admired, and I have envied you in all the great opportunities which you have in this country. It is an agricultural population in India and it is in need of all the help and encouragement that you have

needed in this country. You know how precarious is the living which exclusively depends upon agriculture and so how utterly necessary it is for the cultivators to have the education, the up-to-date method of producing crops, in order to meet the increasing demands of life.

Our people are living on the verge of perpetual famine and do not know how to help this because they have lost their faith and confidence in their own humanity. This is the greatest misfortune of that great people, 300,000,000 men and women burdened with profound ignorance and helplessness.

So I came to this land to see how you tackle this problem, you who have struggled against the incubus of ignorance, superstition, and apathy which were once prevalent in this land among the workingmen and peasantry. The little that I have seen has convinced me of the marvellous progress that has been made, the miracle that has been achieved. How the mental attitude of the people has been changed in such a short time is difficult for us to realize, we who live in the darkest shadow of ignorance and incompetence. It gladdens my heart to know that the people, the real people who maintain the life of society are not deprived of their own rights and that they enjoy an equal share of all the advantage of a socialist community.

And I dream of the time when it will be possible for that ancient land of Aryan civilization also to enjoy the great boon of education and equal opportunity for all the people. I am thankful to you all who have helped me in visualising in a concrete form the dream which I have been carrying for a long, long time in my mind, the dream of emancipating the peoples' minds which have been shackled for ages. For this I thank you.

I am asked to let you know the music of the original Bengalese verses which I have written. All my translations in English are in simple prose but in the original my poems have a verse form which may be of interest to my audience tonight.

The first poem which I am going to read is about the first coming on of the rainy season. You know in our agricultural countries the first rain cloud bring great joy to

the hearts of the people. The clouds spread from sky to sky and the gladness spreads from heart to heart and hamlet to hamlet. The poet here describes his own joy[1] at the sight of the first messenger of the rain after the summer drought. He says that his heart dances like a peacock with its plumes outspread.

The second poem[2] is a love poem in which the woman is asking her lover if it is true all that he has been saying in praise of her beauty. She keeps repeatedly asking if it be all true. This is the subject.*

---

১ নববর্ষা : হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
—কণিকা, গীতবিতান

প্রণয় প্রশ্ন : এ কি সত্য সকলি সত্য :
'গীতবিতান'এর পাঠ
এ কি তবে সবি সত্য :
'কল্পনা'র পাঠ

* সোভিয়েট রাশিয়ার স্বাধীন নাগরিকরা বিশ্বকবিকে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তা সে দেশের মহান ঐতিহ্যকেই স্মরণ করায়। এম্‌নি কোন এক অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৩০) তারিখে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তারই অংশবিশেষ উপরে উদ্ধৃত করা হ'ল।

ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের শিক্ষার দুর্গতি তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল। এই বক্তৃতাটির একটি ফোটোস্টাট কপি, কবির স্বাক্ষরিত এবং কবি কর্তৃক পরিমার্জিত, সোভিয়েট রাশিয়ার 'সেণ্ট্রাল লিটারেচার এ্যাণ্ড আর্ট আরচাইভ্‌স্' কর্তৃক ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের মাধ্যমে 'রবীন্দ্র ভারতী'র নিকট সম্প্রতি প্রেরিত হয়। কবি মস্কোর ট্রেড ইউনিয়ন হাউসের কলাম হলে উপরি-উক্ত ভাষণ দিয়েছিলেন—ভারতবর্ষের কোন পত্রিকাতে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। 'রবীন্দ্র-ভারতী'র অনুমতিক্রমে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হ'ল। সঃ উত্তরসূরী

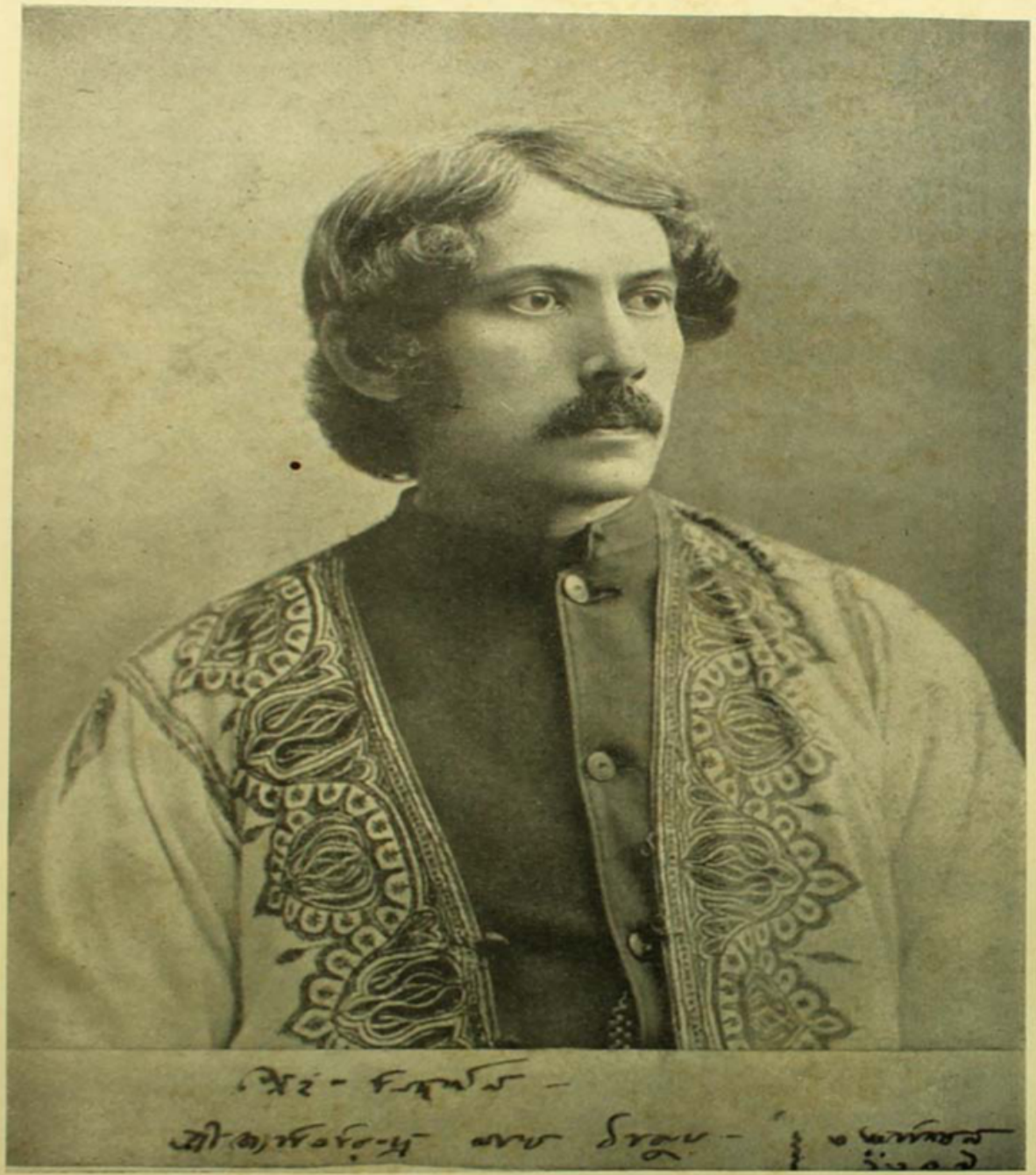

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

২২ বৈশাখ ১২৫৬ - ২০ ফাল্গুন ১৩৩১

৪ মে ১৮৪৯ - ৪ মার্চ ১৯২৫

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কানাই সামন্ত

উষার শুকতারা আর প্রভাতের রবি। মৌক্তিকলাবণ্যময় বিশদ দিগঙ্গনে একটি যেন অন্যটিকে নিঃশব্দ ইঙ্গিত ডেকে এনে, দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে যায়। উদ্ভাসিত দিকে দিগন্তে, রৌদ্রছায়াঙ্কিত বনে উপবনে, গৃহে পথে, তার কোনো স্মৃতিই থাকে না। রজনীর শেষ তারা, উজ্জ্বলতম তারা, গোপনে, আঁধারে, আধোঘুমে, কূলে কূলে কী বাণী রেখে গেল ফুলগুলিও তা জানে না। দিবা দ্বিপ্রহরে কার বা মনে পড়ে ক্ষয়-হয়ে-আসা অন্ধকারের পট-ভূমিকায় রাত্রিশেষের সেই তারাটি কত সুন্দরই না ছিল ?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-আলোচনায় উল্লিখিত উপমাটি নিতান্ত কাব্যালংকার নয়। নানা দিকে জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভার অনন্যতা, আর রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশে তারই আশ্চর্য আনুকূল্য ও মঙ্গলময় প্রভাব, পর্যালোচনা করে দেখলে বার-পর-নেই বিস্মিত হতে হয়। রাত্রিশেষে শুকতারা ও সূর্যের উদয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছা-রহিত কালক্রম ব্যতীত অন্য কোনো গূঢ় তাৎপর্য বা কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই যে, তার্কিক ব্যক্তির অপ্রিয় স্পষ্টভাষণের অপেক্ষা না রেখেও সে আমরা মনে মনে জানি বা মানি ; অথচ উপমান ভুলে উপমিতের ক্ষেত্রে এসে, নিছক কবিকল্পনা নয়, বাস্তবের ডাঙাজমিতেই আমাদের প্রতীতি দৃঢ়পদে দাঁড়াতে পারে। তখন মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বাংলাদেশ বা বাঙালি যে একেবারেই লতে বসেছে সেটা কোনোক্রমেই সংগত নয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র তিনি। বড়ো, মেজো, সেজো, ন, সব বিশেষণ নিঃশেষ হয়েছে যখন তখনি এলেন তিনি জননী সারদাদেবীর কোলে অকলঙ্ক চন্দ্রকলাটির মতো— তাঁর পরিচয় হল 'নতুন'। দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তী পুত্রকন্যাদের 'জ্যোতিদাদা' বা 'নূতন দাদা' আর জ্যেষ্ঠদের কাছে শুধুই 'নতুন'। এমন সার্থক অভিধান বা নামের অভিজ্ঞান খুব কমই হয়েছে। ঠাকুর-বাড়িতে সম্পূর্ণ নূতন তিনি প্রতিভায় ও প্রবণতায়। নূতন তাঁর আচার-আচরণ, মতি-গতি। আর, যেহেতু তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, ঠাকুর-বাড়ির বিশিষ্টতা ছিল প্রায় তুলনারহিত, বাংলাদেশে

বাঙালির ঘরেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আশাতীত নূতন। যে চিরনূতনের রূপ রস শব্দ গন্ধ সার্থকভাবে আবাহন করে এনেছেন পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ, তিনি তারই অগ্রসাধক।

অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল বাড়ির ছেলেমেয়েদের সব রকমে শিক্ষিত ক'রে তোলায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার কতদূর কী সুফল ফলেছিল রবীন্দ্র-জীবনস্মৃতির পাঠকেরা তা জানেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রই ছিলেন তাঁর স্নেহশীল সেজদাদার বিশেষ তত্ত্বাবধানের বিষয়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' থেকেই তা জানা যায় (দু ভাইয়ের বয়সের ব্যবধান তো পাঁচ বৎসর মাত্র)—

'বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক হইলেন, তাঁহার সেজদাদা (স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। হেমেন্দ্র-বাবুর শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। যখন বাড়ীর অন্যান্য বালকগণকে খেলিতে দেখিতেন, তখন জ্যোতিবাবুর যে কি কষ্ট হইত, তাহা তাঁহার বর্ণনাতীত। তিনি ভাবিতেন, তিনি যেন জেলখানায় আছেন— সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকার ; জগতে তিনি যেন নিতান্ত একা, অবরুদ্ধ। মুক্তির জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিত। হেমেন্দ্রবাবু অবশ্য তাঁহার ভালর জন্যই করিতেন, কিন্তু ইহাতে হিতেবিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর জ্যোতিবাবুর একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল।' (১)

তবে কি জ্যোতিরিন্দ্র শিক্ষাহীন সংস্কৃতিবিমুখ মূর্খই থেকে গেলেন? তা তো নয়। শুভার্থী অভিভাবকের শাসনে যত না শিখলেন তার বহুগুণ বিদ্যা জ্ঞান ও রুচি অর্জন করলেন শিক্ষার শাসনপাশ শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নিজেরই খেয়ালে এবং খুশিতে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল জানি। তবে বালক ও কিশোর কবি পেয়েছিলেন তাঁর জ্যোতিদাদার, নতুন দাদার অকুণ্ঠ স্নেহ ও সহযোগ। সেই স্নেহে কোনো শাসন বা পীড়ন ছিল না আর সেই সহযোগিতাই ছিল আনন্দোদ্‌বেল শিক্ষার অপূর্ব মুক্তিক্ষেত্র। সে কথা স্মরণ করেই প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার

প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম; তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না। (২)

'তিনি আমাকে খুব-একটা বড়ো রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না; সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে।··· সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চির-জীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত।··· শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কান-মলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।' (৩)

এতখানি উদ্ধৃতির একটু বিশেষ হেতু আছে। বিশাল মুক্তির ক্ষেত্রে আনন্দের উদ্দীপনায় ও স্বভাবের সঞ্চালনে শিক্ষা-দান ও গ্রহণের যে উদার অপূর্ব-নীতি কবির জীবনে উদ্ভাবিত হয়েছে, শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় যার ছিল একটি সমষ্টিসীমায়িত স্ফুট রূপলেখা মাত্র— বিশ্বভারতীর গঠনতন্ত্রে অথবা বাস্তব গঠনে যার ছাপ কালক্রমে মুছে যেতেও পারে— জানা যাবে কেমন ক'রে কোথায় তার প্রথম অঙ্কুর দেখা দিল। প্রথমতঃ এটি বালক ও কিশোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব।(৪) দ্বিতীয়তঃ এটি বালক ও কিশোর কবি রবীন্দ্র-নাথেরও অভিজ্ঞতা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথই তাঁর সহায় ও সহযোগী। তৃতীয়তঃ এটি সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ-গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সত্য বস্তু, সমুজ্জ্বল সার্থক ভবিষ্যতের একমাত্র অঙ্গীকারনামা— অথচ, সমাজ বা জাতি এ তত্ত্ব আজও কতদূর বুঝেছেন আর কবে বুঝবেন নিশ্চিত বলা যায় না— রাষ্ট্রের অজস্র অর্থব্যয়ে বা আদেশে ও অনুদেশে 'কাজের কাজ' কিছু হতে পারে না সে তো বলাই বাহুল্য। (৫)

নিরবধি কালের কবিকুলে বিশিষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর প্রতিভা-বিকাশের

উপযুক্ত পরিবেশ-সৃজনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনায়াসসিদ্ধ কৃতিত্ব অনেকখানি— যদিও সুধী সাহিত্যিক এবং মহাপ্রাণ ভাবুক তিনি, আসলে কবি নন। কবি শব্দের অর্থ এখানে সীমাবদ্ধ। মুখের কথা ছাড়া অন্য মানবীয় উপায়-উপকরণের কথা যদি ধরি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সুরস্রষ্টা ও চরিত্ররূপস্রষ্টা এবং সে অর্থে অসামান্য প্রতিভারও অধিকারী। সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ সে প্রসঙ্গটিও সংক্ষেপে আলোচনার যোগ্য।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পরে, গিরীশচন্দ্রের পূর্বে, নূতন বাংলা নাট্যাভিনয়ের আসরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অচিরকালীন সৃষ্টি অলৌকিক না হলেও উল্লেখ-যোগ্য। গ্রন্থবিশেষে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে ও সহজাত অনুরাগে সংগীতের চর্চা করেছেন 'নতুন', খুব-যে বাঁধাধরা পদ্ধতিতে তা হয়তো নয়। অনেকটা তার শুনে শেখা, খুশিমনে শেখা, এবং নিজেই নিজেকে শেখানো। হেমেন্দ্রনাথের মতো শিক্ষাদানের অত্যুগ্র ঝোঁক ছিল না সত্যেন্দ্রনাথের। তাঁর স্নেহের পক্ষচ্ছায়ায় আমেদাবাদে যখন ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মেজদাদার চিঠিতেই জানা যায়—

'জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র আমোদ। আমি তাহাকে করাসী শিখাইতেছি। সে খুব খাটিতেছে। বড় লাজুক— সমাজে মিশিতে পারে না।' (৬)

এ কথাও জানি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি পুরাতন পিয়ানো ছিল (হয়তো তিনি সেই যন্ত্রে স্বরগ্রামের উচ্চনীচতার মাপজোপে অভিনব কোনো আঙ্কিক বা দার্শনিক সমস্যা-সমাধানের চেষ্টায় ছিলেন) সেই যন্ত্রে বালক জ্যোতির খেলা ছিল— চুরি করে হাত লাগিয়ে যখন তখন সুরের ঢেউ খেলিয়ে তোলার। 'হাঁ-হাঁ' ক'রে উঠতেন অগ্রজ— 'পিয়ানো ভেঙে যাবে, নতুন, ভেঙে যাবে'। তখনকার মতো ত্রস্ত বা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত বালকের সুর-সাধনা। কিন্তু, চুরি করে হোক, আর যেমন ক'রেই হোক, এই পিয়ানো যন্ত্রে কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্ণ অধিকারই এসেছিল এবং তাঁর মতো গুণীর সুরস্বর্গে নূতন নূতন প্রয়াণের যোগ্য বাহন হয়েছিল সেটি, সে কথা কে না জানে। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যই সংকলন করা যেতে পারে—

'এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে

থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু [কবি অক্ষয় চৌধুরী] তাঁহার সেই সদ্যো-জাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।' (৭)

এই উপলক্ষে কবি আরও বলেন—

'আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।' (৭)

মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান প্রযুজ্য।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগে, যুগপৎ কবি ও সুরকার রূপে রবীন্দ্র-নাথের যে অলৌকিকসুন্দর আত্মপ্রকাশ তার প্রেরণারূপিণী এক দিকে যেমন 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরীদেবী, তার সমর্থ সহযোগী ছিলেন নতুন দাদা বা জ্যোতিদাদা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে হোক, ভারতী পত্রিকার প্রকাশ ব্যাপারে হোক, আর বিদ্বজ্জন-সমাগমের আয়োজনে এবং তদুপলক্ষ্যে নূতন নাট্যরচনায় ও অভিনয়েই হোক, সর্বদা জ্যোতিরিন্দ্রই ছিলেন আনন্দ-উৎসাহের আধারভূত প্রাণ-পুরুষ। বহুক্ষেত্রে বহু ভাবে তাঁর প্রাণ, তাঁর প্রতিভা আত্মসাৎ ক'রেই রবীন্দ্র-প্রতিভা বড়ো হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে— এ উক্তি কোনোরূপ অত্যুক্তি মনে হয় না।

বাল্মীকিপ্রতিভা (৮), কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, এই গীতিনাট্য তিনখানির আয়োজন ও অভিনয় হয় যথাক্রমে বাংলা ১২৮৭, ১২৮৯ ও ১২৯৫ সালে। জীবনস্মৃতিতে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে আসার পর—

'দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে··· সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।' (৯)

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—

'বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা

সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্ত-ভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম।··· এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই।' (৯)

নানা সূত্রেই জানা যায়, 'বাল্মীকিপ্রতিভার প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতি-বাবুর সংযোজিত।' (১০)

রূপভাবুক রূপস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় জানেন অতি অল্পলোক। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি'র কল্যাণে জ্যোতিরিন্দ্র-চরিত্রের অন্য নানা দিকই উদ্ভাসিত হয়েছে, এমন-কি বসুমতী-সাহিত্যমন্দিরের সুলভ গ্রন্থপ্রচারে তিনি-যে সংস্কৃত ফরাসী মরাঠী নানা ভাষা থেকে নানা অমূল্য নিধি সঞ্চয়ন ক'রে বাংলাসাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন সে কথাও হয়তো অবিদিত নেই— কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবাল্যের আর-এক নেশা যে ছিল বার্ধক্যের অন্তিম সীমাবধি অক্ষুণ্ণ, মানুষের মুখ আঁকা, মানুষের স্বরূপ-পরিচয়কে অনায়াস রেখাবলীর মায়াজালে চিরন্তন ক'রে ধরে রাখা— সে তথ্য আজকের জনসমাজে এক প্রকার অজ্ঞাতই বলা চলে। আমাদেরও তাই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়।

মনোবুদ্ধি দিয়ে সত্য এবং সৌন্দর্যের ধারণা এবং রূপকল্পনা, বিচিত্র উপায়ে ও উপাদানে, এই যদি হয় প্রতিভার সংজ্ঞার্থ— না হবে কেন? কবি চিত্রকর দার্শনিক সুরস্রষ্টা ও বিজ্ঞানী অন্য কোন্ পরিচয়েই বা এঁদের জানি— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভা অপূর্বভাবে ফুটেছিল সুরে এবং স্বরূপসৃজনে।

সৃষ্টির ক্ষেত্র তাঁর সীমাবদ্ধ, কিন্তু কল্পনাকৃতির নতুনতা ও মৌলিকতা বিস্ময়কর। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তাঁর প্রতিভা যথেষ্টই ছিল, ছিল না কেবল প্রতিভার উপযুক্ত গৃহিণীপনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তাই বলা যায় না কি? যতটা তাঁর ক্ষমতা ছিল তাও যেন করেন নি, নিজে যা করেছেন তার সম্বন্ধে ছিল তাঁর চরম ঔদাসীন্য— এ বিষয়ে বহু প্রমাণ হয়তো দেওয়া যায়। অন্যের প্রতিভাবিকাশে আনুকূল্য ক'রে, অন্যকে অভিনব সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে দেখে, তাঁর হ'ত অপরিসীম সুখ। অনতিক্রান্ত যৌবনে বিপত্নীক, নিঃসন্তান, এই গুণীকে সন্ন্যাসীও বলা চলে। কিন্তু সন্ন্যাসে ও স্রষ্টৃত্বে রয়েছে এক মূলগত বিরোধ। সেই বিরোধের অ-সমাধানে, যে সীমা পার হয়ে গেলে কল্পনা সত্য হয় এবং প্রাণপ্রতিম কম্পনে অদৃশ্যই দৃশ্য হয়, অশব্দই গান হয়, উত্তাপ আলো হয়ে ওঠে, সে যেন সর্বদা তিনি পার হয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর নিজের হয়তো সন্তোষের অভাব ছিল না, সর্বত্যাগেও কোনো দুঃখ হত না, কিন্তু বাংলার নবযুগে সুর ও রূপ-কল্পনার ভুবনে প্রধানতঃ তিনি অগ্রসাধক হয়েই রইলেন এক দিকে রবীন্দ্রনাথের আর অন্য দিকে অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রের, তাতে কি অনেকটাই আমাদের বঞ্চিত করলেন না? কে জানে এও হয়তো এক প্রকার নিয়তি এবং ব্যষ্টি-মানুষকে নিয়েই অতিশয় ব্যস্ত না হয়ে সমষ্টির বিষয় চিন্তা করলে, ক্ষোভেরও কোনো কারণ নেই। সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভার হেলাফেলার দান, পরিচিত-অপরিচিত খ্যাত-অখ্যাত বহুশত বালবৃদ্ধ নরনারীর প্রতিকৃতি, পাঁচ হাত ফিরে, অনেক নষ্ট হ'য়ে, কিছু যে তবু উত্তরকালের হাতে এসে পৌঁছেচে, এই আমাদের বিশেষ আনন্দের হেতু। খাতায় এবং টুকরো কাগজে লঘুক্ষিপ্র লেখনীর অনায়াস সঞ্চরণে লেখা হতে হতে স্রষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এইসব সৃষ্টিও যার-পর-নেই খুশী হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই, ক্রমে নেপথ্যের নিরালোকে নির্বাসিত হলে পরে অবিন্যস্ত জীর্ণ খাতার-পাতায় পাতায় দক্ষিণসমীরিত মর্মরে মর্মরে কদাচিৎ এই স্বর বুঝি শোনা যেত—

'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারই দলে!'

ঝরা পাতার অনেক বেশি মর্যাদা দিলেন ও আগ্রহ দেখালেন যেমন-তেমন-ক'রে-দৈবাৎ-ছাপা-হওয়া কয়েকটি প্রতিচিত্র দেখে বিদেশের এক গুণী। তাঁর বক্তব্য আমরা পরে আলোচনা করব, তৎপূর্বে খেয়াল-খুশি-ভরা এই চিত্রাঙ্কনের

ইতিবৃত্তের দিকটাও অল্প জানা দরকার। জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনস্মৃতির কাহিনী হল এইটুকু—

'জ্যোতিবাবু তখন হিন্দুস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেন। বয়স প্রায় বার কি তেরো··· ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে প্রতিকৃতি এমনই অনুরূপ হইয়াছিল যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ একটা খুব হাসি তামাসা চলিয়াছিল। [জয়গোপালবাবুর চেহারায় ও পরিচ্ছদে প্রচুর হাস্যকরতা ছিল] (১১)

'পূর্ব্বোক্ত ঘটনারও দুই এক বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিবাবু তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন করেন।··· [রায়পুরের] প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় একবার জ্যোতিবাবুর মেজদাদাকে (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁহার কর্ম্মস্থান মণিরামপুরে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যোতিবাবুও তাঁহার মেজদাদার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলেন। একদিন, কেন কে জানে, প্রতাপবাবুর ছবি আঁকিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কখনও কাহারও ছবি আঁকেন নাই, বা আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই। এই ছবিখানি এত সুসদৃশ হইয়াছিল যে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চিত্রাঙ্কনের জন্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন।··· তাঁহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই সকলে যখন প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীর লোকদেরও চেহারা আঁকিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন।' (১২)

উল্লিখিত ঘটনা দুটি খৃষ্টীয় ১৮৫৯-৬১ সালের মধ্যে ঘটেছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। ভারতচিত্রকলার নবপ্রাণদাতা অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথ তখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের মে মাসে আমেদাবাদ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন— 'আমি তাহার জন্য একজন ড্রয়িং মাষ্টারও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু জ্যোতি পারিবে কিনা জানি না।' (১৩) বিনা প্রমাণে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ব'লে অজ্ঞাতনামা মাষ্টার-মশাইয়ের নিন্দা করতে পারি নে, তবু মনে হয় তাঁর অধীনে শিক্ষা বেশি দূর এগোয় নি। কারণ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের সারা জীবনের কাজে কোনো ড্রয়িংমাস্টারের পাকা হাতের দাগে দাগা বুলোনোর আভাস খুঁজে পাওয়া যায় না কোনোখানে। সত্যকারের

কোনো গুণীর সংস্পর্শে এলে কী হ'ত কেউ অনুমান করতে পারি নে যেমন, তেমনি বলাও যায় না বিশেষ প্রতিভাবানের চরিত্রে যে দুর্দমনীয় জেদ থাকে সকল বাধাকে পরাভূত ক'রে সকল সীমা ডিঙিয়ে চলে যাওয়ার, তারই খানিকটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিত্রে থাকলে বা কেমন হ'ত। কিন্তু, যা হয় নি বা হতে পারে নি তা নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা, এমন-কি শিল্পী নিজেও যদি সে আক্ষেপ করে থাকেন বৃদ্ধ বয়সে। (১৪) শিল্পীর যে রূপসৃষ্টির সাক্ষাৎ পরিচয় আজ পাচ্ছি তার সম্পর্কে এই কথাই মনে করতে পারি যে, স্বভাব-সুন্দরকে আরও বেশি সুন্দর করতে গেলে হয়তো কথঞ্চিৎ আবরণ করাই হ'ত। এই চিত্রপ্রতিকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে রূপমুগ্ধ দুষ্মন্তের ভাষাতেই বলা যায়—

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥*

প্রায় এই কথাই বলেছেন সমুদ্রপারের গুণী ও সমঝদার উইলিয়াম রোটেন্‌স্টাইন (W. Rothenstein) 'প্রতিকৃতি-পঞ্চবিংশতি'র ভূমিকায়—

'চিত্রাঙ্কন ঠাকুর মহাশয়ের পেশা নয়। নেহাৎই খেয়াল-খুশির বশে আত্মীয়বন্ধুদের প্রতিকৃতি-অঙ্কন তাঁর বহুদিনের নেশা বলা যেতে পারে। এই ছবিগুলিতে সেই তন্ময়তা ও আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে খেয়ালী চিত্রাঙ্কনে যার বিশেষ প্রত্যাশা থাকে অথচ কদাচিৎ সাক্ষাৎ মেলে। এ ক্ষেত্রে অঙ্কিত মুখাকৃতিনিচয়ে এমন রূপরুচি বা গড়নের মর্মজ্ঞতা দেখা যায় যা সত্যই দুর্লভ। অথচ আয়াসশূন্য একান্ত সাচ্ছন্দ্যে সব-কিছু প্রকাশ পেয়েছে। না আছে পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শ নিয়ে দুর্ভাবনা, না রয়েছে মোগল-চিত্ররীতির-গাঁটছড়া-বাঁধা অবোধ অনুস্মৃতি। ভারতীয় মহিলাদের প্রতিকৃতি বিশেষভাবেই দর্শনীয়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দে য়ুরোপীয় চিত্রকরদের কাজে নারীর এমন একটা প্রাণহীন চারিত্র-মুছে-যাওয়া প'ড়ে-পাওয়া ছাঁদ আরোপিত হয়েছিল যে, সহজতায় ও সততায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাজের তুলনা মেলে শুধু আরো পূর্ববর্তী ডুরার যা হল্‌বেনের আঁকা প্রতিকৃতিচিত্রে। জগতের ও জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্য তাঁদের চতুর্দিকে, জানি নে তবু কেন নূতন কালের ভারতীয় চিত্রকর-গোষ্ঠী অতীতের মোগল আর রাজপুত চিত্ররীতির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।...

'আর্ট থেকে আর্টের জন্ম হয় না, একান্ত আবেগ থেকেই হয়। সেই

আবেগ ও ঐকান্তিকতার আভাস পাচ্ছি জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর-বিরচিত প্রতিকৃতি-চিত্রে। সহজশোভন অনাড়ম্বর এদের ভাবখানা, কিন্তু বুঝতে বাকি থাকে না, তন্ময়তার গুণে, একমুখী প্রকাশের এষণায়, চিত্রে চিত্রে চিত্রিতব্য ব্যক্তির বিশেষ রূপলাবণ্য আর বিশিষ্ট চারিত্র চমৎকার ধরা পড়েছে।··· বিদেশী আমরা, বঙ্কিমের কাহিনীতে যে বাঙালি-চরিত্রের বর্ণনা পাই, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবিতে তাই যেন চোখ ভ'রে দেখতে পেলাম। ভাবব্যঞ্জনায় ও অন্তর্দৃষ্টিতে এগুলিকে অতিক্রম করে সমসাময়িক প্রতিকৃতিচিত্রের এমন নিদর্শন আমার অল্পই জানা আছে।' (১৫)

এ-সবই সমঝদার সুধী ব্যক্তির বহু-বিচার-বিবেচনা-প্রসূত প্রত্যয়পূর্ণ উক্তি। অনভিজ্ঞজনের শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাস নয়। ইনি ঘরোয়া ভাবে কী বলেছিলেন আলাপ-আলোচনায়, রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে তা জানতে পারি—

'ভাই জ্যোতিদাদা,

আপনার ছবির খাতা আমি Rothensteinকে দেখিয়েছি।··· তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বল্‌ছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificient এই ত তাঁর মত। যেটা যথার্থ আপনার জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত [অথবা বিস্মৃত] হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করেছেন। রোথেনষ্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক··· ২৯ ভাদ্র ১৩১৯

আপনার স্নেহের রবি।' (১৬)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পেন্সিলে-আঁকা চিত্রগুলির প্রত্যেক রেখায় রেখায় অনায়াস অবিচলিত প্রত্যয়, আর সর্বাঙ্গব্যাপী সূক্ষ্ম সুকুমার শ্রী, উভয়ই অক্ষুণ্ণ রেখে, প্রতিচিত্র রচনা এ দেশে আজও বুঝি সম্ভব নয়— কেননা, সে উপায় উপকরণ উৎসাহ এবং অ-ব্যয়কুণ্ঠার একত্র সমাহার দেখি নে। আর, ছবিও এঁকেছেন কত হাজার ঠিকমত আমরা কেউ জানি নে। (প্রায় সবই পাশ-ফেরানো মুখের আকৃতি, কাগজের উপর নরম পেন্সিলে আঁকা।) তিন চার

শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৪-১৯০৭)

রবীন্দ্রভারতীর
ব্লক : বিশ্বভারতীর

শত ছবি রবীন্দ্রভারতীর চিত্রসংগ্রহ থেকেই বেছে নেওয়া যায়। সেগুলি পর পর সাজিয়ে দেখলে যুগ থেকে যুগান্তরে চলে যায় মন বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে। যা ছিল পঠিত বা শ্রুত তাই হয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। এক-জীবনের-দেখা বিলীয়মান এক জগৎ বলা চলে। যে নাট্যাভিনয়ের উপর রঙ্গমঞ্চের শেষ যবনিকা প'ড়ে গেছে বহুদিন হ'ল, কয়েকটি সাটীকৃত আস্থের সংকেতে আবার সে যেন উঠে যায়, আবার সেই কুশীলবদের অভিনয় করতে দেখি ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ আর বিংশ শতাব্দের প্রথম পাদের পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয়। না, অভিনয় তো নয়, কল্পনাও নয়, বাস্তব জীবন। প্রতি-গ্রাহী মুকুরখানি শুধু মনোময়। কত আশা আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত-ইশারা, কত জানা অজানা জীবনের নিঃশব্দ কাহিনী, আর, বালেন্দুরেখায় আভাসিত আবছায়া কত ছবির দিনে-দিনে-উপচিত পূর্ণ প্রকাশ— কেননা, এক-একটি মুখ এই গুণীর অনিমেষ দৃষ্টিতে বৎসরে বৎসরে নবনবায়মান রূপে রেখায় এবং ছায়ানুষমায় ফুটে উঠতেও দেখা গিয়েছে। শিল্পীর স্নেহের রবি অথবা 'বিবি', মেজো'বৌঠান, বড়দাদা, প্রমথ চৌধুরী, আরও অনেকে। যে জীবন-মুকুল অকালে ঝরে গিয়েছে। যে জীবন বালিকামূর্তিতে আর তরুণীরূপে বার বার দেখা দিয়েছে শিল্পীর উদ্ভাসিত পটে, আর অশীতিবর্ষ পার হয়ে বুদ্ধির দীপ্তি, অনাড়ম্বর আভিজাত্যের গরিমা আর উন্নত হৃদয়ের সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে আজও রয়েছে আমাদের সামনে— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী, রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণাধিকা', ঠাকুর-পরিবারের মহনীয় ইতিহাস কবিকল্পনা নয় বা কাহিনী নয় তারই প্রধান সাক্ষী।

নিমেষকালই অনন্তকাল হয়ে রয়েছে। সেই অনশ্বর মুহূর্তমালার নিরালা আলয়ে দ্বার উদ্‌ঘাটন করে যাঁদের দেখা পেলাম কে তাঁরা? রাজনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহামতি রানাডে— আরও কত লোকনেতা। লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, টাইকন য়োকোয়ামা, দীন-বন্ধু এন্‌ড্রুজ, 'উইলি পিয়র্সন', চিত্রকর ঈশ্বরীপ্রসাদ— দেশী বিদেশী আরও কত কবি, কলাবিদ্, ধীমান্ এবং উদারহৃদয় মনীষী।

'সরোজিনী' বা 'স্বদেশী' কবে না জানি গঙ্গাসলিলে ডুবে গিয়েছে, বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী হয়েছে 'সরোজিনীপ্রয়াণ', স্থায়ী হয়ে রয়েছে শিল্পীর সাবলীল রেখাজালে জাহাজের বিদেশী কাপ্তেন বা সারেঙ।

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখি যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে এবং বার্ধক্যে— নিচু বাংলার আম জাম আমলকী -শোভিত, দোয়েল শ্যামা শালিখ -মুখরিত, শান্ত তপোবনে যাঁর ঋষিকল্প মূর্তি। বালক মুনীশ্বরকেও দেখি, তাঁর চির-জীবনের সঙ্গী। গীতাপ্রস্থানের গূঢ় তাৎপর্য এবং কপিল-কাণ্টের নিহিত ঐক্য যথোচিত ভাবে বোঝানো হল কিনা এই মুনীশ্বরকেও শুনিয়ে স্থির করতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। প্রাঞ্জল মধুর ব্যাখ্যান তাতে আর সন্দেহ কী। না জানি কী ভাবে দার্শনিককে প্রবোধ দিয়ে, তাড়াতাড়ি মুনীশ্বর ছুটত ফেলে -আসা ঘরকন্নার কাজে।

শমীন্দ্রনাথকে দেখি, কবির বিলুপ্ত বাল্যবয়সের নূতন প্রতিমা, স্নেহময় পিতার গূঢ় হৃদয়ের কত আশাস্বপ্নের আধার। ১৯০৭ সনের গরমের ছুটিতে বালক বন্ধুদের সঙ্গে মুঙেরে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। নিদারুণ দুঃখের কথা কবি কোথাও লিখে যান নি, কখনো উল্লেখ করেন নি বলা চলে। এই সেই শমী। কয়েকটি মাত্র রেখা, একটি আনমিত বোঁটায় একটি শিশিরস্নিগ্ধ সকালের ফুল, অরুণরশ্মির আশিস্‌চুম্বন নিয়ে জাগবার পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

হায় সুস্থির অতীত! আমি যে ধাবমান বর্তমানের ভাড়াটিয়া। পেয়াদা পাঠিয়েছেন কয়েকবার, আজ যদি সম্পাদক নিজেই আসেন তাঁকে তো ফেরাতে পারব না। কাজেই, জীবনসত্যের চোখে চোখে পরিচয়ে আর কাজ নেই, বানানো তত্ত্বের কয়েকটি কথা ব'লে এ নিবন্ধ শেষ করা যাক্।

বানানো তত্ত্ব না হলেও, বানাবার তত্ত্ব এ কথা ঠিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনাড়ম্বর চিত্রকলা, অতি সুলভ উপকরণে। রঙ নেই, সর্বাবয়বসম্পূর্ণ রূপ নেই। কাহিনী নেই, অথবা যা আছে তা দর্শককেই মনে মনে রচনা ক'রে নিতে হয়। তবু, এত কেন তার আকর্ষণ? যে ব্যক্তির কল্পরূপ ফুটেছে পেন্সিলের যৎসামান্য আঁকাজোকায়, অল্প আয়াসে, তাঁরই অত্যুৎকৃষ্ট আলোক-চিত্র যদি পাই সেও এমন আদরণীয় হবে না। কেন?

গাছের ফুল গাছেই থাকে, বড়ো জোর তাকে মালায় গেঁথে বা ফুলদানিতে

সাজিয়ে সৌন্দর্যরুচির অল্প একটু পরিচয় দিতে পারে মানুষ। তুলি ধরে কমল-কুমুদকে কিছু চিত্রিত করা চলে না। অথচ শিশু যেমন খেলা করে, তেমনি খেলার ছলে মানুষ চায় সৃষ্টিত্ব। সে সোনার ফুল বানায়, মণিমুক্তাখচিত সোনার ফুল বানায়— বাগানের ফুলের অনুকরণ করে না। তেমনি ক'রেই চিত্রীর বিশিষ্ট ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টির গুণে, উপায় ও উপকরণের স্বভাববশে, উপলক্ষ্যেরও কারণে, চিত্রিত বিষয়ে একটি যে রূপান্তর হয় সেটি কেবলই দোলা দেয় শিল্পী ও রসিকের মনে। ভেবে সুখ পায় শিল্পী, 'আমার সৃষ্টি এই, আমার আঁকা ছবি।' অর্থাৎ, সে ছবিতে বিষয় এবং বিষয়ী, মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়েছে। আর, রসিক দর্শক? মুগ্ধমনে চেয়ে থাকার বিরল মুহূর্তে তিনিও যে নিষ্ক্রিয় এমন নয়। রচনা যে শেষ হয়েছে এমন নয়। সেই ব্যঞ্জনা, সেই 'ধ্বনি' তাতে রয়েছে, যাতে কোনো দিন তা শেষ হবার নয়— অনন্ত কাল অগণ্য লোক তাকে মনে মনে পুনঃ পুনঃ রচনা ক'রে তুলবে। ফোটোগ্রাফে বা বস্তুনিষ্ঠ অনুকৃতিতে সে সুযোগ নেই; ঠিক সেই আকর্ষণ, সে আনন্দচাঞ্চল্যও তাই নেই।

বীণার একটি তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাজিয়ে চলেছেন গুণী, সেই হল সার্থক শিল্প-রূপ। তরঙ্গের তারগুলি গুনে গেঁথে নেবে কে, সে আছে সকল কালের সকল রসিকের মনে মনে।

বিচিত্র ব্যক্তিস্বরূপের রাগিণী বেজেছে জ্যোতিরিন্দ্রের সুর-বাঁধা বীণাযন্ত্রে, তাঁর সারা জীবনের সাধনায়। সেই আলাপ শুনে আর একজন গুণী, অবনীন্দ্র-নাথ, মুগ্ধ হ'য়ে বলছেন এই কথা—

'ছবির খাতায় জানা অজানা ছোট বড় আত্মীয় পর কারু ছবি তুলে রাখতে তিনি ভোলেন নি।···এই ছবির খাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে আমার সেদিন মনে হ'ল কই আমরাও তো ছবি আঁকি কিন্তু ছেলে বুড়ো আপনার পর ইতর ভদ্র সুন্দর অসুন্দর নির্বিচারে এমন করে মানুষের মুখকে যত্নের সঙ্গে দেখা এবং আঁকা আমাদের দ্বারা তো হয় না, আমরা মুখ বাছি! কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত বড় চিত্রকর হবার সাধনা করেছিলেন যে সব মুখ তাঁর চোখে সুন্দর হ'য়ে উঠলো, কি চোখে তিনি দেখতেন যে বিধাতার সৃষ্টি সবই তাঁর কাছে সুন্দর ঠেকলো— কোনো মুখ অসুন্দর রইলো না। রূপবিস্তার সাধনা পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি পায় না! যেমন এই মানুষের সঙ্গে তেমনি

স্থরের সমস্ত যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল— বাদ্যযন্ত্রগুলো তাঁর কাছে অতি সহজে পোষ মেনে যেতো।' (১৭)

---

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৩২৬),পৃ ২৬

২ এটি জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের যে বয়সের কথা সে সময়ে এক যুগ বা বারো বৎসরের ব্যবধান খুব সামান্য হতে পারে না।

৩ জীবনস্মৃতি (১৩৬৩), পৃ ৭১

৪ দ্রষ্টব্য জ্যো. জীবনস্মৃতি, পৃ ২০-২৪। খেলাচ্ছলে, আনন্দের ভিতর দিয়ে, শিক্ষা দেওয়ার নানা পরীক্ষা ঘরোয়াভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও করেছিলেন —তারও বর্ণনা আছে।

৫ স্থান-কালের বিবেচনায়, একটি 'বাহুল্য' পাদটীকা না দিয়ে থাকা গেল না। এ কথা হয়তো অনেকে জানেন, রবীন্দ্রনাথ-যে আশ্রমে ছাত্র শিক্ষক সকলকে নিয়ে, স্বয়ং নাটের গুরু হয়ে, নানারূপ উৎসবানুষ্ঠান ও অভিনয় করান, তদুপযোগী শারদোৎসব ফাল্গুনী প্রভৃতি নূতন নূতন নাটক লেখেন, কবিপ্রেরণা ছাড়াও তার একটি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে কিছু কিছু অশোভন অবাধ্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়, তারই এই অভিনব প্রতিবিধান। দণ্ডপাণি হয়ে অসহায় অপরিণত শিশুদের সংশোধন বা বর্জন বা তাদের প্রাণশক্তির নিষ্কাষণ মর্মদর্শী কবির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। বিপথগামী প্রাণপ্রবাহকে সুপথে চালিত ক'রে কী না আশ্চর্য ফল তিনি পেয়েছিলেন! এই সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ভূলোকে যখন নানা অনাচার ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, তখনই দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণ নেন। সকলকে সুপথে প্রবর্তিত করার অপূর্ব উপায় হিসাবে ব্রহ্মা এই নাট্যকলার সৃষ্টি করেন। এ তত্ত্ব কিছু নূতন নয়, এর উপযুক্ত বোদ্ধা বা প্রয়োগকর্তাই বিরল।

৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৩৩৪), পৃ ২১

৭ জীবনস্মৃতি, পৃ ৭১-৭২।

৮ পরিবর্তিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ১২৯২ ফাল্গুনে।

৯ জীবনস্মৃতি, পৃ ১০৭, ১০৮–১০৯

১০ জ্যো. জীবনস্মৃতি, পৃ ১৩। এ উক্তি বাল্মীকিপ্রতিভার প্রচলিত

দ্বিতীয়সংস্করণ সম্পর্কে কতটা সত্য কে বলবে— অন্তর্বর্তীকালীন কালমৃগয়া নাটকের বহুগান এর অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। 'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৩০০ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের সূচীতে কোন্ গানের সুর 'বৈঠকি'-ভাঙা আর কোন্‌টি জ্যোতিরিন্দ্র-রচিত তার পরিষ্কার নির্দেশ আছে, অথচ পরিবর্ধিত বাল্মীকি-প্রতিভার গানগুলির পৃথক পৃথক উল্লেখ ঐ সূচীপত্রে না থাকায় এই গীতিনাট্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। 'গানের বহি' ও জ্যোতিরিন্দ্র-সংকলিত 'স্বরলিপি গীতিমালা' (১৩০৪) প্রধানতঃ এই দুখানি বইয়ের প্রমাণে জানা যায় যে নিম্নলিখিত রবীন্দ্ররচনাচয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন—

অনেক দিয়েছ নাথ	প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
এতদিন প'রে সখী	ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে
এমন আর কতদিন	সকলি ফুরাইল
ওকি সখা, মুছ আঁখি	সখা হে কী দিয়ে আমি
কে যেতেছিস আয় রে হেথা	সখী, বল্ দেখি লো
খুলে দে তরণী	(বলো দেখি সখী লো)
গেল গো— ফিরিল না	সম্মুখেতে বহিছে তটিনী
দাঁড়াও, মাথা খাও	সহে না যাতনা
দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে	হল না, হল না সই
দেশে দেশে ভ্রমি তব	হা সখী, ও আদরে
না সজনী, না, আমি	হায় রে, সেই তো বসন্ত
নিমেষের তরে শরমে বাধিল	হাসি কেন নাই ও নয়নে
নীরব রজনী দেখো	হৃদয়ের মণি আদরিণী

মোট পঁচিশটি গানের বিষয় জানা যাচ্ছে ; (প্রথম গানটি সম্পর্কে 'শতগান' গ্রন্থের ঘোষণা অন্যরূপ হলেও, স্বভাবতঃই তার প্রামাণিকতা অল্প।) 'দে লো সখী' 'নিমেষের তরে শরমে বাধিল' 'ভুল করেছিনু' গানগুলি 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের— হতে পারে 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন' তারই উদ্দেশে লেখা, অথচ ব্যবহার হয় নি! (স্বরলিপি-গীতিমালায় 'মায়ার খেলা'র অন্য অনেক গান আছে যার সুরকার কবি স্বয়ং।) 'সম্মুখেতে বহিছে তটিনী' কালমৃগয়ার গান। (কালমৃগয়ার অন্য একটি গান 'সকলি ফুরালো স্বপনপ্রায়' উল্লিখিত তালিকা -বহির্ভূত, কেননা কথা সুর উভয়তঃই রবীন্দ্র-রচনা বলে

জানা যায়।) রবীন্দ্রনাথের কথায় অন্যে সুর 'দিলে' তাকে 'রবীন্দ্রসংগীত' বলে গণ্য করা চলে না ; অথচ পূর্বোক্ত গানগুলি কতটা সার্থকভাবে নিখিল-রবীন্দ্র-সুরসৃষ্টির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে আর ভাবান্তরে বলতে গেলে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির গতি প্রকৃতি ও কারুকৌশল কতটা রবীন্দ্র-প্রতিভারই স্বভাব ও সত্তার উপাদানস্বরূপ হয়েছে, সে আলোচনার অধিকার বর্তমান লেখকের নেই। জানি নে কবে যোগ্যজনের মনোযোগ এ বিষয়ে আকৃষ্ট হবে।

১১ জ্যো. জীবনস্মৃতি, পৃ ৪৫

১২ তদেব, পৃ ৪৪ ১৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পৃ ২০-২১

১৪ চিত্রবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া তিনি এখনও [১৯১২ ?] ক্ষুব্ধ। —জ্যো, জীবনস্মৃতি, পৃ ৪৫

১৫ **Twenty-five Collotypes from the Original Drawings by Jyotirindra Nath Tagore, 1914**। কতক অংশের মর্মানুবাদ। নব-ভারত-চিত্রকলার শিল্পীদের, প্রাচীন মোগল ও রাজপুত -চিত্ররীতির মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী দশা নিয়ে রোটেনস্টাইন যা ভেবেছিলেন, তা সম্পূর্ণ সত্য নয় আর মিথ্যাও নয়। স্থানাভাবে এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর হল না।

১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

১৭ বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩২, পৃ ৫৭৬

সঙ্গীত সাহিত্যে শার্ঙ্গদেব

রাজ্যেশ্বর মিত্র

যে কোন বস্তুর বৃহৎ পটভূমিকায় বিচার হলে তার প্রকৃত মূল্যায়ণ সম্ভব হয়। বৃহৎ শব্দে গ্রন্থস্ফীতি বোঝাচ্ছে, না অসঙ্কীর্ণতা এবং ব্যাপকতা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টিকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করবার মত পরিবেশসহ তার অস্তিত্বকে বোঝাচ্ছে। সাহিত্যিক বা শিল্পীর পক্ষে সঙ্কীর্ণতা সর্বদা পরিহার্য্য। তাঁকে বিবিধের মধ্য থেকে সমন্বয় সাধন করতে হবে; তার বিষয়বস্তুকে পরিচিত অপরাপর বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এইটি আদর্শ হলেও বহু গ্রন্থকারের মধ্যে এর অভাব দেখা যায়। যোগ্যতা এবং অভাব সত্ত্বেও অনেকে তাদের গ্রন্থকে সুসম্পূর্ণ করে তুলতেও পারেন না। তার কারণ তারা অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক অংশ এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু যোজনা করে ফেলেন। শার্ঙ্গদেব হচ্ছেন এই স্বল্পসংখ্যক সার্থক গ্রন্থকারগণের মধ্যে একজন যিনি বহুবিষয় সন্নিবেশিত করা সত্ত্বেও পুনরুক্তি পরিহার করতে পেরেছেন এবং বিস্তৃত পটভূমিকায় সঙ্গীতকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। তার আগে মতঙ্গ তার বৃহদ্দেশীতে এইভাবে সঙ্গীতকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আমাদের হাতে তার যে গ্রন্থটি এসেছে—ত্রিবন্দ্রাম সিরিজের সেই মুদ্রিত গ্রন্থটি অভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণ নয়। তথাপি এই গ্রন্থটি থেকেই তার মহৎ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তারও আগে আরো সুমহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত। তিনি তার নাট্যশাস্ত্রে এমন বহু বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যার সঙ্গে নাট্য বা নৃত্যক্রিয়ায় হয়ত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। তথাপি সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। অনায়াসেই তিনি সে সব বিষয় এড়িয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তার কাজের সার্থকতা এবং সম্পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখে সে সব বিষয় পরিহার করেন নি। সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত হলেও যেটুকু পরিচয় তিনি প্রদান করেছেন সেটুকুই পরবর্তী গ্রন্থকারদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

এ সত্ত্বেও বলব আমরা যা আশা করেছি তা পাইনি। সমসাময়িক কাব্যের

সঙ্গে বা নাটকের সঙ্গে মিলিয়ে তারা গ্রন্থ রচনা করেন নি। আমরা যে সব সংস্কৃত নাটক পেয়েছি তাতে ভরতের উল্লিখিত গীতরীতির পরিচয় পাই না। জাতিগায়ন বা গ্রামরাগ যে যুগে প্রচলিত ছিল সে যুগের নাটকও তো মেলে, কিন্তু মেলে না সেইসব গীতের পরিচয় এবং বিভিন্ন রস অনুযায়ী প্রযুক্ত হত এমন প্রমাণ সঙ্গীত শাস্ত্র থেকেই আমরা পাই কিন্তু গ্রন্থকারগণ বিখ্যাত এবং পরিচিত নাটকের উদাহরণ দিয়ে সেগুলি বুঝিয়ে দেন নি। এই বিশেষ অভাব না থাকলে সঙ্গীতের ইতিহাস আমাদের কাছে অনেক সুগম হত। শার্ঙ্গদেব অবশ্য জাতিগান বা গ্রামরাগের উদাহরণ দিয়েছেন কিন্তু কেবলমাত্র গানটুকুই বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে—কোন্ গ্রন্থে সেটি আছে বা তার পূর্বাপর কেমন ছিল আমরা তা জানি না। আমার মনে হয় আমরা যে সংস্কৃত নাটকগুলি পাঠ করি অভিনয়কালে তাতে আরো অনেক গান যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হত। নাট্যকার হয়ত সেগুলি রচনা করতেন না এবং অভিনয় হয়ে গেলে সেই সব গানকে রক্ষা করবার দায়িত্বও তিনি নিতেন না হয়তো নাটকের সঙ্গীতাচার্য্যগণ সেগুলি ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে রাখতেন সেগুলি আর আমাদের হাতে পৌঁছায় নি। কেবলমাত্র নাট্যসাহিত্যটুকুই আমরা পেয়েছি।

অনুরূপভাবে প্রবন্ধ সঙ্গীতগুলির কেবলমাত্র লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু কোন্ কোন্ জনপদে সেগুলি প্রচলিত ছিল বা কিরকম অনুষ্ঠানে সেগুলি ব্যবহৃত হ'ত সে সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। গানের লক্ষণগুলি গাওয়া গেল, তাদের আকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা গেল কিন্তু আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি বা বিশিষ্ট জনপদের জীবনধারার সঙ্গে মিলিয়ে তাদের আমরা স্পষ্টভাবে চিনে নিতে পারছি না। উদাহরণ স্বরূপ চর্যা গানের কথা ধরা যেতে পারে; চর্যার গায়ন পদ্ধতি ভালভাবে দিয়েছেন শার্ঙ্গদেব। এটি যে অধ্যাত্মগোচর তাও তিনি বলেছেন, কিন্তু কোথায়, কি পরিবেশে এগুলি গাওয়া হত সেটা উদাহরণসহ বলে দিলে আজকে আমাদের অনেক সন্দেহ এবং বিরোধের অবসান ঘটত। ঝোম্বড়া নামক এক বৃহৎ গীতগোষ্ঠীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমরা জানতে পারছি যে এইসব গানে উপমা, রূপক এবং শ্লেষ এই তিনটি অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল; তাছাড়া গদ্য এবং পদ্য মিলিয়ে এই গীতানুষ্ঠান করা হত। কিন্তু উদাহরণের অভাবে এর পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয় না। আমার মনে হয় বাঙলাদেশের ঝুমুর এই ঝোম্বড়ারই একটি

বিস্তৃত রূপ ; কিন্তু উপাদানের অভাবে সেটি প্রমাণ করা সহজ নয়। অবশ্য এই সব প্রবন্ধের উদাহরণ যে একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়; ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটি বইতে কিছু কিছু উদাহরণ মেলে, কিন্তু তাও সুলভ নয়। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে ষড়ঙ্গ প্রবন্ধ সঙ্গীতের কিছু উদাহরণ দিয়েছেন কিন্তু সেগুলি কতখানি নির্ভরযোগ্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে ; কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রবন্ধ সঙ্গীতের এতটা খাঁটি রূপ পাওয়া খুব সহজ ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য বহু গ্রন্থ আমরা পাইনি ; পেলে হয়তো আরো কিছু পরিচয় পাওয়া সম্ভব হত। এইভাবে বিবিধ গ্রন্থ থেকে এইসব গীতরূপগুলি সংগ্রহ করে আমাদের অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্টতর করে নিতে হবে।

প্রবন্ধ সঙ্গীতের অধ্যায়টি আমরা মনোযোগ সহকারে পড়ি না ; কিন্তু প্রবন্ধ সঙ্গীতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কেননা এগুলিই আমাদের পুরাতন প্রচলিত বিবিধ কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় সাধন করে। কেউ কেউ এদের কৃত্রিম বলে মনে করেন, কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা থাকলে এরকম ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু আমরা এই জাতীয় প্রবন্ধের পরিচয় পাইনি সেই কারনেই যে এগুলি কোনও কোনও গ্রন্থকারের নিজস্ব পরিকল্পিত রূপ এরকম সিদ্ধান্ত করবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই। সারা ভারতে প্রচলিত গীতরূপগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে এগুলির সঙ্গে যোগসূত্র কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই বলে আমার ধারণা। মতঙ্গ থেকে শার্ঙ্গদেব পর্য্যন্ত সবাই তাহলে এইসব গীতরূপের এতটা প্রাধান্য দিতেন না। এখনও এমন অনেক পুঁথি আবিষ্কৃত হতে পারে যাতে এইসব প্রবন্ধ সঙ্গীতের উল্লেখ থাকা সম্ভব। বস্তুত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নাম দিয়ে বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় যে পুঁথিটি প্রকাশিত করেছিলেন তাতে প্রকীর্ণক জাতীয় অথবা স্থড়জাতীয় প্রবন্ধ সঙ্গীতের অনেক উল্লেখই তো পাওয়া যাচ্ছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ছিল স্থড়জাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত।

তাছাড়া আমরা আজ যে গান গাই তার কাঠামো অর্থাৎ কলিনিবদ্ধরূপই তো প্রবন্ধ সঙ্গীত থেকে গৃহীত। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্গীত প্রত্যক্ষভাবেই প্রবন্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত। এমন কি ধ্রুপদ যে ধ্রুব জাতীয় সালগ স্থড়েরই একটি রূপ এ সম্বন্ধে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

জাতির চলমান জীবনধারার পরিচায়ক হচ্ছে প্রবন্ধসঙ্গীত। নানা সাংস্কৃতিক

বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে এইসব গীতরূপের অভ্যুদয় হয়েছে এবং তাতে রাগসঙ্গীতের আরোপ হয়ে সেগুলি মনোহর হয়ে উঠেছে। সুতরাং নানাদিক থেকেই এগুলির বিশেষ মূল্য আছে। অথচ প্রবন্ধ সঙ্গীতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা একেবারে উদাসীন বললেই চলে। অনেক প্রবন্ধ সঙ্গীত হয়তো শার্ঙ্গদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল না কিন্তু তথাপি তিনি তাদের উল্লেখ এবং পরিচয় প্রদান করে গেছেন। তাদের মূল্য তিনি অস্বীকার করেন নি। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ যদি এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করে যেতেন তাহলে ইতিহাসের দিক থেকে একটা মহৎ কাজ হত, কিন্তু তাঁদের অনেকেই সেটা করেন নি। আজকের যুগেও আমরা এইসব প্রাচীন গীতরূপ সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখাই না। এই গীতরূপগুলি আজও কোথায় আছে কিনা এবং থাকলে কিভাবে আছে—সে বিষয়ে এতটুকু অন্বেষণও করি না। কিছু দিন পূর্বে একজন ছাত্র গবেষক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন বাংলাদেশে বর্তমান প্রচলিত বিবিধ লোক-সঙ্গীতের প্রাচীন রূপ কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু শার্ঙ্গদেবের মত কোন গ্রন্থকার যদি বাংলার এইসব প্রবন্ধ সঙ্গীতের আদিরূপের পরিচয় রেখে যেতেন তাহলে উত্তর দেওয়া শক্ত হত না। আমার বিশ্বাস বহু লোকসঙ্গীতের পূর্বতন রূপ প্রবন্ধ সঙ্গীত থেকে পাওয়া যাবে—ভারতের বিভিন্ন দেশে এবিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক।

প্রাচীন সঙ্গীত সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জানবার অবকাশ আমাদের হয় নি। শাস্ত্র বলে অভিহিত করা যায় এমন দু তিনটির বেশি গ্রন্থ আমরা সঙ্গীত-রত্নাকরের পূর্বযুগে পাই নি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে মতঙ্গ প্রণীত বৃহদ্দেশী (৫ম-৭ম খৃঃ)। মতঙ্গ সঙ্গীতকে সংস্কৃতির বৃহৎ পটভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন। দেশী সঙ্গীত তাঁর কাছে প্রধান বস্তু। দেশের তাবৎ লোক নানাভাবে গান গাইছে। স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছানুসারে গান করে, বালকেরাও তাই। রাখাল তার মেঠোসুরে বাঁশি বাজিয়ে গান করে। ওদিকে রাজা, রাজড়ারাও নিজেদের খেয়ালে সঙ্গীত-রচনা করেন। এর কোনটাকেই তিনি উপেক্ষা করেন নি, সবই সাজিয়ে গুছিয়ে দেখতে হবে, বিচার করতে হবে। কোন সুরটা কার মনে বিশেষ আবেদন করে এবং কেন করে সেটা অন্বেষণ করাই তাঁর অভিপ্রেত। সঙ্গীত বিজ্ঞানকে তিনি যেভাবে বিভাগ করে বিচার করেছেন পরবর্তী গ্রন্থকারগণ সেই ধারাই সবিশেষ অনুসরণ করেছেন।

রাগ এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুটি অধ্যায়ে মতঙ্গের পরিকল্পনায় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। মতঙ্গ রাগসঙ্গীতে যে রীতি অবলম্বন করেছেন সেটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। তিনি গ্রাম রাগ, ভাষা, বিভাষা এবং অন্তরভাষা এইভাবে রাগ-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ নির্ণয় করেছেন। এই ক্রম অনুসারে রাগ সঙ্গীতের দেশজ উৎপত্তি এবং তার নানাদেশে বিস্তারের পরিচয় পাই। শুধু তাই নয় বিভিন্ন গায়নবৈশিষ্ট্য অনুসারে যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে সেটি জানবারও আমাদের সুবিধা হয়। শার্ঙ্গদেবও এই রীতিই অনুসরণ করেছেন এবং একে আরও উন্নত করেছেন ; তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব হয়েছে ততটা উদাহরণ তিনি দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু গ্রন্থকার এই উদ্দেশ্যটি আদৌ বুঝতে পারেন নি ; তাঁরা পুরুষরাগ স্ত্রীরাগ নপুংসকরাগ প্রভৃতি পরিকল্পনা করে আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন এবং আমাদের দেশের গায়ক সাধারণ এই সব পরিকল্পনাতেই আকৃষ্ট হয়েছেন সমধিক। অবশ্য বহুতর মিশ্রণের ফলে হয়তো ঐতিহাসিক ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় না, তথাপি এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে একটা ইতিহাস সম্মত রাগবিভাগের পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সম্ভব হত। আসলে আমরা এদিক দিয়ে চিন্তা করিনি। অতএব শেষ পর্য্যন্ত ঠাট-মেল হিসাবে রাগের শ্রেণী বিভাগ ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনি। ইতিহাস এই ভাবেই বারবার অবহেলিত হয়েছে এবং ঐতিহ্যের ক্ষীণ সূত্রটি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মতঙ্গের ধারাটি অনুসরণ করে পার্শ্বদেব (৯ম-১১শ খৃঃ) সঙ্গীতসময়সার নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ; পরবর্তী যুগে শার্ঙ্গদেব (১২১০-১২৪৭ খৃঃ) পূর্বরীতিগুলির সমন্বয় সাধন করে উন্নত এবং উৎকৃষ্টভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের পরিচয় প্রদান করেন।

শার্ঙ্গদেবের পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বৃষগণগোত্রীয়। এই পরিবারের ভাস্কর নামক এক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দক্ষিণদেশে বসতি স্থাপন করেন। ভাস্করের পুত্র ছিলেন সোঢ়ল এবং তাঁর পুত্র হচ্ছেন শার্ঙ্গদেব। ইনি মহারাজ সিংহনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দেবগিরিতে যাদব বংশীয় সিংহন নামক এক রাজা ১২১০ থেকে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে শার্ঙ্গদেব এই সময় তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। দেবগিরি হচ্ছে বর্তমান দৌলতাবাদ। শার্ঙ্গদেব নিজেকে 'শ্রীকরণাগ্রণী' বলে পরিচয় দিয়েছেন। এটি ছিল তখনকার

দিনের "অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল"-এর পদ। এই উক্তি থেকে মনে হয় যে শার্ঙ্গদেব উক্ত উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। শার্ঙ্গদেব যতগুলি সঙ্গীতশাস্ত্র তাঁর সময় পাওয়া সম্ভব ছিল সবই পড়েছিলেন; তা ছাড়া, বিবিধ আলঙ্কারিক-দের গ্রন্থের সঙ্গেও তার প্রভূত পরিচয় ছিল। এই বিরাট শাস্ত্রসাগর মন্থন করে তিনি যে সার উদ্ধার করেছিলেন তাই তিনি সঙ্গীতরত্নাকর নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে যেটুকু বাকি ছিল তা পূরণ করেছেন টীকাকার সিংহভূপাল এবং কল্লিনাথ। বস্তুত টীকা দুটি মিলিয়ে সঙ্গীতরত্নাকর অধ্যয়ন না করলে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা বোধ হয় সম্ভব হয় না। সঙ্গীত রত্নাকরকে এই দুটি টীকা যে গৌরব প্রদান করেছে এমন আর কোন সঙ্গীত গ্রন্থের পক্ষে সম্ভব হয় নি! কল্লিনাথের টীকা কঠিন কিন্তু বিশেষ মূল্যবান। কল্লিনাথ সাধারণ বা সহজ অংশের ব্যাখ্যা দেন নি কিন্তু যে সব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সেগুলি অনেকেই এড়িয়ে গেছেন। জাতিগানের যে টীকা কল্লিনাথ দিয়েছেন তার সাহায্যে উক্ত অধ্যায়টি বুঝতে বিশেষ সুবিধা হয়। রাগবিবেক অধ্যায়ে তাঁর টীকা অতুলনীয়। পাঠককে তিনি সর্ববিষয়ে সাহায্য এবং সকল সন্দেহের নিরশন করতে চেষ্টা করেছেন। ষড়জ এবং মধ্যম-এই দুই গ্রাম মিলিয়ে যে সব রাগের উদ্ভব হচ্ছে তাতে কোন গ্রামের অংশ কতটুকু সেটি তিনি চমৎকারভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যে সব অপ্রচলিত রাগের পরিচয় শার্ঙ্গদেব দেন নি তিনি সেগুলি দিয়ে গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ করছেন। প্রবন্ধ অধ্যায়ও তাঁর টীকা বহু কূটবস্তুকে সরল করতে সহায়তা করেছে। তবে, কল্লিনাথকে বুঝতে গেলে একটু বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন। ব্যকরণ এবং তর্কশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল বলে মনে হয়। এই উপলক্ষ্যে কল্লিনাথের আলপ্তি প্রসঙ্গে টীকা দ্রষ্টব্য।

সিংহভূপালের টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং আতিশয্যবর্জিত। এই কারণে এই টীকা থেকে গ্রন্থকারের মূল বক্তব্যটি অতি সহজে বোঝা যায় এবং সর্বত্রই একটি সমতা পরিলক্ষিত হয়। টীকাটি সহজ হলেও সিংহভূপাল যথেষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত আলঙ্কারিক ছিলেন। রসার্ণবসুধাকর নামক অলঙ্কার শাস্ত্রটি তাঁর রচিত। সিংহভূপাল কল্লিনাথের পূর্ববর্তী। জাতিতে শূদ্রক হলেও তিনি ছিলেন রাজা। বিন্ধ্য এবং শ্রীশৈলের মধ্যবর্তী

স্থান তাঁর শাসনাধীনে ছিল। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কল্লিনাথ ছিলেন কর্ণাটকের লোক। বিজয়নগরের রাজা ইম্মদী দেবরায়ের নির্দেশক্রমে তিনি সঙ্গীতরত্নাকরের টীকা রচনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনি জীবিত ছিলেন।

শার্ঙ্গদেব নিজেকে নিঃশঙ্ক বলে প্রচার করতেন। তাঁর মত সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। সবচেয়ে চমৎকার হচ্ছে তাঁর শ্রেণীকরণ এবং বিশ্লেষণ, কোন কিছুই তিনি বাদ দেন নি। প্রকীর্ণাধ্যায়টি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ, শব্দের নানা প্রকার ভেদ এবং গায়ন পদ্ধতির বিবিধ কৌশল তিনি অতি নৈপুণ্য সহকারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই সব আলোচনা থেকে রাগমিশ্রণ এবং তখনকার দিনের নানাবিধ প্রয়োগ চাতুর্য্য সম্বন্ধে জানবার সুযোগ হয়। অবশ্য সঙ্গীতসময়সার প্রণেতা পার্শ্বদেবও এসব আলোচনা করেছেন, কিন্তু শার্ঙ্গদেবের আলোচনা আরও বিচক্ষণ।

শার্ঙ্গদেবের প্রবন্ধাধ্যায় থেকে কাব্যের ছন্দ এবং সঙ্গীতের ছন্দ এই দুটির মধ্যে কি সম্পর্ক সেটি চমৎকার বোঝা যাবে। ছন্দশাস্ত্রে দক্ষতা না থাকলে সঙ্গীতরত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায় বোঝা কঠিন। এলা জাতীয় প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে ছন্দশাস্ত্রের 'গণ', 'বর্ণ', 'অক্ষরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। গুরু এবং লঘু হিসাবে তিনটি বর্ণের সন্নিবেশে একটি গণ হয়। কাব্যে সাধারণত আটটি গণের ব্যবহার হয়। প্রবন্ধসঙ্গীতে এতদ্ব্যতীত বহু-সংখ্যক গণের পরিকল্পনা করা হয়েছে, সঙ্গীতে এই গণবিভাগ বেশ চিত্তাকর্ষক; এছাড়া কাব্যের রীতি এবং বৃত্তিরও প্রয়োগ আমাদের সঙ্গীতে প্রচুর ছিল। শার্ঙ্গদেবের দৃষ্টি হচ্ছে আলঙ্কারিকের দৃষ্টি, সুতরাং কাব্য এবং সঙ্গীতের যে সম্বন্ধ সেটি সর্বক্ষেত্রেই শার্ঙ্গদেব স্পষ্ট করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

শার্ঙ্গদেবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংযম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা তিনি বলেন নি। এই সুবিন্যস্ত, সুপরিকল্পিত এবং সুলিখিত গ্রন্থটির সঙ্গীত শাস্ত্রে তুলনা নেই। ভারতীয় সঙ্গীতচিন্তার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে এই গ্রন্থের উপলব্ধি অবশ্যই প্রয়োজন।

লেখকের "সঙ্গীত সমীক্ষা" নামক সঙ্গীতরত্নাকরের অনুবাদ কিছুকালের মধ্যেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। এটি তারই ভূমিকা হিসাবে লেখা হয়েছে। সঃ উত্তরসূরী

দুই প্রত্যহ

অমিয় চক্রবর্তী

লাল ধুলো তার জুতোর তলায়—
মেঝেতে ছাপ
চৈত্রবেলার প্রদক্ষিণে
উড়েছে তাপ
যদি থাকতো কৃষ্ণচূড়ো
ঝ'ড়ে পড়তো রাঙা গুঁড়ো
—ছিল দুধারে নিমের সারি সবুজ ঝারি—
মেঘলা সিঁদুর মুছিয়ে তার
ছোঁয়নি আকাশ ;
স্বচ্ছ বাতাস
ভরা রৌদ্রে একা আমার পথচারী,
দেরি হয়নি নিতে চিনে ॥

পরের বেলা শিলাবৃষ্টি শাদা ঝড়ে
মনে পড়ে।
ছাতা থাকলে উড়েই যেত,
ভিজে জুতোর ছাপ তো পেত
বুকের মেঝে,
যদি আসত পথিক সেজে।
রান্না ঘরে ভাত চাপিয়ে
ছিলেম চেয়ে জানলা দিয়ে
বারো বছর পেরিয়ে হঠাৎ চেয়ে থাকা—
পৌঁছন তার মেঘে ঢাকা
কাটবে বছর আরো বাদল রোদের দিনে।

পদাবলী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যেখানেই থাকো আমিও বিরতিহীন
মরণে-বাঁচনে তোমাকেই করি ধাওয়া
যেখানে কেবল বজ্রের আসা-যাওয়া,
সেখানেও আজো আমার বাসনা লীন।

যেখানে কালের রাখাল কান্না চাপে,
মাঠে ও পাহাড়ে সন্ধ্যা গভীরতম,
দেওদার বন অজ্ঞাত ত্রাসে কাঁপে—
সেখানেও তুমি আমারই যে প্রিয়তম।

পাঁজরভাঙা শিল্পশালায় তোমার হাত
রেখায়-রেখায় গড়ছে নিয়ত চিত্র নানা ;
লাল নীল ফুলে তাই কি স্ফুরিত দিন ও রাত,
এবং কঠিন মাটিতেও ফোটে হাস্নুহানা ?

চৈত্রের হাওয়া শ্রাবনের মেঘ শারদ রোদ
ঘাসে-ঘাসে আর ধানে-ধানে আর প্রাণে
ছড়ায় আজো যে করুণ আবেগ মমতাবোধ
সে তো বার-বার তোমারই আহ্বানে।

আনন্দে কিবা বিষাদে কিংবা স্তব্ধতায়
ক্লান্ত চলার প্রহরে আজো যে উজ্জীবন,
অন্ধকারেও মণিময় দ্যুতি ব্যর্থতায়
এবং স্বভাবে স্বভাব মেশায় আপনজন

সে তো শুধু আজ তোমার গভীর আবেগেই
যে-আবেগ টানে বাসা হতে, ফের নীড় গড়ে—
ছুটেছি তাই কি তোমার পেছনে, ক্লান্তি নেই,
আকাশে মাটিতে যদিও ক্লান্ত প্রহর ঝরে ॥

দুপুরের দাবি

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

বাড়ির লোক এখন যে যার কাজে
দুপুরটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ;
রোদে শুকায় পোকায়-কাটা শাল ;
একটি কাক চেঁচায় পাড়া জুড়ে ;—
বলো, বলো, কাকের মতো বলো,
তোমাকে আমার চাই ।

আফরি কাটা পেঁপে ডালের ছায়ায়
কাঠবেড়ালটি ইচ্ছামতো ঘোরে ;
দুপুর শুধু দুঃখ ঘনায় ঘরে,
আবছা ভয়ে জমাট থমথমে ;
বলো, বলো, বলতে যদি চাও
চলে যাওয়ার আগে ;

প্রখর হোক তোমার উচ্চারণ,
কাঠের গোলায় আগুন জ্বেলে দিক,
আসুক ছুটে দমকলের গাড়ি
উত্তেজিত ভিড়ের ঢেউ ঠেলে,
জলের ছাট ছড়িয়ে দিতে দিতে
যাক না সব পুড়ে ।

আত্মরতি

দিলীপ কুমার সেন

বিশীর্ণ রাত্রির থেকে অন্ধকার নিয়ে এলো নারী।

সর্বাঙ্গে জরার স্তুতি, পথে পথে বিনষ্ট প্রহর
একাকী ইচ্ছার স্পর্শে অপরূপ যন্ত্রনায় কাড়ি'
তার সব ঐশ্বর্য্যের অপ্রসন্ন আকাঙ্ক্ষার স্বর।
স্বপ্নের শিয়রে বন্দী, তুষারের মতো সেই নারী।

অন্ধকারে দীপ্তি জ্বালো, দেহ ঘিরে ফুলের স্তবক
বিদ্যুৎ বল্লরী দোলে নির্বাসিত অতনু আরতি ;
সে তোলে রত্নের গর্ভ ঝিনুক মুক্তা-মাছ-বক
জলের দর্পনে পোড়ে দেখে দেখে এই আত্মরতি।

সমগ্র ইচ্ছারা তাকে ছোঁয় যেন আকাশের মতো,—
ঘৃতপুরে আহুতিদগ্ধ সুনিপুন পদ্মের কোরক ;
রাত্রির ছায়ার স্তূপে, নগ্ন তার মূর্তি অভিভূত
পরালো জরার সজ্জা একে একে মৃত্যু-হিম-চোখ।

সমগ্র ইচ্ছারা তাকে ছোঁয় বুঝি আকাশের মতো।

শরীর সর্বস্ব তবু, তৃপ্তিহীন, এ-দাহ অন্ত-না,
সে নারী স্বপ্নের মতো,—দেহ তার ফুলের বন্দনা॥

সৈকত

প্রবোধচন্দ্র পাল

সমুদ্রে না-হোক্—
সৈকতে অন্তত তাকে
বৃষ্টিধোয়া আকাশের নিচে
খুঁজেছি একদা।
কোনো-এক উড়ে যাওয়া পাখির পালক
অভিজ্ঞান ছিল
ধ্যান ছিল গভীরে নিহিত॥
স্পর্শের সুখের মতো
মনে অভিহিত
তাকে আমি স্পর্শের সীমায়
পেয়েছি কখনো?
কখনো কি সেই পাওয়া দিয়ে
ধূলিকে ছোঁয়ার সাধ মিটে যায়?
মেটে কি সমুদ্র থেকে
তুলে-আনা শুক্তির আয়ায়
আকণ্ঠ তৃষ্ণার দাহ?
তবু ম'রে গেলে,—
লোকে তো মুক্তোই বলে!···সমুদ্রের
কোনো অঙ্গীকার
অতল শৈবালে লীন—
—তৃষ্ণা-আকাঙ্ক্ষার
মৃত্যু দেখে-দেখে,
অভ্যস্ত সবার চোখে
শেষ হ'লে সমুদ্র সন্ধান—
আমার সৈকত থাকে
থাকে মন, হাহাকার, সত্যি-মিথ্যে জীবন-ব্যাখ্যান॥

জ্বর

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কার যে যাবার সময় হ'লো, কে যে ঘরে এলো ;
কিছুই জানি না।
হাসপাতালের মায়ামুখের ছায়া এলোমেলো
কেউ কি আমার বোন এসেছে ? কেউ কি আমার মা ?

দেয়াল জুড়ে টিকটিকিটা বিরাট ভয়ের মতো ?
হয়তো দেবে ঝাঁপ।
ও যদি তার অনেক দিনের মুখের ছবিই হ'তো
ভুলতো না কি সব অপরাধ, করতোনা কি মাপ ?

হাসপাতালে স্মৃতির হাওয়া আবির খেলে খেলে
গেল ঘুমের দিকে।
ভীষণ কালো মাকড়শা এক দিয়েছে জাল মেলে ;
বাঁধবে কি সে সৌরজগৎ, মুছবে কি রাত্রিকে ?

কোথায় যেন আধমরা এক বৃষ্টি প্রলাপ বকে
মাটির কোমড় ধ'রে।
কালির দোয়াত উল্টে ফেলা নীল সেলিজের শোকে
মেঘের দেশে কেউ কি পাগল, কেউ কি মাথা খোঁড়ে ?

কার যে আসার সময় হ'লো, কে যে চ'লে গেল
কোথায় ওদের ঘর ?
মাটির ওরা ; না কি মাটির অনেক নিচে এলো ?
কান পেতে কি শুনতে পাবো ফিস্‌ফিসেনী স্বর ?

সদেশীয়া

সুনীলচন্দ্র সরকার

আম্রকুঞ্জে উৎসবের সভা
লোকের পাঁচিল ঘেরা,
কিছু দূরে ছায়ামাখা বাসে
মা ও তার দুই ছেলে।
মাইক্-এ আসছে ব'য়ে কর্মসূচি :
আবৃত্তি, সঙ্গীত, কখনো বৈদিক মন্ত্র।

একান্ত অমনোযোগী মা-টি
নানা রঙ্গে করে আবিষ্কার
শিশুর শিশুত্বটুকু
মেতে আছে স্বকীয় নাটকে।
তিক্ত মন বলে ওঠে : থামুক থামুক।
হেনকালে ভেসে এল গান ;
'সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।'
মেয়েটি নীরব,
কি যেন শুনতে থাকে বুকের স্পীকার-এ।
ছেলেকে থামায়,
'—শোন খোকা, শোন,
তোর কি পায় না কান্না ?'
—'কেন, কি হ'য়েছে ?
—'হবে কি আবার বোকা ?
নিজেই বোঝ না ;—

এই গাছ, পাখী, হাওয়া,
এই মাটি, ঘাস,
এই সব লোকজন—
জন্মেছিস্ এই দেশে·····
কান্না কি পায় না ?'
বলে আর চোখ থেকে ফেলে
ছেঁড়া রক্তাহার।
মেয়েটি চপলা, ঠিকই।
তবু হৃদয়ের নীড়ে অনায়াসে চিনে সদেশীয়া
তৃপ্তমন বলে ওঠে, নমস্কার।

পরিচিত ছবি

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

বহু পরিচিত ছবি তার ম্লান চোখে ব্যবহৃত।

কোন রৌদ্রগন্ধ দিনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি
ভাল লেগেছিল তার। মাদারের লাল অন্ধকারে
স্বগত স্বপ্নের ধ্বনি চেতনায় এক হয়ে মিশে
বিরল ছবিটি তার মনে পড়ে—হঠাৎ যদিও
নিঃশঙ্ক ঘুমের ঘোরে। কি যেন বলার ছিল,
বোধ হয় শোনেনি সে। অতএব সরে গেছে ফের।

বাতাসে কিসের ডাক ? অবারিত দৃষ্টি বার বার
ছড়ানো নীলের থেকে শূন্য ঘরে কোথায় লুকোলো ?

বুকে তার একরাশ বিচ্ছিন্ন সময় এলোমেলো।

এ জীবন তবে নদী

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

এ জীবন তবে নদী
একটি দিগন্ত থেকে
আরেক দিগন্তে যদি
নূতন জন্মকে ডেকে
একদিন এ জলধি.

এই দিকচক্রতলে
এই দিন যদি যতি
আরেক তৃষ্ণায় গলে
অন্তদিন দূরবর্তী
আরেক দিগন্ত জলে।

এই দিন এই আজ
যদি এক দিগন্তর
তবু দ্রৌপদীর লাজ
চমকালে তারপর
সাড়ীর অসংখ্য ভাজ।

হায় ইচ্ছার নিয়তি

রাম বসু

অনেক দূরে এসে লতাপাতার সাগরে ডুবে যাচ্ছি
দুজন দুজনকে আঁকড়ে সেই তীব্র অন্ধকার সাগরে
এসেছি ঘনিষ্ট গাছের অভিভূত শিকড়ের দেশে
এখন আমরা রূপকথার নায়ক নায়িকা।

এখানে প্রহর প্রহার করবে না আর
কানে আসবে না বিরোধের বিশৃঙ্খল চিৎকার
ঘরের ঘোরে বিকারের কথাগুলো মৃত
বোঝবার কিম্বা বোঝানোর দায় নেই বলে
দুজন দুজনের নির্জনতায় সমর্পিত
গায়ের ফোকোরে বহুকালের নিরুদ্বেগ জল।

এখন তোমার চোখ গাঢ় রহস্যের খনি
তার অতল গহ্বরে কি আছে জানি না
তোমার নিটোল দেহের উত্তাপ ঔজ্জ্বল্য
চরের কাদার ওপর জ্যোৎস্নার আলো
দলিত পাপড়ির মত ঠোঁটে ক্লান্তির রমণীয় হাসি
আকাশের শেষ প্রান্তে স্তিমিত বিদ্যুৎ
আমাদের কোন নাম নেই এখানে।

আমার পৌরুষ নিংড়ে নিয়ে তুমি
নিজেকে উদ্ভিন্ন করো আমার নিঃসঙ্গতার কেন্দ্রে
কোন গুপ্ত জল মাটী আগুনের নগ্ন কলরবে
আমি দেখি আমার জন্মভূমির উদ্ভব।

তবু কেন ঘুমের ঘোরে বলেছিলে তখন :
চল, নদীর আয়নায় নিজেদের দেখি
তোমার ঘরের আলস্যমদির মন্ত্রে বশীকরণ
তোমার নিশ্বাসের সৌরভের ক্রীতদাস আমি।
হায় ইচ্ছার নিয়তি হায় কীর্তিনাশা নদী।

সেই অভিশপ্ত নদীর পাড় থেকে ঝুঁকে পড়েছি যেই
দেখি আমাদের দুই মুখ দুই বিপরীত দিকে
হালছাড়া ডিঙির মত দিশেহারা
ঢেউ এর বাড়ি খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ।

উত্তরসূরী

তুমি আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লে
আমি অদৃশ্য ভগ্নস্তূপে একা পরাজয় কাঁদে করে
আর কিছু করার নেই বলে তোমাকে ঘৃণা করলাম
ঘৃণা করলাম নিজেকে তখন।
• হায় ইচ্ছার নিয়তি হায় কীর্তিনাশা নদী।

অবিচ্ছিন্ন অনুভব

নবেন্দু চক্রবর্তী

আজ রাত্রে সেই মাঠে যাবো
শুনবো সেখানে আমি নক্ষত্রের গান
সে তুমুল শুব্ধ সুরে ভরে নেবো প্রাণ
অন্ধকার ছাড়া আর কার সঙ্গ পাবো!

বরং নিজেই যদি অন্ধকার হতে পারি ভালো
তাহলে ছড়াবো এক দীর্ঘ ছায়া অনন্ত শান্তির
রাত্রি ভালোবেসে তার দুফোঁটা শিশির
ঝরাবে মাঠের বুকে জোনাকিরা জেলে দেবে আলো।

আজ রাত্রে সেই মাঠে যাবো
কাঁদতে অজস্র কান্না সেখানে নিভৃতে
অবিচ্ছিন্ন অনুভবে মগ্ন হয়ে যাবো আমি; কে আর পারবে ছিঁড়ে নিতে
আমাকে আমার থেকে। কাঁদবো আর রাত্রিকে কাঁদাবো।

প্রজ্ঞাপারমিতা

বটকৃষ্ণ দাস

হৃদয় তার অন্ধকার সমুদ্রের জল,—
শরীর তার সূর্যসাধে নীল
অপরাজিতা। শীর্ণ ডালে শান্ত, অবিচল
শপথ তার রৌদ্রে মেঘে নিয়ত প্রোজ্জ্বল,
দৃষ্টি তার স্বচ্ছ, অনাবিল
আকাশে চায় অমানিশায় পূর্নিমার মিল
দ্বন্দ্বাতীত জীবনে সচ্ছল।

ধৈর্য তার অপরিমেয়, অটুট মনোবল,
জীবনে নেই ক্লান্তি একতিল—
অপরিসীম যন্ত্রণার আগুনে নির্মল
প্রণয় তার পার্বতীর তপস্যার ফল:
চেতনা তার সহজ, অবলীল—
স্বর্গে গাঢ় অন্ধকার, তবুও স্বপ্নিল
দুচোখে তার আকাশ সম্বল।

সে জানে তার ভালোবাসার প্রকৃতি প্রাঞ্জল,
তুচ্ছ সংশয়ের সর্পিল
রাত্রি তার হৃদয়ে নেই। যেহেতু চঞ্চল
প্রচ্ছদের গভীরে স্থির সমুদ্রের জল

এবং তার কিরীটে ঊর্মিল
মরণজয়ী কালের মণি,—শান্ত, সাবলীল
প্রত্যয়ের প্রতীকে ঝলমল॥

কোন নায়িকার প্রতি

অরুণ ভট্টাচার্য

Cover her face, mine eyes dazzle,
she died young—Webster

ঘৃণিত উৎসব শেষে
নিরাশ্রয় ফিরলো সে ঘরে।

নিয়তিনির্দ্দিষ্ট, তবু এ অভিজ্ঞতার
স্পর্শ ছিল সারাক্ষণ দীর্ঘ দাহতায়
সুন্দর সজ্জাও হ'ল বিধবার বেশ—
অন্তত পাপ তাকে ছুঁয়েছে যখন।

অসামান্য আকাঙ্ক্ষায় ঘুরিয়ে নিজেকে
এখন সে বৃক্ষ ইব স্তব্ধ : তার
বরতনু রূপ বয়সের ধর্ম! তথা
যৌবনের ভার—ভালোবাসা আর ঘৃণা
—এরই যোগফল।
দুয়ে দুয়ে চার হ'ল, তথাপি মেয়েটি
জানলোনা পৃথিবীর ঐকিক নিয়ম।

একথা অজ্ঞাত তবু তার কাছে
অহর্নিশি মৃত্তিকা তাকেই
টেনেছে গভীরে। অতএব
সুখে দুঃখে সংসারখেলায়
প্রেম তাকে স্পর্শ করেনি। সে রইলো
একা, নিঃস্ব, প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের মত।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্য বিচার

কার্তিক লাহিড়ী

সতেরো বছরের একটি তরুণ যেদিন "বন্দীর বন্দনা" কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন, সেদিন চাঞ্চল্যের অন্ত ছিল না। কিশোরের এ-ঔদ্ধত্য প্রবীণেরা ধিক্কৃত করেছেন, বরদাস্ত করতে পারেন নি নবীনেরা কবিকে স্বাগত সম্ভাষণে আপন করে নিয়েছিলেন। প্রবীণ ও নবীনের এ দ্বন্দ্ব ও সাহিত্যিক কলহ বহুদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল; তবু শেষ পর্য্যন্ত যে তরুণদের জয় হয়েছিল এবং যার ফলে আজ অবধি আমরা বাংলা সাহিত্যে "কবিতা" বলে বিভাগটিকে সশ্রদ্ধচিত্তে অনুধাবন ও অনুসরণ করতে পারি, এজন্য সহৃদয় সমাজ শ্লাঘা অনুভব করবেন। এই অনুভব্য শ্লাঘার একমাত্র কারণ এই যে, প্রবীনেরা সেদিন কবিতার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আর নবীনেরা শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা হেলায় তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করতে। অবশ্য বয়সে বৃদ্ধ হয়েও যিনি চিরনবীন সেই রবীন্দ্রনাথ যদি তরুণ কবিদের সস্নেহ প্রশ্রয় না দিতেন অথবা পেছনে এসে না দাঁড়াতেন, তবে এ কবিদের ভাগ্যে যে যথেষ্ট দুঃখ ছিল—একথা না বললেও বুঝতে অসুবিধে হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে রবীন্দ্রোত্তর একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সময়ের সংগে সামঞ্জস্যের সমতা রক্ষা করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। চড়াই উৎড়াই অতিক্রম করে তিনি সমৃদ্ধতর রবীন্দ্রনাথে উপনীত হয়েছেন। এই উত্তরণ-এষণা তৎকালীন নবীন কবিগোষ্টি (বিশেষতঃ কল্লোল, প্রগতি, পরিচয় পত্রিকায় যাঁরা নিয়মিত লিখতেন) সাগ্রহে অনুধাবনে সমর্থ ছিলেন বলে, স্বতঃই অগ্রগতির পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

বস্তুত রবীন্দ্র-প্রেরণা ও এষণা আত্মস্থ করে নবীন কবিরা আপাত এক নতুন সুর যোজনা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে। সেই সুরে এক অপূর্ব উন্মাদনা ছিল: প্রেমকে অমূর্ত না রেখে, সাবয়ব, শারীরী করে বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিলেন কল্লোল প্রগতি গোষ্ঠী। সেই ঝড়ের বিক্ষোভে বাংলা

সাহিত্য আনকথানি নাড়া খেয়েছিল। মুহূর্তের জন্য সচেতন হয়েছিল বাঙালী পাঠক। অথচ এ সুর যে অশ্রুতপূর্ব এমন কথা বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রই অস্বীকার করবেন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের আশ্চর্য পরিণতি ও উৎকর্ষতা আমাদের বিস্মিত এবং মাঝে মাঝে বিমূঢ় করে। প্রথম অধ্যায়ে প্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশ ও সাবয়ব মূর্তি অশ্লীলতার জন্য নিন্দিত হয়েছিল। মধ্য পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ দেহ সম্বন্ধে কেবল এক নৈতিক শুচিতা অনুভব করেছিলেন। হয়তো পিতা দেবেন্দ্রনাথের অতি নৈতিক দৃষ্টিভংগী এ বিষয়ে তাঁকে প্রভাবিত করে এবং বাঙালী পাঠক উচ্ছ্বাস ও আবেগের মধ্যে বৈদেহী প্রেমের প্রতিষ্ঠাকে পছন্দ করতেন বলেই এ পর্যায়ের প্রেম-কবিতা সম্পর্কে যথেষ্ট বিরূপ আলোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি কবিগুরুকে। অবশ্য দেহ ও মনের হরপার্বতী মিলনে প্রেমের সার্থকতা এবং দেহের মধ্য দিয়ে যে বিদেহী প্রেমে উপস্থিত হতে হয়, এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ মহুয়া, পূরবী এবং তৎপরবর্তী কাব্য সাধনা-য়। দেহ সেখানে অস্বীকৃত নয়, বরঞ্চ দেহ ঘিরে প্রেমের ঐশীত্ব এবং মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় অনুদাত্ত সুরের প্রভাবে প্রেমের সাবয়ব প্রকাশ প্রায় উহ্য হয়ে গেছে পাঠক এবং সমালোচকদের কাছে। আর সেই অনুদাত্ত সুরকে উদাত্ত সুরে উচ্চগ্রামে ঘোষণা করলেন নবীন কবিরা, বুদ্ধদেব বসু যাঁদের অন্যতম অগ্রগণ্য। অমন জোর গলায় দেহের কথা বলায় সচকিত হয়ে উঠল সবাই। প্রবীণ সমালোচকেরা মাথা নাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠলেন। 'গেল……গেল' রবে শুচিতা রক্ষার জন্য যুদ্ধসাজে অবতীর্ণ হলেন সাহিত্য-ক্ষেত্রে; "বন্দীর বন্দনা" সম্মান পেল বিদ্রোহী কাব্য হিসাবে। "বন্দীর বন্দনা"য় রূপ পেল তরুণ কবিদের আধুনিকতার বিদ্রোহ।

২

এক দুর্দম বাঁধ ভাঙ্গা আকাঙ্ক্ষার উত্তপ্ত পরিবেশে "বন্দীর বন্দনা"র কবিতাগুলি শারীরী সত্তা নিয়ে প্রকাশিত। সনাতন প্রথা (Convention) এবং শুচিতার প্রশ্রয়ে বাংলা কবিতার বদ্ধ বেগহীন জলাশয়ে বুদ্ধদেব বসু নিয়ে এলেন এক নতুন আশ্বাস, যে আশ্বাস ঈশ্বরের স্তবে নিঃশেষ নয়, আধ্যাত্মিকতায় আরিত হয়ে মনকে আর্দ্র করে না, বরঞ্চ স্মরণ করিয়ে দেয় এ পৃথিবীই সব, শুধু এ পৃথিবীই নয়, মানুষের দেহ-ই একমাত্র আশ্রয় যেখান

থেকে জন্ম নেয় পঙ্কিলতা, আবিলতা। নির্মম বিধাতা "প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দী করি—" রচনা করেছেন মানুষকে, কবিকে। প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী হয়েছেন বলে সমগ্র কাব্য ইন্দ্রিয়গত চেতনায় পূর্ণ। সম্পূর্ণরূপে মানুষের যৌবন এবং যে যৌবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সে-যৌবনে আবার কামের রূপ স্পষ্ট-প্রতিভাত। বারবার এই কাম চরিতার্থের আকুতি ফুটে উঠেছে কবিতাগুলিতে।—

"বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী-রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি ;—"

(•বন্দীর বন্দনা)

অথবা,

মনে করি কথা কবো আকুলি বিকুলি করে কত কথা রক্তের ঘুনিতে
(ওগো কঙ্কাবতী !)
বারেক তাকাই যদি তব মুখপানে।
পৃথিবী টলিয়া ওঠে, কথাগুলি কোথায় হারায়,
খুঁজে নাহি পাই।" (প্রেমিক)

উদ্ধৃতির বাহুল্যে প্রয়োজন নেই। উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিই নয়, সমগ্র "বন্দীর বন্দনা" কাব্যে শরীর তার সাবয়ব মূর্ত্তিতে স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা নারী মুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য্য খুঁজে পেয়েছিলেন যৌন স্বাধীনতা এবং কামের অকুণ্ঠ প্রকাশে। তাঁদের বক্তব্যে আংশিক সত্যতা যে বিদ্যমান ছিল একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, বরঞ্চ তাঁদের প্রাপ্য আমাদের দিতেই হবে, বস্তুত স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে কল্লোল গোষ্ঠীর আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের নতুন অর্গল খুলে দিয়েছে। এবং কল্লোল লেখকদের নব-আন্দোলনে আমরা বিশেষ উপকৃত হয়েছি কিন্তু সংগে সংগে স্মরণ করা কর্তব্য যে, শুধুমাত্র যৌন স্বাধীনতা অথবা জীবনের অন্ধকারতম অংশের পরিস্ফুটন মানুষের সমস্ত সমস্যার মূল নয়। অংশকে অখণ্ড ভেবে তাঁরা ভুল করেছিলেন সে কথা আজ স্বতঃসিদ্ধের মত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় দেহের অকুণ্ঠ প্রকাশ সব চেয়ে তীব্রভাবে প্রকাশিত। কোনরকম স্তোকবাক্য অথবা সুন্দর সুন্দর কথার আচ্ছাদনে

স্ব-বক্তব্যকে নিমজ্জিত না করে বুদ্ধদেব বসু ঘোষণা করেছিলেন,—

"রক্তমাঝে মদ্যফেনা, সেথা মীন কেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায় শিরায় যত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্তমনে রসনা লেহন।"

(বন্দীর বন্দনা)

কিন্তু দেহের দাবী যে ক্ষণিক এবং ক্ষণিকের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর যে হরিষে বিষাদ, বুদ্ধদেব বসু এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই তার মুখে শুনতে পাই—

"শাপভ্রষ্ট দেব আমি!
আমার নয়ন তাই বন্দীযুগ বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি শূন্যতায় উড়ি যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।"

(শাপভ্রষ্ট)

"মোরা তার গান রচি"—কবিতাটিতে অনিন্দ্যসুন্দর ভাষায় কবি যৌবনের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যৌবনকে "আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা"র যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বুদ্ধদেব বসুর যৌবন সে সম্ভাবনার কোন ইঙ্গিত দেয় না। পরোক্ষে কামার্ত যৌবনের এক রুক্ষ, নিষ্ঠুর প্রকাশে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, কিন্তু যৌবন যেহেতু চলমান, উন্মাদ, উদ্দাম সেজন্য "আবর্তে হারায়ে যায় পুঞ্জীভূত কুৎসিত জঞ্জাল।'

"বন্দীর বন্দনা"র কবি দেহ এবং দেহ-উত্তীর্ণ সত্তার দ্বন্দ্বে বিচলিত। তিনি উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছেন এবং স্বভাবতই এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সে উত্তর সুস্পষ্টরূপে কদাচ প্রত্যক্ষ। কিঞ্চিৎ মনোযোগের সংগে আলোচনা করলে বোঝা যায় কবি দেহ-উত্তরণের স্বপ্ন দেখেছেন প্রেমের মধ্যে, অবশ্য এ সন্ধান শুধু অঙ্কুরাবস্থাতেই বিদ্যমান "বন্দীর বন্দনা"য়। দেহের কামনা বাসনা এতই উচ্চ গ্রামে নন্দিত যে, সেখানে—

"তবু আমি অমৃতাভিলাষী!—
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি আর কিছু নয়।"—

প্রভৃতি উদাহরণ আমাদের কানে এসে বাজলেও, মরমে প্রবেশ করে না। বস্তুত সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিতে দেহ সম্পর্কে যে দুর্দাম বেগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, দেহ-উত্তরণের প্রকাশ তাতে চাপা পড়ে এমন কি সময় সময় উক্ত ঘোষণাগুলিকে এরূপ তীব্র আবেগের পর Statement বলে মনে হয়।

৩

"পৃথিবীর পথে" অথবা "কঙ্কাবতী" কাব্যগ্রন্থে আমরা সেই একই সুরের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি। "বন্দীর বন্দনা" এবং "কঙ্কাবতী"র অনেকগুলি কবিতা প্রায় সমসাময়িক, সেজন্য ভাবের বিবর্তন সহজবোধ্য নয়। যে নারী-দেহ ঘিরে কবির অপার রহস্য, প্রেমের যে যুঁই ফুল নারীদেহ আশ্রয়ে প্রস্ফুটিত "বন্দীর বন্দনা"য়, "কঙ্কাবতী" কাব্যগ্রন্থে সেই নারী কবির অপ্রেরণা, কবির প্রেম। অবশ্য আপাত দৃষ্টিতে উক্ত সিদ্ধান্তের বিবর্তনাভাব আমাদের হতাশ করলেও তন্নিষ্ঠ আলোচনায় বুঝতে পারি, বুদ্ধদেব বসু তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের মন আন্দোলনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে কবি যে নারীদেহ-আশ্রিত প্রেমকে উপজীব্য করেছেন, তাতে বিস্মিত না হয়ে, আশ্বস্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুদীর্ঘ "কঙ্কাবতী" অথবা "শেষের রাত্রি" কবিতায় ভাবালুতার চরম পরিচয় থাকলেও, "কঙ্কাবতী" কাব্যগ্রন্থে কবি কিঞ্চিৎ সংযত এবং পরিমিত বোধের অভাব প্রথম কাব্যগ্রন্থে আমাদের পীড়িত করলেও, "প্রেমিক" কবিতার প্রায় নির্বিকার ভঙ্গী, প্রত্যাশাহীন সিদ্ধান্ত—"কঙ্কাবতী" কাব্যের বহু কবিতার ভূমিকা রচনা করেছে। আবেগের উত্তেজনা কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে বলে "কোন মেয়ের প্রতি" অথবা "অন্য কোন মেয়ের প্রতি" কবিতাগুলিতে হাল্কা অথচ ব্যঙ্গের প্রকাশে সুরের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। এসব কবিতায় কোন গম্ভীর বক্তব্য বা তত্ত্ব উপস্থিত করার প্রয়াস নেই, কবি নিজের মাধুরী মিশিয়ে এঁকে চলেছেন নিজের আকুতি। অথচ এ আকুতির মধ্যে রোমান্টিক ভাবালুতা প্রায় অনুপস্থিত।

"তুমি বলবে আমকে ঢের মিথ্যে কথা,
আমি শুনবো মেয়ে।"

অথবা

"কহিবো হাল্কা কথা—বাজে কথা, তুমি যা বুঝিবে।" প্রভৃতি পংক্তিতেই

নয়, অনেক কবিতায় বুদ্ধদেব বসু প্রেম সম্বন্ধে মিথ্যা আশ্বাস বা ছলনার জালে নিজেকে অথবা পাঠককে বিভ্রান্ত করতে চান নি। প্রেমের যে অন্ধকার দিক সম্বন্ধে তিনি সচেতন এবং কৈশোরক উত্তেজনায় প্রেমের মধ্যে যে বিরাট ফাঁকি এবং অন্তঃসারশূন্যতা আছে, সে কথা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না কবির। দেহ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন বলে (এবং দৈহিক উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী বলে) সিনিক মনোভঙ্গীতে প্রেমের নগ্ন অংশ প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত নন। অবশ্য এই বক্তব্য কবির মূল সুর নয়। তিনি মূলত এবং সুখ্যাত রোমান্টিক কবি—তাই তিনি ভ্রমরের গুঞ্জনের মধ্যে শুনতে পান—

"বুকের মধ্যে শুনছি আমার আর একজনের স্বর,
তোরি মতন দুপুর ভ'রে করতো সে গুনগুন।" (বিরহ)

রোমান্টিক কবির প্রত্যাশা গগনচুম্বী। হয় তিনি আকাশের ওপারে পাড়ি জমান, না হয় মনের অতল তলে প্রবেশ করেন। সে প্রত্যাশা স্পর্শ বা গভীরতার তল সন্ধানে প্রায়শই ব্যর্থ হওয়ায় কবির মনে জেগে ওঠে সংশয়, ক্রমে তিক্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত হতে যথেষ্ট কালক্ষেপ হয় না। তাই তার কিছু সাধ থাকে না, তিনি যেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত সিদ্ধান্ত করেন—

"মানবের চিত্ততীর্থে নিত্য স্বর্গ নহে মোর : মরণের তিক্ত
কালকূট
আমার চরমভাগ্য।—(আর কিছু নাহি সাধ)

অবশ্য এ ক্ষণিক সিদ্ধান্তে কবির আস্থা প্রকাশিত হয় না বলেই তাঁকে বলতে হয়—"সহস্রের মাঝে তাই আপনারে বিতরণ করে যাই লক্ষ গানে-গানে।"

"নতুন পাতা" কাব্যগ্রন্থে কবি কোন নতুন সুর সংযোজন করেন নি। বরঞ্চ যে নারীদেহ কখনো কখনো প্রচ্ছন্ন হয়ে ছড়িয়েছিল পূর্ববর্তী কাব্য গ্রন্থগুলিতে, "নতুন পাতায়" সেই নারীই ক্রমে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল ভাবে উদ্ভাসিত। কবি এখানে চুলের আঘ্রাণ স্পর্শ—সব কিছুর মধ্যেই প্রেমের পরিপূর্ণতার সন্ধান পেয়েছেন। কবির প্রেম সংসারের অভাব অনটনের মধ্যে সদাভাস্বর এবং প্রত্যাহিকের ম্লানস্পর্শ লেগে প্রেমের যুঁইফুল শুকিয়ে যাবে, এ ভয়ে ভীত নন তিনি—। গভীর প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেন—

আমি আছি।
আছে আমার নিজের জীবন। (বিনাযুদ্ধে জয়ী)

নিজের প্রতি গভীর বিশ্বাস আছে বলে তিনি নতুন দিনের স্বপ্ন দেখেন বিভোর হয়ে নয়, বাস্তবের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতায়। কবি নিজেকে বিশ্বাস করেন বলেই তিনি প্রেমের প্রতি বিশ্বাস রাখেন, প্রেমিকার উপর সব ভার অর্পণ করেন। প্রেমিকা যখন থাকেন, তখন জল জল করে ওঠে সব কিছু। কবির সত্তা, কবির অন্তর এক নব সম্ভাবনায় দুলতে থাকে, আর যখন তিনি থাকেন না তখন—

"……আমার সময় কাটে না।
রাত বেড়ে যায়, আমি একা।"

মাঝে মাঝে এই একাকীত্ব কবিকে বিচলিত করে তোলে, তিনি উতলা হয়ে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন—

"এ-ঘর থেকে ও-ঘর
আমি তাকে খুঁজে বেড়াই
……এক-একটি মণিময় মুহূর্তে
এক-একটি বাণীহীন প্রত্যাশায়।" (অন্বেষণ)

শুধু এই নয়, কবি ভালবাসার জন্য ভালো লেখবার জন্য শীতের সময় গাছ সাপ প্রভৃতির মত মরে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আসলে, রোম্যান্টিক কবি তাঁর প্রত্যাশিত বা প্রার্থীতাকে না পেয়ে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন যত অভিমান একত্রিত হয়ে তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিনি সমাধানের চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন অথচ সমাধানের সহজ সরল পথ না পেয়ে মৃত্যুর মধ্যে নিজেকে অনুভব করার চেষ্টা করেন। অবশ্য বুদ্ধদেব বসুর জীবন ও মৃত্যুর রোম্যান্টিক যন্ত্রণা তত তীব্র ভাবে প্রকাশিত নয়, তবু "নতুন পাতা"র বহু কবিতায় কবির অভিমান আমাদের মনকে স্পর্শ করে, আর্দ্র করে। "নতুন পাতা"য় কবির আকুতি ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। তিনি প্রেমিকার কাছে বেশী প্রত্যাশা করেন বলেই এই আকুতির পাশাপাশি অভিমানও স্বতই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কবি বুদ্ধদেব এজন্য মিলনের কবি হয়েও মিলন বিরহের দ্বন্দ্বে মাঝে মাঝে ভাবুক হয়ে ওঠেন। নিজের কবি-সত্তাকে তখন তিনি অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখেন—

"লিখিয়ে ছাড়া আর যা কিছুই হতাম
কত সুখের হ'তো সেটা, কত সম্মানের।

কেননা আর কোনোখানেই—কোন কাজেই জায়গা নেই
অকুশল অনিপুণ অশিক্ষিত মূর্খ অযোগ্যতার।"
(নিজের কবিতার প্রতি)

"দময়ন্তী" বুদ্ধদেব বসুর কাব্য সাধনার একটি নতুন পদক্ষেপ। কবি এখানে দেহের জান্তব রূপ সম্বন্ধে সচেতন,—

"তবু জৈব আছে ব্যর্থ নয়।
যে-প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।" (দময়ন্তী)

তিনি জানেন যৌবন মানুষের ক্ষণস্থায়ী—এই যৌবন দেহ একদিন জরার কবলে পতিত হবে, জরা গ্রাস করে নেবে জীবনের সমস্ত সম্ভার। কবি বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত যৌবনের কলোচ্ছাস, হাস্যোজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করেন। অথচ স্ব-সৃষ্ট কন্যা দময়ন্তীর নবরূপের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় প্রেমের মুক্তি খুঁজে পান। একদিকে বার্ধক্যের হতাশা ও যৌবনদ্বেষ দৃষ্টি, অন্যদিকে যৌবনের বেগবান প্রকাশ, অথচ এ যৌবন আবার নিশ্চিতভাবে জরার অধীন—এই দ্বন্দ্ব অতি সুন্দরভাবে প্রকটিত হয়েছে "দময়ন্তী" কবিতাতে। কবি এই কাব্যগ্রন্থে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যৌবন নির্মম, কিছু পরে আবার হতাশা অথবা ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়েছেন—

"যার কিছু নেই, তার যৌবনেও নেই অধিকার
অতি সত্য এই কথা,
তবু প্রতিদিন এর ঘটায় অন্যথা
নির্মম নিয়তি।" (নির্মম যৌবন)

আর এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নিষ্পেষিত হয়ে কবি যেন স্বগতোক্তির মত নিজের নিকট প্রার্থনা করেন—

".....আমার প্রেমের
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে ;"

মনে হয় কবি যেন পরাস্ত হয়েছেন যৌবন ও জরার দ্বন্দ্বে। তাঁর মনে সংশয়

জাগছে, সন্দেহ মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয়, কবি বোধহয় এখানে নিজেকে ভাল করে বুঝতে চাইছেন। অবশ্য "পূর্বরাগ" কবিতার অকুণ্ঠিত আশাবাদে আমরা সচকিত হয়ে উঠি। কবি এখানে যেন সব সংশয়, সন্দেহের উর্ধ্বে উঠে এসেছেন। বিরাট বলিষ্ঠতা নিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন সবাইকে।

দময়ন্তী কাব্যগ্রন্থে একটি নতুন দিকের পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত হই। —যে কবিমন, কবি-সত্তা রোমান্সের কল্পলোকে পৃথিবী, প্রেম, প্রিয়াকে দেখেছে, সেই কবিমন 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থে নিয়ে এসেছে এক নতুন সুর। অন্তত সাত আটটি কবিতায় কবি দময়ন্তীর কাল (অর্থাৎ কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৫—১৯৪২) এবং সেই কালের "মুড্" কে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় কবি বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষাকে যথাসম্ভব উপযুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কবি বুদ্ধদেব বসুর সক্রিয় সচেতনতা এজন্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সমসাময়িক ঘটনাবলী বা বিশেষ একটি মুড বা অবস্থা যে কবিতার উপাদান হতে পারে এবং সেই উপাদান উপযুক্তভাবে পরিবেশন করলে যে উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হয়—"চলচ্চিত্র" "বাঙালী বুদ্ধিজীবী ১৯৪০", "কোন কবিবন্ধুর প্রতি" প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। কবি এখানে প্রচুর পরিমানে বাস্তব-সচেতন হওয়ার চেষ্টা করেছেন; তার প্রমান "ব্যং", "কুকুর", "ইলিশ" ইত্যাদি কবিতাগুলি। অবশ্য ব্যাং, কুকুর প্রভৃতির উপর কবিতা রচনার অর্থই বাস্তব সচেতনতা নয়, এ কথা আমরা ভাল করে জানি। এখানে কবির একটি বিশেষ মুড্‌কে আমরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করি এবং যখন দেখি ব্যাং, কুকুর, ইলিশ প্রতীক না হয়ে আমাদের সাধারণ জীবনের ব্যাং, কুকুর, ইলিশ থেকে যায় তখন কবির বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ থাকে না। (যদিও কবির বাস্তবতা এবং সাধারণ বাস্তব এক নয়) "বন্দীর বন্দনা" কিম্বা "কঙ্কাবতী" কবিতার "সিরিয়াস মুড্" এ ব্যঙ্গের ঝিলিক এসে থাকলেও, কদাচ তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ কিন্তু "দময়ন্তী"র বহু কবিতার চাপা ব্যঙ্গ কখনও কখনও স্পষ্ট ব্যঙ্গ কবিতাগুলিকে বিশেষ মর্য্যাদা দান করেছে।

"দময়ন্তী" কাব্যগ্রন্থ কবির প্রেম, দেহ এবং দেহোত্তীর্ণের দ্বন্দ্বে দোলায়িত। কবি সিদ্ধান্ত নিতে যেন কুণ্ঠিত অথচ এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমাগত দেহ ছাড়িয়ে উঠতে চাইছেন। "দ্রৌপদীর শাড়ি"তে কবি সে দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ

হয়েছেন অথচ দেহ সম্ভব প্রেমের আবেগ, উত্তেজনা নিরুত্তাপ হয়ে যে শান্তি বা স্থৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে মনে হয়েছিল, "দ্রৌপদীর শাড়ি"—সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট উৎসাহিত করে নি। কবি এখানে প্রেম দেহ সব কিছু এড়িয়ে গিয়ে, অন্যান্য কাব্যে প্রেমের সমস্যাগুলির তাৎপর্যপূর্ণ কোন ইঙ্গিত না দিয়েই, বুঝতে পেরেছেন একমাত্র শিল্পীর জীবনই কবির আসল জীবন! স্ব-জীবন ও শিল্পজীবনের মধ্যে বিরোধের কোন আভাস না দিয়েই কবি আশ্রয় খুঁজেছেন শিল্পময় জীবনে—

"তোমার জীবনে এখনও ফলিত ললিত কলার রূপরস,
আমার জীবন শুধু শিল্পের উপাদান।" (প্রৌঢ় প্রেম)

এবং তারই ফলে কবির প্রেম কেমন এক অবয়বহীন সত্তায় প্রকাশিত। প্রেম কবিতায় শরীরের সাবয়ব উপস্থিতি এড়িয়ে গিয়ে কবি আশ্রয় নিচ্ছেন আইডিয়ায়, যার ফলে, "দ্রৌপদীর শাড়ী" কাব্যগ্রন্থ একান্ত অনুদাত্ত স্বরে রচিত। কবি মৃদুকণ্ঠে তাঁর এই আইডিয়ার কথা জানাচ্ছেন—

"কিছু তার জৈব, কিছু তার দৈব।"

এমন নিম্ন গ্রামে বুদ্ধদেব বাবুকে কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়। "দময়ন্তী"র পর "দ্রৌপদীর শাড়ি"র আস্বাদন এবং পরিণতি অনেককে যথেষ্ট উৎসাহিত করবে না, কবির সংগে সংগে পাঠকও যেন নিরুত্তাপ হয়ে পড়েন।

৫

কাব্যালোচনায় অংশ গ্রহণে সমালোচকের কিছু দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব হচ্ছে: কবিকে সঠিক বিচারের দায়িত্ব, কাব্যকর্মের উৎকর্ষতা, অপকর্ষতার বিচার। কবি কি বলতে চেয়েছেন অথবা কতদূর বলেছেন এর মধ্যে সমালোচনা সীমিত রাখলে আমরা পাঠককে বিভ্রান্ত হবার সুযোগ দেবো। সেজন্য কাব্য-উৎকর্ষের গভীরতা, ব্যাপ্তি, কবির জীবন দর্শন, (অর্থাৎ কবির বক্তব্য) এবং তৎসহ কবির ভাব পরিণতি অথবা ভাবের ক্রম অভিব্যক্তি বিচার্য। সম্প্রতি অরুণ ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেছেন। তাঁর অভিযোগগুলি মোটামুটি দাঁড়ায় এই: বুদ্ধদেব বসু কবিতায় কতকগুলি Memorable speech সৃষ্টি করেছেন, দশবছরের ব্যবধানে রচিত কবিতাগুলির মধ্যেও "কাব্যবোধের দিক থেকে বেশী অগ্রসর" হন নি। এবং "তাঁর কাব্যে চিন্তার অস্বাভাবিক দৈন্য মনকে গভীর ভাবলোকে নিয়ে

যেতে অসমর্থ হয়।" অরুণ ভট্টাচার্য অভিযোগগুলিকে যুক্তি ও যথোচিত উদ্ধৃতি দ্বারা একটি প্রামাণ্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। সে কারণে বুদ্ধদেব-অনুরাগী কাব্য-পাঠক যথেষ্ট চিন্তান্বিত হবেন। তাই অভিযোগগুলির সত্যতা নির্ণয়ের চেষ্টা বাঞ্ছনীয়।

"বন্দীর বন্দনা" কাব্যগ্রন্থ দিয়ে সুরু করা যাক্। "বন্দীর বন্দনা"য় কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা এবং সনেট স্থান পেয়েছে। "শাপভ্রষ্ট", "বন্দীর বন্দনা", প্রভৃতি কবিতার আবেগ এবং উত্তাপ আমাদের মনে এক শিহরণ জাগিয়ে তোলে। একটি কিশোরের পক্ষে এমন বেগবান কবিতা লেখা বিস্ময়ের, সন্দেহ নেই। কবিতা দুটিতে উচ্ছ্বাস এবং উত্তাপের আধিক্য আছে—একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, তবুও বল্গাহীন উদ্দাম অশ্বের গতি ছন্দ যেমন আমাদের সজাগ করে দেয়,—মুগ্ধ হয়ে আমরা তার অমিতবীর্য, বাঁধভাঙ্গা গমনের গতিপথ লক্ষ্য করি, তেমনি কবিতা দুটি পাঠে আমরা পুলকিত এবং বিস্মিত হব। "বন্দীর বন্দনা" এবং "শাপভ্রষ্ট" কবিতার মধ্যে বিষয় বস্তুগত উপাদানের কোন বৈসাদৃশ্য নেই, তত্রাচ উদ্দামগতি ও বেগের জন্য কবিতা দুটি আমাদের ভাল লাগে, কিন্তু যখন সেই একই তরলমতি উচ্ছ্বাস, লক্ষ্যহীন গতি, অন্যান্য কবিতায় দৃষ্ট হয়, তখন মনে হয়, **the moment he thinks himself a poet, he is silly**।—'কঙ্কাবতী' কাব্যে সেই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। একমাত্র পার্থক্য উক্ত কাব্যগ্রন্থে "কঙ্কাবতী", "রূপকথা", "শেষের রাত্রি" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় তিনি আশ্চর্য ধ্বনির সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এ ধ্বনিসৃষ্টি কবিকে কোন্ লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে এবিষয়ে কবি সম্পূর্ণ সচেতন নন। একের পর এক ধ্বনি সৃষ্টি হয়েছে, আবৃত্তির সময় সর্বশরীরে এক অপরূপ অর্কেষ্ট্রার সৃষ্টি হয়, কিন্তু যখন নিভৃতে কবিতাগুলির তন্ময় পাঠ করা যায়, তখন কেন যে পর পর শব্দগুলো এলো অথবা কেনই যে তিনি অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াসে মগ্ন হলেন, বোঝা যায় না। এমন কি অর্থের বিশৃঙ্খলতা আমাদের বিমূঢ় করে।

"বন্দীর বন্দনা" এবং "কঙ্কাবতী" কাব্যগ্রন্থে প্রেম সম্বন্ধে অথবা দৈহিক উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে যে সব পংক্তি রচনা করেছেন—অধুনা যে কোন তরুণ কবি সেই সব পংক্তি আরো সুন্দরভাবে রচনা করতেন, এমন কি হাল্কা কবিতাগুলির মধ্যে শুধু চিত্ররূপ ফুটিয়ে অথবা প্রেমিক প্রেমিকার নিতান্ত লাঘুকা সুরের কয়েকটি কথা বলে ক্ষান্ত হতেন না। "কোন মেয়ের প্রতি",

"একখানা হাত", "আমন্ত্রণ-রমাকে" প্রভৃতি অপরিণত কবিতাগুলি অধুনা যে-কোন তরুণ কবি লিখতে লজ্জা পাবেন। বস্তুতঃ দেহ এবং দেহ-উত্তরণের যে দ্বন্দ্বের আভাষ বুদ্ধদেব বসুর কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়, সে বিরোধ তীব্রভাবে প্রকাশের পূর্বে কবি চলে আসেন আইডিয়ার আশ্রয়ে অথচ সে-আইডিয়া বা দর্শন কবির আন্তর অথবা বহির্জীবনের অভিজ্ঞতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে না, কতকগুলি বুদ্‌বুদ্ ছড়িয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অথচ সমসাময়িক জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ অথবা বিষ্ণু দে-র কবিতার ভাব-গাম্ভীর্য এবং গভীরতা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। জীবনানন্দ দাশের প্রেমের কবিতায় যে নিষ্ঠা এবং ভাব-তন্ময়তার আশ্চর্য তাৎপর্য দেখি অথবা সুধীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে দেহ-সচেতন কবি হয়ে প্রেমের যে উচ্চতান তুলে ধরেন, এমন কিছু বুদ্ধদেবে পরিলক্ষিত নয়। বিষ্ণু-দে প্রেম-কে ব্যঙ্গ করেন এক বিচিত্র তীর্যক ভংগীতে। সে-ভংগী স্বকীয় এবং অর্থপূর্ণ—বুদ্ধদেব বসুর কবিতার এই তীর্যকতার সন্ধানও কোথাও পাওয়া যায় না। কৈশোরক উত্তেজনা সম্বল করে শুধুমাত্র দেহ-কে নিয়ে তিনি প্রেমের প্রশস্তি রচনা করেন। জীবন-বোধের গভীর প্রত্যয় অথবা প্রেমের রহস্য কিছুই উদ্ঘাটিত হয় না বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়। অবশ্য "বন্দীর বন্দনা"য় কয়েকটি সনেট সত্যই স্মরণীয় কিন্তু প্রচুর তরল কবিতার মধ্যে সেগুলির সন্ধান পাওয়া প্রায় তপস্যার সামিল।

বস্তুত বুদ্ধদেব বসু কবিতা অথবা উপন্যাস সব রচনাতেই নিজেকে নায়কের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, এবং কেবলমাত্র নিজের ভাবনা-বিলাস, চিন্তার স্বচ্ছন্দ গতিকে প্রকাশ করেন। এই সম্পূর্ণ স্ব-কেন্দ্রিকতার ফলে তিনি পাঠক সম্বন্ধে প্রায়-অচেতন অথবা নির্বিকার। বুদ্ধদেব বসু বিস্মৃত হন যে, শুধুমাত্র তাঁর মনোবৃত্তি অথবা ভাবনা-চিন্তা পাঠকের ইঙ্গিত নয়। পাঠক সেখানে লেখককে নিজের মত করে নিতে পারেন অর্থাৎ কবি যখন নিজের ভাব সবার করে প্রকাশ করেন এবং সেই প্রকাশের মধ্যে কবির ভাবনা চিন্তা কবির নিজস্ব হলেও তাঁর নিজের নয় আবার পাঠক নিজস্ব ভাবলেও ঠিক যেন নিজেরটি নয়—এইভাব পরিস্ফুট হয়, তখন কবি বা লেখক রচনার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা পরিবেশন করতে সক্ষম হন, যার ফলে তাঁর রচনা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু এসব কথা বিশেষ চিন্তা করেন না বলে—আত্মমগ্নতার আবর্তে কেবলই হারিয়ে যান, কিছুতেই উঠে আসতে পারেন না। নচেৎ বৈচিত্র্যহীন

একই বক্তব্যে রচিত একই ধরণের কবিতার স্তূপ তিনি একত্রিত করতেননা 'নতুন পাতা' কাব্যগ্রন্থ। একমাত্র "দময়ন্তী" কাব্যগ্রন্থে কবি বুদ্ধদেব বসু কিঞ্চিদধিক উত্তরণ প্রয়াসে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য "দময়ন্তী" কাব্যগ্রন্থ এতই রবীন্দ্রাশ্রিত যে সেখানে জ্ঞানী এবং রসগ্রাহী পাঠককে যথেষ্ট সতর্কতার সংগে অগ্রসর হতে হয়।

সাহিত্যে প্রভাব

আঁদ্রে জিদ্

[ব্রাসেল্‌স্ এর Libre Esthetique এ ১৯০০ সালের ২৯শে মার্চ প্রদত্ত বক্তৃতার সরল অনুবাদ]

এ-কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে সংসারে ভাল-মন্দ দু' রকম প্রভাবই আছে। এই দু'রকম প্রভাবের মাঝে আমি পার্থক্যের রেখা টানতে চাই না। সব রকম প্রভাবের পক্ষ সমর্থন করে কিছু বলবো, এই আমার ইচ্ছা।

আমি বিশ্বাস করি যে সমাজে এমন অনেক সুপ্রভাবও আছে, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম নয়। বিশ্বাস করি যে সঠিক করে বললে কোন প্রভাবই ভালো বা মন্দর পর্যায়ে আসে না। শুধুমাত্র প্রভাবের ফলাফল যাচাই করেই তার বিচার সম্ভব। এবং আমি আরো বিশ্বাস করি যে এমন অনেকগুলো পরস্পর-বিরোধী প্রকৃতি আছে, যাদের জন্যে পৃথিবীর তাবৎ জিনিষই দুর্ভাগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, যাদের স্পর্শে সব কিছুই ভস্মে পরিণত হয়। আবার এমন কতোগুলো প্রকৃতি আছে যাদের প্রভাবে সব কিছুই মধুর মনে হয় এবং যাদের স্পর্শে নিরস কঠিন পাথরও সরস রূপ পেতে পারে। মহাকবি গ্যেটে বলেছেন: **"I consumed everything that Herder had to teach me."**

সর্বপ্রথম, প্রভাবের প্রত্যক্ষ একটি কথা এবং তারপর প্রভাবিতদের স্বপক্ষে কিছু কথা: আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়ের এ দুটিই হবে প্রধান সূত্র।

গ্যেটে তাঁর "Memoirs"-এ প্রবল ভাবাবেগের সাথে যৌবনের সে-সব দিনের কথা বলেছেন, যখন তিনি বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত করে, একান্ত ইচ্ছার সাথে প্রকৃতির সবরকম প্রাণীকে তাদের স্বকীয় ভঙ্গীতে তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: **"I now experienced a sense of kinship with each and every object around me: a new harmony between myself and nature so very perfect that every change of place, season or time**

affected me profoundly" তিনি সানন্দে সর্ববিধ যাযাবর প্রভাবের হস্তে নিজেকে সমর্পন করেছিলেন।

প্রভাব দু'প্রকারের—(এবং গ্যেটের কথার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলবো কারন সব রকম প্রভাবের পক্ষেই আমায় কিছু বলতে হবে।) প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব প্রভাব আছে। সবচেয়ে 'কম স্পর্শনীয় এবং সবচেয়ে বেশী প্রাকৃতিক' জিনিস নিয়েই আমি আমার বক্তব্য সুরু করবো, এবং শেষের দিকে মানুষ এবং তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলবো। কেননা এ-সব কিছুর ওপর আলোচনায় তর্কের ধুয়োর জন্যে কোন সামান্য অংশও উপেক্ষনীয় হওয়া উচিৎ নয়।

মানুষ নিজেকে কোন মতেই প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারে'না। নীরবে নিভৃতে বসবাসকারী লোকটি পর্য্যন্ত অবশেষে প্রভাবের কাছে অনাবৃত হয়ে পড়ে। প্রভাবের রকম ভেদ যতো কম হবে তার শক্তিমত্তা ততো বৃদ্ধি পাবে। বৃষ্টিমুখর দিনটির জন্যে যদি আমাদের চিত্ত বিক্ষেপ না ঘটে, তা হলে সামান্যতম বর্ষনও আমাদের সহ্য হয় না।

প্রাকৃতিক অথবা মানবিক প্রভাব থেকে মুক্ত এমন একটি লোকের কথা কল্পনাও করা যায় না। দৃশ্যপটে যদি এমন একজন মহাবীরের আবির্ভাবও ঘটে, যার ওপর বহিঃশক্তির কোন প্রভাব নেই বলে মনে হয় বা যাঁর চিন্তাধারা বা কার্যকলাপ (সাধারণ মানুষের কাছে যা স্বতঃস্ফূর্ত ও দুর্বোধ্য বলে হয়) দৃষ্টে যদি মনেও হয় যে তাঁর ওপর কোন মানুষের প্রভাব নেই, তবুও আমরা তাঁর শক্তির ওপর কোন গ্রহ-তারা বা দেবতার প্রভাবের কথা ভেবে নিই।

সাধারণভাবে আমি মনে করি যে, এ-কথা বলা চলে যে ওই সব ব্যক্তি বিশেষ, যাদের যশস্কর কিছু নেই, তাদের ওপর ব্যক্তিগত গ্রহ-নক্ষত্রের যতো প্রভাব অন্য কিছুর তত নয়—অর্থাৎ সে-রকম কিছুর যা সমষ্টিগত ভাবে কোন নগরীর বা গ্রামের অধিবাসীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

তা হলে দেখা যায়, এ-পর্যন্ত দু'রকম প্রভাবের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে। সাধারণ বা সমষ্টিগত প্রভাব, এবং বিশেষ বা ব্যক্তিগত প্রভাব। প্রথম রকম প্রভাব কোন গোটা জাতি, শ্রেণী বা পরিবারকে প্রভাবিত করে এবং দ্বিতীয় রকম করে কোন জাতির, শ্রেণীর বা পরিবারের বিশেষ একটি লোককে। সেই লোকটি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রভাবিত হয়েছে কিনা, তা

জানার প্রয়োজন আমাদের নেই। প্রথম রকমের প্রভাব একটি পরিবারকে ছোট করে আনে এবং দ্বিতীয় রকমের প্রভাব সেই বিশেষ লোকটিকে তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। টেইন নিজেকে প্রথম রকম প্রভাব থেকে মুক্ত মনে করতেন, কারন তা তাঁর সংকল্পকে দ্বিতীয় প্রভাবের তুলনায় বেশী মিথ্যা আশায় ভুলিয়েছে।

কিন্তু মানুষ তার একক প্রচেষ্টায় কখনো কোন নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, আর যে-সব ব্যক্তিবিশেষের কথা আমি বললাম, তারা প্রভাবের চাপে পড়ে দল, জাতি বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তাই একসাথে মিশে যায়। এ-ভাবে জন্ম নেয় নতুন সমাজ, নতুন গোষ্টি—বিভিন্ন অচেনা আঁশের মিলনে সৃষ্টি হয় নতুন সুতো। তাই এমন হয় যে মস্কোর কতিপয় ভদ্রলোক এবং প্যারীর আমি একসাথে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এবং এ-জন্যেই সময়ের বহু প্রশস্ত উপত্যকা পার হয়েও ফ্রান্সিস জেম্‌স্ ভার্জিলের আত্মীয়তার দাবীদার—এবং সেই চীনা কবিটিরও, যাঁর নম্র, চাঞ্চল্যরসাত্মক কবিতা গত বৃহস্পতিবারে আপনার শুনেছেন।

সাধারণ প্রভাবগুলো সংজ্ঞানুসারে অত্যন্ত 'Coarse' 'কোর্স' শব্দটি দুর্ঘটনাবশতঃ সাধারণ (common)-এর প্রতিশব্দ হয় নি। নিৎসে যদি এ কথা না বলতেন যে মদ একটি জাতির চিন্তাধারা ও আচার ব্যবহারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা হলে খাদ্যের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে আমি অবশ্যই ইতঃস্তত করতাম। জর্মনরা যদি বিয়ারে আসক্ত না হতো, তা'হলে তারা কখনও মদ্যপায়ী ফরাসীদের কাছ থেকে আচার-ব্যবহার বা বুদ্ধির প্রাখর্য লাভ করতে পারতো না।

যাই হোক আমি আবার বলছি : প্রভাব যতো কম কোর্স হবে, ততো বেশী হবে তার শক্তিমত্তা। এবং এ-জন্যে আবহাওয়া, ঋতু-পরিবর্তন যদিও বহুলোকের ওপর কাজ করে তবুও এদের প্রভাব এতো ক্ষীন ও দুর্বল যে তারা বহু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গরমে কারো শরীর ভালো থাকে আবার কারো অসুখও করে। কীট্‌স্ শুধু গরমকালে আর শেলী শরৎকালে কবিতা লিখতে পারতেন। ডিভেরা বলেছেন : **"My thoughts run wild in the winds of winter."** এ-ধরণের আরো বহু উদাহরণ আছে।

জলবায়ুর প্রভাব সাধারণ হতে পারে না, বিদেশের মাটিতে ভ্রমণরত

কোন লোকের ওপর তার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তা'হলে এখানে ব্যক্তিগত প্রভাবের কথা ওঠে। রোমে পৌঁছেই গ্যেটে সরবে ঘোষণা করেছিলেন : "Nun bin ich endlich geboren !—"অবশেষে আমি জন্ম নিলাম।" তাঁর চিঠি থেকে জানা যায় যে ইতালীতে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম তাঁর অস্তিত্বের কথা টের পান। কোন কোন ব্যক্তির ওপর বিদেশের মাটির যে সুগভীর প্রভাব আছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এ-ধরণের প্রভাব হলো 'নির্বাচিত' প্রভাব। অর্থাৎ আমার বক্তব্য হলো এই যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজনৈতিক নির্বাসনে বাধ্য না হয়ে ভ্রমণকারী তাঁর তালিকা থেকে যে-কোনো একটি দেশ পছন্দ করতে পারেন। কোন দেশের উদ্দেশ্যে পাল তুলে যাত্রা করতেও যাত্রীর ওপর সে-দেশের প্রভাব আছে। একটি বিশেষ দেশ পছন্দ করার পিছনে নিঃসন্দেহে এ-কারণটি আছে যে, কেউ তাঁর ওপর সে-দেশের প্রভাব আশা করেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে পছন্দ-করা দেশটির প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্তত আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। লেলাক্রয় যে শুধুমাত্র প্রাচ্যের লোক বলে পরিগণিত হবার জন্যেই মরক্কো গিয়েছিলেন এমন নয়, সম্প্রীতি বৃদ্ধিও তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো।

গ্যেটের 'Elective Affinities'-এ উদ্ধৃত লেসিঙ-এর সেই বিখ্যাত সারগর্ভ বাক্যটির উল্লেখ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। প্রবাদটি এতই জনপ্রিয় যে শোনামাত্র আপনার ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা যাবে। "Es wandelt nilmand ungestraft unter Palmen"—যার আক্ষরিক অনুবাদ হলো : "শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে কেউ তাল গাছের নীচ দিয়ে ধীরে সুস্থে বেড়াতে পারে না।" যে-ব্যক্তি অন্যভাবে প্রভাবিত হয়েছে, সে যদি সুস্পষ্টভাবে তা থেকে মুক্ত না হয়, তাহলে কি আমরা তার ওপর জোর খাটাতে পারি ?

হেনরী দ্য রেনা বলেছেন : "Ce frère intérieur que tu n'es pas encore." (অর্থাৎ চামড়ার নীচের সেই ভাইটি যাকে এখনও আমাদের চিনতে বাকী।) সংক্ষেপে আমি এর সাথে তুলনা করবো মেটারলিঙ্কের নাটকের কোন এক রাজপুত্রের, যে আসে রাজকন্যের ঘুম ভাঙ্গাতে। এমনিভাবে কতো কুমারী ঘুমিয়ে আছে আমাদের মনের গভীরে, যারা অপেক্ষা করছে মৃদু একটি শব্দের জন্যে, পুনর্জ্ঞানের দীর্ঘশ্বাসের জন্যে !

মাথার ভেতর গুঁড়ি-মেরে-থাকা ভাব অথবা স্মৃতিশক্তির কসরৎ-লব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে এ-অভিজ্ঞতার তুলনা দিয়ে লাভ কি? এ-কথা হয়তো ঠিক যে বুদ্ধি দ্বারা আমি বিত্তশালী হতে পারি, ভাগ্য গড়তে পারি, কিন্তু বয়সের ক্ষয়ের জন্যে যা অপেক্ষা করে, তাকে পাবো কেমন করে! কৃপণ তার ধনরত্ন রেখে দেয় সিন্দুকের মাঝে, কিন্তু তালা বন্ধ করার সাথে সাথেই তাকে আগের মত রিক্ত মনে হয়।

ভালোবাসার জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন বিশেষ জ্ঞান নেই। রোমে কীটসের নির্জন সমাধির ভাবগম্ভীর পরিবেশে যখন আমি কবির অমর কাব্য পড়েছিলাম, তখন কি আশ্চর্য ভাবেই না তাঁর প্রভাবকে আমার মাঝে ঢুকতে দিয়েছি, তাঁর প্রভাব আমায় অভিনন্দন জানিয়েছে, মন ছুঁয়েছে আর আমার ক্ষীণ যাযাবর চিন্তাধারার সাথে মিশে গেছে। "Ode to a Nightingale"-এ যখন শুনি কবির একটি কণ্ঠ বলছে:

"O, for a draught of vintage! that hath been
Cool'd a long age in the deep-delved earth,
Tasting of flora and the country green,
Dance, and Provencal song, and sunburnt mirth!
O for a beaker full of the warm South,"

তখন মনে হয়, এই সুন্দর কথাগুলো বুঝি আমারই কণ্ঠ-নিঃসৃত!

নিজেদেরকে শিক্ষিত করে, পৃথিবীতে পুষ্পিত হয়ে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের আবার আবিষ্কার করি।

আমি এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন যে আমাদের আলোচনা বর্তমানে এমন বিপজ্জনক স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া এখন কষ্টকর। এটা এখন কোন প্রাকৃতিক প্রভাবের—কি করেই বা বলি—প্রশ্ন নয়, বরং প্রত্যক্ষ মানবিক প্রভাবের প্রশ্ন। এ কথা আমি কি করে বোঝাব যে যদিও প্রভাবকে আমরা আত্মসমৃদ্ধির বিস্ময়কর পন্থা হিসেবে জেনে এসেছি, অথবা নিদেনপক্ষে যাদুকরের অন্তর্দৃষ্টি বর্ধনকারী সুতোর 'ডায়াবলিক বল' হিসেবে জেনেছি, তবুও কি করে জানাব যে হঠাৎ আমরা এমন এক জায়গায় এসে গেছি যেখানে শুধু সন্দেহ আর ভীতির রাজত্ব এবং যেখানে আমাদের মাঝে 'en garde' এর ভাব জেগ ওঠে! প্রভাব এখন কিছুটা

অমঙ্গলসূচক, কারো ওপর আক্রমণ বিশেষ আর 'lese personality'-দের পক্ষে অপরাধস্বরূপ।

এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে আজকের দিনে স্বীয় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন না হয়েই মানুষ 'ইন্‌ডিভিজুয়ালিজম্' নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নিজের ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট সবল না হওয়া সত্ত্বেও 'প্রিয়' জীবন রক্ষার্থে সে তা আঁকড়ে থাকে; তার ব্যক্তিত্ব যদি আমাদের কাছে বা তার নিজের কাছেও দুর্বল মনে হয় তবু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। সামান্যতম কিছু হারাতেও আমরা রাজী নই—এবং এই কারণটিই আমাদের অনাবিল আনন্দস্রোতের পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

ব্যক্তিত্ব হারানোর ভয়েই হয়ত এমন হয়!

আজকের এই জ্ঞানবৃদ্ধ পৃথিবীতে নানারকম ভয় আছে—নতুনের ভয়, পুরাতনের ভয়—তা ছাড়া হালে বিদেশী ভাষার ভয়। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ এবং হাস্যস্পদ হলো ব্যক্তিত্ব হারানোর ভয়। জনৈক তরুণ লেখক একদিন আমায় বলেছিলেন: গোটে পড়তে আমার ইচ্ছে হয় না, যেহেতু আমার ওপর তাঁর প্রভাব আসতে পারে।

লেখকের ব্যক্তিত্ব জিনিসটি এতো স্পর্শকাতর ও দুর্বল যে জিনিষটিতে সহজেই ফাটল ধরে। একে আমরা মৌলিক ব্যক্তিত্ব বলতে পারি। এর মানে হলো অন্যকে কিছু একটা করতে বলে নিজেরও তা করা। প্রায় বছর দশেক আগে "Contes san qui ni que" (অথবা "Tales without this and that") নামে একটি ছোট গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। লেখক প্রতিটি গল্পে সংযোজনাত্মক সর্বনাম ব্যবহার না করে তার নিজের জন্যে নতুন 'ম্যানারিজম', বা নিজস্ব স্টাইল সৃষ্টি করেন।

তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে মহৎ লোকদের ব্যক্তিত্ব তাঁদের অনুভূতির সৃষ্টি। মহৎ লোকদের বুদ্ধি-বিচার গভীরতা এবং সীমা রেখা ধরে অগ্রসর হয়। খুব কম মহৎ লোকই নিজের সম্বন্ধে বাজে ধারণা রেখে যান; যা-রেখে যান, তা-হলো তার সম্বন্ধে একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত চিত্র। এমন কি কেউ বলতে পারে যে তাঁর অনুভূতি মহৎ লোকের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করে।

ভলতেয়ার হোমারের প্রশংসা করেননি, বাইবেলেরও করেন নি আর শিওারের সামনে তিনি হেসেছেন। এ-থেকে কি তাঁর সম্বন্ধে আমরা কোন ধারণাই করতে পারিনে? এ-হলো, নিজের মুখের চারিদিকে সীমারেখা টেনে

কেউ যদি বলেন : 'তোমরা কেউ লাইন ক'টির হাত থেকে রেহাই পাবে না, পাবে না,' তাহলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

সবচেয়ে সেরা বুদ্ধিমান গ্যেটে নাকি বিথোফেনের সুর বুঝতেন না। একবার বিথোফেন গ্যেটের সামনে 'C sharp Minor'-এ সনাটা বাজিয়েছিলেন। শেষ নোট্ বাতাসে মিলিয়ে যেতে তিনি মাথা ফিরিয়ে দেখেন, গ্যেটে নিশ্চল, নিঃশ্চুপ হয়ে বসে আছেন। অবাক-বিস্ময়ে তিনি বলেছিলেন : 'কিন্তু প্রভু আপনিও যদি কোন মন্তব্য না করেন, তা হলে কার কাছে আমি যাব?' এই ছোট্ট কাহিনীটি কি বিথোফেন বা গ্যেটের সুন্দর ছবি আঁকে নি?

এ-সব অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে প্যারাডক্সিক্যাল নয় এবং এর কারণ : নিশ্চয়ই এরা অন্ধ মনোভাবেরই পরিচায়ক, অজ্ঞানতার নয়। শুধু এজন্যে প্রেমে পড়ে কেউ পৃথক হয় এবং প্রেমিক আর সব সুন্দরীকে উপেক্ষা করে তার প্রেমিকার প্রশংসায় মুখর থাকে। এ ধরণের প্রেমের জন্যেই ভলতেয়ার 'লিরিসিজম্' উপেক্ষা করেছেন। গ্রীসের জন্যে সুগভীর ভালোবাসা আর মোজার্টের জন্যে দরদই গ্যেটেকে বিথোফেনের অদম্য ইমোশনালিজম্ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত রেখেছে। তাই তিনি একবার 'D Minor' এ বিথোফেনের সিম্ফনি শোনার পর মেণ্ডেলসনকে বলেছিলেন : 'শুধু অবাকই হলাম।'

বোধহয় এ জন্যেই বলা চলে যে মহৎ স্রষ্টারা তাঁদের প্রিয় জিনিষের ওপর আধ্যাত্মিক আলো এতো তীব্রভাবে নিক্ষেপ করেন যে তার চারিদিকে আর সব কিছু ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। স্রষ্টার বিপরীতপক্ষ কি প্রবুদ্ধ নন? কারণ তাঁরা সব কিছুই বোঝেন এবং কোন জিনিষের ওপর তাঁদের অন্ধ ভালোবাসা নেই।

যারা প্রভাবের ভয়ে দূরে সরে থাকে, তারা অকপটে নিজের আত্মার দৈন্য স্বীকার করে। এতে কোন নতুনত্ব নেই। কারণ আত্মপ্রকাশের হাতিয়ারটিই তারা এড়িয়ে চলে। যদি তারা লুক্কায়িত সম্পদের সন্ধান না করে, তা হলে, আমি মনে করি এর একমাত্র কারণ, তারা যে মাটি থেকে সৃষ্ট এ কথাটিও সন্দেহ করে।

প্রত্যেকটি মহৎ লোকের একটি মাত্র অভিষ্ট : মানুষ হওয়া—অথবা এ ভাবেও বলা চলে : সম্ভাব্য banal হওয়া। সেকস্‌পীয়র, গ্যেটে, ব্যালজাক্ মলেয়র, টলষ্টয়—এঁদের মতো banal হওয়া···আশ্চর্যের কথা এই যে, এমন

ভাবে তাঁরা সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব লাভ করেন। আর যারা নিজেদের স্বার্থে মানবতা থেকে দূরে সরে থাকে, তারা শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত, রুগ্ন আর দুর্বল হয়ে ওঠে। ধর্মগ্রন্থ থেকে কি উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত হবে? প্রকৃত অর্থের ব্যত্যয় ঘটার সম্ভাবনা যখন নেই, তখন বলতে আপত্তি কি! "Whosoever shall seek to save his life (his personal life) shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it." (অথবা সংক্ষেপে বলা চলে : "Will render it truly alive.")

তাই আমরা দেখতে পাই, কোন মহৎ লোকই প্রভাবের ভয়ে ম্রিয়মান থাকেন না, বরং সাগ্রহে তাদেরকে খুঁজে বের করেন। তাঁদের এ-আগ্রহ আত্মার আগ্রহ।

গ্যেটের মন-মানস কতো রত্ন-সম্ভারে সমৃদ্ধ ছিলো এবং তাঁকে ধন্যবাদ যে তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রতিটি দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। অথবা নিৎসের ভাষায় : "কোন কিছুকেই নিষেধ করেন নি।" বস্তুত মনে হয়, গ্যেটের আত্মচরিত তাঁর প্রভাবের কথায় ভরা। গোৎজ-এর জাতীয়তা, ফাউস্টের মধ্যযুগ, 'Iphigenes'-এর গ্রীক, তাসোর ইতালিয়ান তাঁকে প্রভাবিত করেছিলো। জীবনের শেষদিকে হ্যামার-কৃত দিওয়ান-ই-হাফিজের অনুবাদ পড়ে তিনি এতোই প্রভাবিত হন যে সত্তরোর্ধ বয়ঃক্রমকালে ফার্সী শিখে তিনি নিজের 'দিওয়ান' লেখেন।

যে মহান ভাবাবেগ গ্যেটেকে ইতালীর দিকে টেনে নিয়েছিলো, তাই দান্তেকেও ফ্রান্সের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। দান্তে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁকে ইতালী আর প্রভাবিত করতে পারবে না, তাই তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবের ছায়ায় আসেন।

একথা জোর দিয়ে বলতে হবে যে, এ পর্যন্ত আমি যে প্রভাবের ভয় সম্বন্ধে বললাম, তা হলো আধুনিক কালের রোগ-স্বরূপ এবং শিল্পে এ্যানার্কির শেষ ফল। পূর্ববর্তীকালে এটি অজানা ছিলো। প্রতিটি মহৎ যুগে শিল্পীরা একত্বের জন্যে খুব চেষ্টা না করেও তা পেয়েছেন। একটি বিস্ময়কর উৎস স্থানে সব শিল্পীরা একত্রিত হন এবং জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন-হয়ে-যাওয়া লোকদের মতো তাঁরাও একটি সমাজ গড়ে তোলেন এবং জনসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষন করেন। রেসিন কি অন্য নাট্যকারকে অনুকরণ করার

বিষয়ে খুব উদ্বেগকাতর ছিলেন? কোন কোন সমালোচকের মতে নিজের জন্মের ওপর 'Jansenism' এর প্রভাব থাকায় Phèdre কি স্বীয় স্বাভাবিক মূর্তি হারিয়েছেন। ডেকার্তের প্রভাব থাকায় সপ্তদশ শতকের ফ্রান্স কি অনুজ্জ্বল? সেকস্‌পীয়র তাঁর নাটকে প্লুটার্কের বহু চরিত্র ব্যবহার করায় বা তাঁর পূর্ববর্তী বা সমকালীন লোকদের ছায়াবলম্বন করায় কি লজ্জিত, তাঁর চরিত্রগুলো কি ম্লান?

একদিন আমি আমার জনৈক তরুন বন্ধুকে তাঁর প্রতিভার উপযোগী একটি বিষয় নির্বাচিত করে দিয়েছিলাম, এবং বিষয়টি তিনি ইতিপূর্বে ভাবতে পারেন নি বলে আমার বিস্ময়ের অন্ত ছিলো না। প্রায় এক সপ্তাহ পর আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি বিষাদ মলিন হয়ে ভগ্নহৃদয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কি? কারণ জানার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে গেলাম। দুঃখভরা কণ্ঠে তিনি বললেন: "বন্ধু, আপনার দোষ দিচ্ছি না, কারন আমি জানি, আন্তরিকতা নিয়েই আপনি আমায় উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধু, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, এ ধরনের উপদেশে আমার প্রয়োজন ছিলো না। কারন, যে বিষয়টির কথা আপনি অন্যদিন আমাকে বলেছিলেন, ঘন্টাখানেক আমি 'নিজে নিজেই' তার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু এ নিয়ে আমি কি করতে পারি? আপনিই প্রথম আমায় বিষয়টির কথা বলেন, তাই আমি কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছিনে যে এটা আমার মৌলিক আবিষ্কার।"—সে মুহূর্তে আমি হতবাক হয়ে পড়েছিলাম। এবং ভেবেছি আমি আর উপদেশ দেব না! বেচারা 'মৌলিকতার' ভয়ে ভীত!

শোনা যায়, গোগোলকে পুশ্‌কিন একদিন বলেছিলেন: "বন্ধু, দিন কয়েক আগে একটি গল্পের প্লট আমার মাথায় এসেছে। আমার মনে হয় প্লটটা চমৎকার। কিন্তু আমি জানি ওটাকে আমি যথাযথভাবে রূপ দিতে পারবো না। তোমার এ ভার নেয়া উচিত। আমার মনে হয়, তোমার বিশেষ প্রতিভা দ্বারা এটা নিয়ে বেশ কিছু একটা করতে পারবে। এটা নিয়ে কিছু করো!" গোগোল তাঁর 'Dead Souls', যার জন্যে তিনি অক্ষয় সম্মান পেয়েছেন, এমনিভাবেই লিখে গেছেন।

বিষয়টি নিয়ে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে প্রমান করা যায় যে শিল্প সাহিত্যের মহান যুগ, সবচেয়ে উর্বরা যুগ বিশেষভাবে প্রভাবের ওপর

নির্ভরশীল। দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রীক সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত অগাস্টাসের কাল, এবং অতীতের স্মৃতি দ্বারা প্রভাবিত ইংরিজী, ফ্রেঞ্চ ও ইতালিয়ান রেনেসাঁসের কথা উল্লেখযোগ্য।

এক কথায় সাহিত্যের কোন 'স্কুলই' নেই। আমাদের প্রবুদ্ধ লেখকগণ একে অন্যকে অনুকরণ করার ভয়ে, অন্য কিছুর নিকট নম্রতি স্বীকার করার দুর্ভাবনায় অনিশ্চয়তা, সংশয়বাদ এবং অস্তিত্বের জটিলতা দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত চিন্তা দ্বারা নগন্য, কেন্দ্রিক দূরত্ব বাড়িয়ে তুলেছেন।

মহান্ লোকেরা যদি প্রভাব খোঁজ করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে তার মন-মানস সমৃদ্ধ। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বালকসুলভ বিস্ময় এবং ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সমৃদ্ধির জন্যে তাঁরা সমান অপেক্ষা করেন। অন্যদিকে যাঁদের মন সমৃদ্ধ নয়, তারা সব সময়ে ভীত থাকে গস্‌পেলের অনুশাসন সত্য হবে মনে করে: "For unto everyone that hath shall it be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath". এখানেও দেখি দুর্বলের প্রতি জীবন কঠোর। প্রভাব থেকে পালিয়ে বেড়ানোর এটা কি কোন কারণ? না। কিন্তু দুর্বলেরা তো তা'হলে মৌলিকতা হারিয়ে ফেলবে।

কোন একটি ভাবধারার সব গুণাবলী প্রকাশ করা বা তাকে একটি প্রশস্ত উপসংহারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বহুলোকের প্রয়োজন। সেকস্‌পীয়রের প্রভাব এতোই অসীম ছিল যে তাঁর আশেপাশের সব নাট্যকারদের ওপর অনেকদিন পর্যন্ত কুয়াশার একটি আবরণ ছিলো। যে ভাবধারা 'ডাচ্ স্কুল অব্ পেন্টিঙ্'কে উন্নত করেছিল, তা মূলে কি কোন তেরবার্গ মেৎসু অথবা কোন পিটার ডু হুচ্ দ্বারা স্তিমিত হয়েছিলো? না, মোটেই না। তাঁদের প্রত্যেকের, এমন কি আরো অনেকেরই যে তখন প্রয়োজন ছিলো!

চূড়ান্ত কথা হলো, যদি একদল মহান্ শিল্পী নিজেদেরকে কোন মহান্ ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করে আনেন, তাহলে তাঁদের পেছনেও একদল তরুণ ঘুরে বেড়াবে। এরা প্রকৃতিগত ভাবেই ভাবধারাটিকে তরল করে আনবে, তুলনা করবে এবং অবশেষে ধ্বংস করে দেবে। এ-ধরণের শত্রুতা সম্বন্ধে আমার সামান্যতম জ্ঞানও নেই। সে সব লোক, যারা জিনিষটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে চাইবে, বস্তুত তারাই তাকে শক্ত মজবুত করে তুলবে। কিন্তু আমি

তাদের কথাই বলছি, যারা নিজেদেরকে 'ক্রুসেডার' মনে না করে শবাস্তরণ-বাহক ভাবে। এবং যেহেতু ভাবধারার জন্যে মানুষের প্রচণ্ড ক্ষুধা, তাই যাঁরা ভাবধারাকে সাধারণ করে তোলেন এবং স্তম্ভমূল থেকে দূরে নিয়ে আসেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁরা সর্বসাধারণকে নতুন ভাবধারার জন্যে উদ্বুদ্ধ করবেন। পরে তা সত্যের পর্যায়ে এসে যাবে। এ-ভাবেই পরিবর্তন সূচিত হয়।

ফিলিপ ভন্ ডিক্-রা সুখী হোন, কারণ তাঁরা 'Coup de grace' দান করে মুমূর্ষু 'ডাচ্ স্কুল অব পেন্টিঙ'কে যদেচ্ছাচার শাসন থেকে আইনানুগ মুক্তি দিয়েছেন।

সাহিত্যের দিক থেকে আপনি নিঃসংশয় হতে পারেন যে 'Free verser-'রা এমন কি তিনি ত্রিফিল বা ভেলহেরেনরা 'পারনেশিয়ান্' স্কুলের ওপর নিশ্চিত যবনিকাপাত করেননি। এ-জন্যে দায়ী পারনেশিয়ানরাই, যাঁরা তাঁদের শেষ নৈবেদ্য দ্বারা স্কুলকে মঠে পরিণত করেছেন।

এ-সাথে যোগ করা যায় আরো একটি বক্তব্য : যারা প্রভাবের ভয়ে ভীত হয়ে দূরে দূরে পালিয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তারা নিঃসংশয়ে এর ফল ভোগ করবে এবং কালক্রমে 'individualist'-দের দলে ঢুকে যাবে। সত্যি কথা হলো এই যে, এ-সব লোক আর্টের সঠিক পথ সম্বন্ধে অবহিত নয়। ভয় তাদেরকে বিরত রাখে ওপরের আবরণ ছিদ্র করে নীচে দৃষ্টি দিতে। শুধুমাত্র জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে তারা স্বাদ গ্রহণ করে। তারা যা চায় তা হলো কর্মের বাহ্যিক রূপ, "the artistic know-how"—শিল্পের 'raison d'etre' তাদের কাছে অননুভূত। মনে হয় তারা বিশ্বাস করে, মূর্তির আবরণকে কেউ তুলে দিতে পারে, আবার তাকে ভেঙ্গে চুড়ে মহান্ কীর্তি গড়া যায়।

গভীর প্রভাবের অভিলাষী প্রকৃত শিল্পী শিল্পের বাহ্যিক আবরণ ভেদ করে ভেতরকার রহস্য জানতে চান। তিনি সব সময় শিল্পের সম্পূর্ণতাকে বিচ্ছেদের সীমা রেখার চিহ্ন মনে করেন। এর গভীরে যেতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। শিল্পের নেপথ্যে থাকা মানুষটির খোঁজ নিয়ে আমরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারি।

অপকট অনুকরণে দোষ নেই। আজকের দিনে আমাদের তরুণ শিল্পীরা যে অনুকরণ বিমুখ, তা' প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

মাইকেল এ্যাঞ্জেলো পুরাতনকে অনুকরণ করে তার শিল্পীজীবন শুরু করেন। অনুকরণের উৎকর্ষতার জন্যে তাঁর বহু ষ্ট্যাচু, যেমন 'Sleeping Cupid' মনে হয় ধ্বংসস্তূপে পাওয়া অতীতের নিদর্শন। পুরোনো ভাবধারায় করা তাঁর এক একটি স্ট্যাচু মনে হয়েছে কবর থেকে তোলা অতীতের গ্রীক মার্বল। মন্তেন, যিনি জীবনের একটা বড় অংশ অতীতের নিদর্শনের মাঝে কাটিয়েছেন, তিনি নিজেকে মৌমাছির সাথে (যা—"pillage here and there among the flowers) তুলনা করেছেন। তারা শুধু সংগ্রহ করেছে 'which is their entirely own' এবং তাদের শ্রমের ফসল আর "thyme nor majoram' নয়। এ-শুধু মন্তেন এর পক্ষেই বলা সম্ভব।

শিল্পীর রেখার, অথবা লেখার কোন না কোন বক্তব্য আছে এবং তার ব্যাখ্যা মেলে প্রভাব থেকে এবং তা-ই তার পরিবর্দ্ধন সাধন করে। ডেকার্তে শুধুমাত্র "Discourse on method" বা "Meditations"-এর লেখক নন। কার্টেসিজমের স্রষ্টাও তিনি। কখনও কখনও মনে হয়, তাঁর প্রভাব তাঁর সাহিত্যকীর্তি থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁকে অনুসরণ করছে। বহু নীরব শতাব্দী অতিক্রম করে হঠাৎ ফ্রান্সের সপ্তদশ শতকের চিন্তাধারা জেগে ওঠে, আরিষ্টটলের "Poetics" সম্বন্ধে ও এ কথাই বলা চলে। কোন কোন মহাপুরুষদের পরবর্তীকালের পর তাদের প্রভাবই প্রধান 'কাজ' বলে স্বীকৃতি পায়। যেমন দু'জনের আমি নাম বলছি : সক্রেটিস ও যীশুখৃষ্ট।

[মহাপুরুষদের কাজ ও দায়িত্ব প্রায়ই আলোচিত হয়। খ্রীষ্টধর্মের স্বার্থে শহীদদের জন্যে যীশুখ্রীষ্টকে কেউ দায়ী করে না, (এখানেই স্যালভেশনের প্রশ্ন ওঠে) অথচ নিজেদের ভাবাদর্শের বিয়োগাত্মক ফলের জন্যে বহু লেখককে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা হয়েছে। শোনা যায়, 'Werther' প্রকাশের পর য়ুরোপে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে যায়। লারমনটভের কোন কবিতার জন্যে রাশিয়াতেও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। লা রোচেফোকল্ড এর 'Maxims' সম্বন্ধে মাদাম ত স্যেভনি বলেছেন : বইটি পড়ার পর পাঠকের সামনে দু'টি উপায় থাকে। এক আত্মঘাতী হওয়া, দুই ক্রিশ্চিয়ান হওয়া।]

বিদেশী কবিতা

ফেদেরিকো গারথিয়া লোর্কা

বন্ধ্যা কমলা গাছের গান

কাঠুরিয়া,
কেটে ফেলো আমার ছায়াকে আমার থেকে
মুক্তি দাও আমায়
নিষ্ফলা জীবনের বেদনা থেকে।

কেন আমার জন্ম হলো আয়নার ভিতরে ?
দিন আমার চারদিকে হেঁটে যায় বৃত্তাকারে
আর রাত্রি রেখে যায় আমার অঙ্গুলিপি
সমস্ত তারার মাঝখানে।

আমি বাঁচতে চাই আমাকে না দেখে !
আমি স্বপ্ন দেখব
শিশিরে আর কাঁটাগাছে
আমার পাতা আর আমার পাখি।

কাঠুরিয়া,
কেটে ফেলো আমার ছায়াকে আমার থেকে।
মুক্তি দাও আমায়
নিষ্ফলা জীবনের বেদনা থেকে।

ডাস্ স্টুণ্ডেনবুখ থেকে

রাইনর মারিয়া রিল্‌কে

সেই ভবিষ্যৎ তুমি মহান রক্তিম সূর্যোদয়
নিম্নে আদিগন্তব্যাপ্ত প্রশস্ত কালের সমভূমি।
নিশান্তে কুঁকাড়োর কণ্ঠে বেজে ওঠো স্নিগ্ধ প্রার্থনায়
ভোরের ভৈরবী তুমি শিশিরাক্ত অচিন্ তরুণী
যদিও জননীকল্প তোমাকে মৃত্যুই মনে হয়।

নিয়ত নির্দেশ মেনে নিয়তির বিচিত্র রূপের
আড়ালে বর্ষিত হও গহন নির্জনে অবিরত
অনভিনন্দিত কোনো অ-শোকবন্দিত আঁধারের
বর্ণনার ঊর্দ্ধে যেন অনমিত অরণ্যের মত,
আবদ্ধ ওষ্ঠের নিচে সত্তার নিগূঢ় পরিচয়
নিহিত যেখানে সেই বস্তুবিশ্বে সারকেন্দ্র তুমি।
নিজেকে বোঝাতে চাও নিকল্পের সহস্র আশ্রয়
তীরের দৃষ্টিতে তরী, তরীর নয়নে তটভূমি।

অনুবাদ : সুরজিৎকুমার দাশগুপ্ত

বাংলায় তানসেনের ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রভাব

ষোড়শ শতাব্দীতে তানসেনের অভ্যুদয় ভারতীয় সঙ্গীতের এক স্মরণীয় যুগ। তাঁর সঙ্গীতের চিরন্তন আদর্শ কালের প্রবাহে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। সঙ্গীত এবং অন্যান্য শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য মধ্যযুগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তানসেনের সঙ্গীত সৃষ্টির মূলে ছিল তাঁর গুরু হরিদাস স্বামীর আন্তরিক শিক্ষাদান ও আশীর্বাদ। স্বামী হরিদাস ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে তানসেন সঙ্গীত স্রষ্টা হবেন। তানসেন যথাযথ তাঁর গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং ভারতীয় সঙ্গীতকে নবরূপে শ্রীমণ্ডিত করে তাঁর গুরুর ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক করে তুলেছিলেন। ভাবের আদানপ্রদানই শিল্পের উৎকর্ষতা—তানসেন এই মর্ম্ম উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর প্রগতিশীল ও উদার চিন্তা-ধারায় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেন। তিনি ধ্রুপদ ও আলাপ পদ্ধতির সঙ্গীতকে যেভাবে রূপায়িত করেছিলেন তাকে সম্পূর্ণই নবসৃষ্টি বলা যায়।

তানসেনের সময়কে (১৫৩১-১৫৮৯) ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠযুগ বলা যায়। মোগল সাম্রাজ্য তখন সম্পদ ও প্রতিপত্তির চরম সীমায় উপনীত। সহৃদয় সম্রাট আকবরের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পের পূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। বিশেষত ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশীয় শিল্প সংস্কৃতির আদানপ্রদানের ফলস্বরূপ ভারতীয় সঙ্গীত মাধুর্য্যরসে মহীয়ান হয়ে উঠেছিল। উদারপন্থী সম্রাট আকবর ও তানসেন উভয়েই এই মহৎ বাণীর সমর্থন ও প্রচার করেছিলেন যে শিল্পকলা জাতীয় প্রগতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না—সে যুগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে এবং উন্নত ধারাকে বরণ করবে।

যখন তানসেন দিল্লী তথা উত্তর পশ্চিম ভারতের সঙ্গীতাকাশে উজ্জ্বল তারকারূপে প্রতিভাত তখন পূর্ব্বভারত বিশেষতঃ বাংলা দেশ বৈষ্ণব পদাবলীর অপরূপ ভাবৈশ্বর্য্যে দীপ্যমান। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব-মাহাত্ম্য ও সেকালের বাংলার প্রচলিত সঙ্গীতধারায় এক সুগভীর যোগ ছিল। এতদ্ব্যতীত বাংলার বিভিন্ন পল্লীগীতির ভাবধারা, যা' চর্য্যাগীতি ও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা' এক অভিনব সৃষ্টির জন্য অপেক্ষামান ছিল।

তানসেন যখন ধ্রুপদ এবং তাঁর সৃষ্ট রাগের মাহাত্ম্য প্রচার করেন তখন পদাবলী কীর্ত্তন এবং বৈষ্ণব কবিগণের অতুলনীয় সাহিত্য পদাবলী কীর্ত্তি এরূপ এক শিল্পভাব-সমন্বিত সঙ্গীতের আবির্ভাবের জন্য উৎসুক ছিল। তানসেনের পূর্ব্বে ভারতীয় সঙ্গীত ছিল শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ। তানসেনের উদার চিন্তাধারায় এ সকল সঙ্কীর্ণতা অপসৃত হয় এবং ভবিষ্যৎ যুগে সঙ্গীতের নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। পরবর্ত্তী যুগে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি প্রভৃতি যে রাগসঙ্গীত পর্য্যায়ভুক্ত হয়েছিল তার সূচনা হয় তানসেনের সময়ে। তানসেনের রচিত অধিকাংশ গানই ভক্তিমূলক এবং "ভজন গান" যা' ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিশেষ অঙ্গ, তার সুরমাধুর্য্যের বহুলাংশ হরিদাস স্বামী ও তানসেনের সঙ্গীত থেকে গৃহীত। বাংলা দেশেও সঙ্গীত রচনার মধ্যে কাব্যপ্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। হরিদাস স্বামী, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তগীতিকারগণের ন্যায় বাংলাতেও পরবর্তী যুগে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক কবিদের মধ্যে সাহিত্য ও সঙ্গীতের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের প্রগতিমূলক ধারা পুনরায় ব্যাহত হয়। দিল্লীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সঙ্গীত শিল্পীগণ বহুদূরবর্তী অঞ্চলে ও করদ রাজ্যের শান্ত পরিবেশের মধ্যে চলে আসেন। বাংলা চিরদিনই গুণের মর্য্যাদা দান করে এসেছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিয়েছে। এই সময় তানসেনের ধ্রুপদ সঙ্গীত বাংলায় এক নব অনুপ্রেরণা আনে। এই প্রসঙ্গে বাংলার বিষ্ণুপুরের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন —যেখানে তানসেনের প্রবর্তিত সঙ্গীতধারা সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় এবং যে স্থান সমগ্র ভারতের মধ্যে মার্গসঙ্গীতের মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক পটভূমিকার বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। স্বাধীনতা

রক্ষাকল্পে বিষ্ণুপুরের সাধনা ও সংগ্রাম শিল্প সংস্কৃতির আদর্শ, সমাজ ও রাষ্ট্র-নীতির উদারপন্থা এবং আইনশৃঙ্খলার সুব্যবস্থার গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন ও রাজা প্রজাগণের মধ্যে ঐক্য থাকায় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির সঙ্গীত ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বের প্রায় দুইশত বৎসর পরে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিং (অষ্টাদশ শতাব্দী) সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি অতিশয় সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। বাংলায় মার্গ সঙ্গীত প্রচলনের উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করেন। উত্তর ভারত সফরকালে তিনি দেখলেন—একসময়ে যে-দিল্লী সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য চারুকলার সাধকদের সমাদরের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকতো—আজ সেখানে সব দ্বার রুদ্ধ। দিল্লীতে রঘুনাথ সিং খোঁজ পেলেন ৬৬ বৎসরের বৃদ্ধ তানসেনের বংশধর বাহাদুর সেনের। রাজধানীর এক নির্জন পল্লীতে সাধনায় মগ্ন। নামে মাত্র সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের দরবার থেকে তিনি প্রায় বিদায় নিয়েছেন। মহারাজ তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করতে অনুরোধ করেন। বাহাদুর সেন বহুদিন যাবৎ দিল্লীর রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সাগ্রহে মহারাজের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতের রাজধানী ত্যাগ করে সুদূর বাংলার বিষ্ণুপুরে আসেন। সেখানে তিনি মহাসম্মানে ও পদমর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ধ্রুপদ সঙ্গীতের আদর্শ শিল্প ও শ্রোতাবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং সুদীর্ঘ পনেরো বৎসর কাল সঙ্গীত প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে বাহাদুর সেনের একটি পাণ্ডুলিপি ছিল যা' তিনি ধর্ম্মপুস্তকের ন্যায় শ্রদ্ধা ও যত্নে রক্ষা করতেন। এতে তানসেন রচিত প্রায় পাঁচ হাজার গান লিখিত ছিল এবং প্রথম পৃষ্ঠা তানসেনের স্বীয় হস্তাক্ষর দ্বারা ভূষিত ছিল। বংশানুক্রমে এই পাণ্ডুলিপি তাঁরা রক্ষা করে আসছেন। একাশি বৎসর বয়সে বাহাদুর সেন বিষ্ণুপুর থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং মক্কা তীর্থে যান। সেখান থেকে ফিরে তিরাশি বৎসর বয়সে রামপুরে ইহলোক ত্যাগ করেন। মক্কা যাত্রার পূর্ব্বে তাঁর শেষ বাণী অদ্যাপিও বাংলার শিল্পীগণ সঙ্গীতের সারমর্ম্মরূপে স্মরণ করে থাকেন। তাঁর বাণী ছিল—"আমি যে সঙ্গীত প্রচার করে গেলাম তার কোনদিন বিরাম

নেই—সে অনন্তকাল জ্যোতিষ্করূপ প্রতিভাত থাকবে—যে সঙ্গীত আমি দান করে গেলাম তা' আমার মহামহিম পূর্ব্বপুরুষ তানসেনের যথার্থ ধারা।" বাহাদুর সেনের শিষ্য পরম্পরায় এই সঙ্গীতের মর্য্যাদা যথারীতি রক্ষিত হয়েছিল। মোগলসাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে শিল্প সংস্কৃতির ঘোর দুর্দ্দিন এসেছিল, কিন্তু তা'কে রক্ষা করেছিল ঘরানা সঙ্গীত সম্প্রদায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজন্যবর্গ।

গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদু ভট্ট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতি বাহাদুর সেনের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ তানসেনের গান প্রচার ও স্বরলিপি দ্বারা সংরক্ষণ করে সঙ্গীত জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন। বিশেষত যদু ভট্ট একজন প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদ রচনিতা ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে আর এক দুঃসময় আসে। বৃটিশের রাজ্য পত্তনের সঙ্গে ভারতের নব্যসমাজ পাশ্চাত্য মোহবশত জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রতি উদাসীন হন। দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ মনোভাব, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পের পক্ষে চরম ক্ষতিকর। দেশ তখন নানা সংস্কারে পূর্ণ। এই সময় রাজা রামমোহন রায় ভারতের শাশ্বত আত্মার প্রতীক স্বরূপ আবির্ভূত হলেন এবং দেশকে এই চরম দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার যা' কিছু শ্রেষ্ঠ ও যুগোপযোগী তাঁকে গ্রহণ করতে এবং সেই সঙ্গে দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও পূর্ণ মর্য্যাদা দানের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন। দেশের নানাবিধ সংস্কারের সঙ্গে তিনি শিল্পকলারও সংস্কার করেন। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ ধ্রুপদ সঙ্গীতকে তিনি ভগবৎ উপাসনার অঙ্গীভূত করেন। নূতনকে বরণ করাই যুগের ধর্ম্ম, কিন্তু পুরাতননো উপেক্ষা করে নয়—এক কথায় বলা যায়, রামমোহন ধ্রুপদকে বর্তমান যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তারপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম্ম সঙ্গীত রচনায় প্রধানতঃ ধ্রুপদ সঙ্গীতের সহায়তা নিয়েছিলেন। তানসেনের যে সঙ্গীত বাহাদুর সেন কর্তৃক বাংলায় প্রচারিত হয়েছিল সেই সঙ্গীতের ধারা আবার এ যুগে নব রূপে প্রকাশ পেল কবিগুরুর রচিত ধ্রুপদাঙ্গীয় ধর্ম সঙ্গীতের মধ্যে। কবিগুরুর অতুলনীয় বাণী ও ভাবের সমন্বয়ে সে সঙ্গীত হয়ে উঠল আরও প্রাণবন্ত। এই প্রসঙ্গে বলা

প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গবেষণা কালে দেখা যায় যে তাঁর রচিত বহু গানের মূল হিন্দীগান তানসেন বিরচিত। সুতরাং তানসেনের গান বাঙ্গলার সঙ্গীত শিল্পী ও গীতিকারগণের কাছে পাওয়া যায়। বিশেষত, রামমোহনও রবীন্দ্রনাথের জন্যই তানসেনের ধ্রুপদ সঙ্গীত বাংলা দেশে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এতদ্ব্যতীত, বাংলা ভাষায় রচিত মার্গ সঙ্গীত গ্রন্থে তানসেনের গান যে পরিমাণ ধ্রুপদ স্বরলিপি সহ রক্ষিত হয়েছে তা' ভারতের অন্য কোথাও হয় নি। বাংলার সঙ্গীতকারগণ তানসেনের ধ্রুপদকে অনাগত কালের জন্য রক্ষা করে গেছেন। প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ বাংলা তানসেনের ধ্রুপদের অনুশীলন করেছে শুধু অনুশীলন নয়, বিলুপ্তি থেকে তাকে রক্ষা ও প্রচার কল্পে আত্মনিয়োগ করেছে।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি

রাজা নাটকের গান

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরস্মৃতি : শ্রীজীবনময় রায়। স্বরলিপি শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই।
সে-যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা।
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাঁধা।
তবু ছুটব পিছে মিছে-মিছে পাই বা নাহি পাই—
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে—
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে।
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা যা নেই তারি ঝোঁকে—
আমার ফুরোয় পুঁজি ভাবিস বুঝি মরি আহার শোকে?
ওরে, আছি সুখে হাস্যমুখে, দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥

র
(নর্সা সর্সা)
ধ
না না II না র্সা -া । র্সা না -া I পা -া -া না গা -া I
তো রা যে যা ০ ব লি স্ ভা ০ ই আ মা র্
র
I মা গা - পা মা গা -া I সা -া -া -া I'
সো না র্ হ রি ণ্ চা ০ ০ ০ ০ ই
I সা সা -া । গা গা -মা I পা পা -া না না -া I.
ম নো ০ হ র ণ্ চ প ল্ চ র ণ্
I গা গা -মা । পা ধা -পা I পা -া -া না না -া
সো না র্ হ রি ণ্ চা ০ ই আ মা র্

উত্তরমহরী

I না না -া না না -র্সা I র্সা -া -া র্সা র্সা -না
সো না র্ ছ রি ণ্ চা ০ ই আ মা র্
I র্সা র্সা -র্গা । র্রা র্সা -না I ধপা -া -া । না না -া I[ ]I
সো না র্ ছ রি ণ্ চা০ ০ ই "তো রা ০"

প
-া।-াপা পা II পা -া পা। না না -া I নর্সা -া র্সা। না না -পা
ই সে যে চ ম্ কে সে ড়া য্ দু০ ম্ টি এ ড়া য্
I পা -া পা । পা না -া I না -া র্সা -া না র্সা I
মা য়্ না তা রে ০ বাঁ ০ ধা ০ সে যে
I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I না না -া । না না -পা
না গা ল্ পে লে ০ পা লা য্ ঠে লে ০
I পা পা -া । পা না -া I না -া র্সা । -া র্সা না
লা গা য্ চো খে ০ ধাঁ ০ ধা ০ আ মি
I র্সা -া র্সর্গা। র্রা র্রা -া I র্সা না -া । পা পা -া
ছু ট্ বো০ পি ছে ০ মি ছে ০ মি ছে ০
I পা -র্সা ণা। ধা পা -া I মা -গা -া । মা গা -া
পা ই বা না ফি ০ পা ০ ই আ মি ০
I না না -সা । গা গা -মা I পা পা -া । না না -া
আ প ন্ ম নে ০ মা ঠে ০ ব নে ০
I গা গা -মা। -া পা ক্ষা I পা -া -া। না না -া
উ ধা ০ ও হ রে ধা ০ ই আ মা র্
I না না -া না না -র্সা I র্সা -া -া। র্সা র্সা -না
সো না র্ ছ রি ণ্ চ ০ ই আ মা র্
I র্সা র্সা -র্গা । র্রা র্সা -না I ধপা -া -া । না না -া I[ ]I
সো না র্ ছ রি ণ্ চা০ ০ ই "তো রা ০"

প
-া।-সা সা-ন্া II সা সা -পা। পা পা -ধপা I পা ধপা -মপা। মা গা -া
ই তো রা০ পা বা র্ জি নি ০স্ হা টে০ ০০ কি নি স্
I সা গা -া । মা পা -ধপা I মা -পা গা । -া র্সা না
রা খি স্ ঘ রে ০০ ভ ০ রে ০ মা ছা

স্বরলিপি

I র্সা -া র্গা । র্রা -া র্রা I র্সা না -া । পা -া পা
যা য়্ না পা ও য়া তা রি ০ হা ও যা

I পা -র্সা পা ধা পা -া I মা -া গা । -া পা পা
লা গ্ ল কে ন ০ মো ০ রে ০ আ০মার্

I পা -া পা । না না -া I না র্সা -া । না ধ না -া
যা ০ ছি ল তা ০ গে ল ০ ঘু চে ০
I পা -া পা । -না না -া I না -া র্সা । -া র্সা না
যা ০ নে ই তা র্ কো ০ কে ০ আ মার্

I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I না না -া । না ধ না -া
দু রো য়্ পু ঞ্জি ০ তা বি স্ বু ঝি ০
I পা পা -া । পা না -া I না -া র্সা -া র্সা না
ম রি ০ তা রি ০ শো ০ কে ০ আ মি
I র্সা র্সা -র্গা । র্রা র্রা -া I র্সা -া না পা পা -া
আ ছি ০ সু খে ০ হা স্ স ্ মু খে
I পা -র্সা পা । ধা পা -া I মা -গা -া । মা গা -া
দু ক্ খ আ মার্ না ০ ই আ মি ০
I না না -সা । গা গা -মা I পা পা -া না না -া
আ প ন্ ম নে ০ মা ঠে ০ ব নে
I গা গা -মা । -া পা ক্ষা I পা -া -া । না না -া
উ ধা ০ ও হ য়ে ধা ০ ই আ মার্
I না না -া । না না -র্সা I র্সা -া -া । র্সা র্সা -না
সো না র্ হ রি ণ্ চা ০ ই আ মা র্
I র্সা র্সা -র্গা । র্রা র্সা -না I ধপা -া -া । না না -া II [ ]II.
সো না র্ হ রি ণ্ চা০ ০ ই "তো রা ০"

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

আলোচনা

এ্যাকাডেমিক ষ্টাইল বনাম মর্ডার্ণ আর্ট

"He mistreats forms, reduces everything···sites, figures houses to geometric outlines···But since he is working in good faith, let us not make fun of him. Let us wait and see."

ব্রাকের ছবি প্রসঙ্গে লুই ভসেয়ের উপরোক্ত সমালোচনা শুধু কিউবিজম্ সম্বন্ধেই নয়, অথবা ব্রাকের ছবি প্রসঙ্গে নয়, বরং আধুনিক আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে একজন আধুনিক চিত্রসমালোচকের সমালোচনা।

স্মরণাতীত কাল থেকে প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে চেয়েছেন শিল্পীরা। বস্তু ও মানবের হুবহু আকার ও বর্ণ শিল্পে প্রতিফলন করে এসেছেন অনেক শিল্পীই। এই ফটোগ্রাফিক রিপ্রোডাক্সনের আজ কতটুকু মূল্য আছে? সিনেমা, ফটোগ্রাফ, ইত্যাদি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আজ প্রকৃতি ও মানুষের রূপ অতি সূক্ষ্মভাবে ধরে রাখা সম্ভব। এবং আজকে বর্ণের ওপরও যথাসম্ভব ফটোগ্রাফের অধিকার এসে পড়েছে। কোন শিল্পী আজকের দিনে গতানুগতিক নীতি ও রীতিতে সেই প্রকৃতি ও জীবের আকার ও রূপ শিল্পে কেননা অতি সাধারণ মানুষও আজ শিল্পীদের সেই কজে গ্রহণ করতে পারেন।

তাই শিল্পীদের কাছে আধুনিক কালে বাহ্যিক রূপই যথেষ্ট নয়। বাহ্যিক রূপের অন্তরালে যে গূঢ় সৌন্দর্য আছে সেটা শিল্পে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাই চলেছে। আপাত নিরপেক্ষ রূপের পেছনে যে রূপ আছে এবং মানুষের অন্তরালে যে মনোভাব রয়েছে শিল্পের মাধ্যমে তার বিশেষ প্রতিফলন থেকেই মডার্ণ আর্টের জন্ম; নতুন ধরণের শিল্প সৃষ্টির জন্যে নানা দেশে সাধনা চলেছে। ফলস্বরূপ ইম্প্রেশনিজম্, কিউবিজম্, ফিউচারিজম, সুর্‌রিয়ালিজম্ প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা

ও এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের প্রবর্তনা। ভাল মন্দের বিচার থাক্, এটুকু স্বীকার করতে হবে শিল্প একঘেয়েমী থেকে বেঁচেছে, শিল্পীর মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে, সর্বোপরি নবীন কলার সূত্রপাত হয়েছে।

বাস্তব জ্ঞানকে আশ্রয় করে প্রকৃতি ও জীবনকে অবলম্বন করে কল্পনার উৎপত্তিতেই আর্ট সীমাবদ্ধ নয়। প্রাকৃত রূপকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার আকৃতি সৃষ্টি করে বস্তুনিরপেক্ষ শিল্পেরও সৃজন চলেছে। এ্যাকাডেমিক ষ্টাইলে ছবি এঁকে এঁকে যখন একঘেয়েমী এসে যায় তখনই শিল্পীদের ঝোঁক পড়ে নতুন শিল্পসৃষ্টির ওপর। মনের কল্পনাই তখন বড় হয়ে ওঠে আর তা থেকেই শিল্পীর মেজাজ ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবপ্রকাশের মধ্যে যদি অপ্রাসঙ্গিকতা দেখা দেয় তখন অনেকের কাছেই তা অপ্রীতিকর ঠেকে। সুতরাং মন ও বুদ্ধি পরিণত না হলে বস্তুনিরপেক্ষ শিল্পে প্রতিভা উপযুক্ত বিকাশ সম্ভবপর নয়। সেজন্যে গোড়ায় ভাবের সঙ্গে বস্তুজ্ঞানের একটা সম্পর্ক থাকা কাম্য এই ধরণের শিল্প মডার্ণ আর্ট হলেও শিল্পরসিকদের কিছুটা তৃপ্তি দিতে সক্ষম। আধুনিক আর্ট নাম দিয়ে অপ্রাসঙ্গিকতার আশ্রয় গ্রহণ না করে শিল্পী যদি তাঁর মনের ভাবকে যথাসম্ভব সঙ্গতভাবেই প্রকাশ করেন, শিল্পীর ভাব যখন প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ না ঘটিয়ে বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের সুক্ষ প্রচেষ্টায় নিরত থাকে তাহলে সম্ভবত নবীন আর্টের বিরোধীরাও খানিকটা রস উপলব্ধি করতে পারবেন। তাই বলে চোখে যা দেখি তাই শিল্পে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়না। শিল্পীর নিজস্ব মনের স্পর্শে তা প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। আর সেই ভাবই হবে শিল্পের সৌন্দর্য। তবে দেখতে হবে সেই শিল্প দর্শকদের বোধগম্য কিনা? শিল্পের সার্বজনীন আবেদন শিল্পীর মেজাজ, চিন্তাধারা, চেতন ও অবচেতনের উপলব্ধির পর নির্ভরশীল।

বস্তুর আকৃতিটাকে প্রাকৃত আর্টে সর্বপ্রধান বলে ধরা হয়। বর্ণ এখানে ব্যবহার করা হয় আকৃতি প্রকাশের জন্যে। ভাবরাজ্যে প্রবেশরত শিল্পীর কাছে মন প্রকাশের জন্যে কয়েকটি রেখাই যথেষ্ট নয়। বর্ণ তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। আকৃতির অনুরঞ্জন, বর্ণবৈচিত্র্য ও ছন্দপূর্ণ রচনা সব দিক দিয়ে ছবি হয়ে উঠবে যেন একটি কবিতা।

অতি আধুনিক আর্ট বলে মার্কিণ শিল্পীরা যে নন্‌অবজেকটিভ্ আর্টের

আমদানী করেন যাতে বিষয়বস্তু ও ভাবের অভাব থাকে তাহলে কি তাকে সার্থক শিল্প বলা চলে? সঙ্গীতকার যদি বিভিন্ন সুর বিন্যাস করে সঙ্গীত সৃজন করতে পারেন তবে শিল্পীই বা কেন রঙ বেরঙের অপ্রাকৃত আকৃতি সৃজন করতে পারবেন না? যে ছবির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক না থাকলে দর্শকদের কাছে শিল্পীর কল্পনা বোধগম্য হয়না।

মডার্ণ আর্টিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—আকৃতি, টেকনিক, কম্পোজিশন, এ্যানাটমি জ্ঞান, বর্ণ প্রলেপন প্রভৃতি জ্ঞানের অভাবের জন্যেই তাঁরা ছবিকে বিকৃত করেন, বিচিত্র বর্ণের প্রয়োগ করে থাকেন।

কিন্তু এ সবের ওপর শিল্পীর যদি দক্ষতা থাকে, প্রথাগত ভাবেই যদি তিনি শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন আর একঘেয়েমী থেকে শিল্পকে বাঁচাবার জন্যে বিভিন্ন গঠন কৌশল, বর্ণকৌশল ও ভাবের সাধনা করেন তখন তার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

নতুন নতুন প্রথা প্রকরণ আমাদানী করে শিল্প সম্পদকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, শিল্পীর মৌলিকতা দিয়ে নতুন শিল্পের উদ্ভাবন করে! এ্যাকাডেমিক আর্টের প্রতি বিরোধ থাকা সঙ্গত নয়; পক্ষান্তরে মডার্ণ আর্টেরও অন্ধ সাগরেদি করা উচিত নয়। যথার্থ শিল্পসৃষ্টির প্রতি আনুগত্যই সকল শিল্পরসিকদের আদর্শ।

তপনকুমার সেন

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ৭৮৫ শ্যামবাজার রোড, কলিকাতা ৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

LIBRARY
UNIVERSITY

উত্তরসূরী

পঞ্চম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ॥ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৪

সমকালীন বাঙালী কবিদের প্রতি

শিবনারায়ণ রায়

সৃষ্টির কাজ নির্জনে, সেখানে কোনো শরিকের নাকগলানো অসহ্য। তবু সৃষ্টি একসময়ে স্রষ্টা থেকে বিযুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অর্জন করে। তখন স্রষ্টাও সে সৃষ্টির একজন দর্শক, বোদ্ধা, সমালোচক মাত্র। কিন্তু পুরোপুরি নির্লিপ্ত নয়। কারণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সত্ত্বেও সে সৃষ্টি তাঁরি সৃষ্টি। আর তখন স্রষ্টার-ও প্রয়োজন হয় শরিকের—ভোগের শরিক, যাঁর সঙ্গে সেই সৃজিত রূপের আনন্দ তিনি একত্রে আস্বাদন করতে পারেন। ফলে কবির আঙ্গিনায় আমন্ত্রণ জোটে রসিক পাঠকের।

আমি পাঠক মাত্র। কবিতা পড়ি, কবিতা ভালবাসি, কিন্তু কবি নই। কবি না হওয়া সত্ত্বেও কবিদের এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে যুগপৎ উৎফুল্ল এবং বিব্রত বোধ করছি। উৎফুল্ল, কারণ স্বয়ং কবিদের মুখে কবিতা শোনা কাব্যানুরাগীর পরম সৌভাগ্য। কিন্তু বিব্রতও বটে: কারণ আপনারা শুধু কবিতা শোনার আমন্ত্রণ জানাননি; কবিতা বিষয়ে কিছু বলার-ও ফরমাস্ করেছেন। কিন্তু আমি যা বলতে পারি তা কবির কথা নয়, নিতান্তভাবেই পাঠকের কথা। আপনাদের আমন্ত্রণ এবং অনুরোধ থেকে অনুমান করছি আপনারা আমাকে একজন রসিক পাঠক বলে ধরে নিয়েছেন। যোগ্য হই বা না হই আপনাদের এ আস্থার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে একজন কাব্যানুরাগী পাঠকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবার আপনাদের কাছে নিবেদন করি। ইতিহাসের হিসেবে বাংলায় পদ্যরচনার বয়েস যদিও হাজার বছরের ওপর, তবু এ থেকে গত একশ বছরের ফসল বাদ দিলে কবিতা হিসেবে যা টিঁকে থাকবে তা দিয়ে একখানা

মাঝারি আকারের সংকলন গ্রন্থও বোধহয় ভরানো চলেনা। চর্য্যাগীতি থেকে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, এই বিরাট রচনাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর—তা নিয়ে সঙ্গত কারণেই বিস্তৃত গবেষণা হচ্ছে এবং হবে : কিন্তু তার মধ্যে কাব্যশরীরের আভা কোথায় ? ধর্মতত্ত্ব আছে, প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে, দেবদেবী মানুষ-মানুষী নিয়ে গল্প কাহিনীরও অভাব নেই—কিন্তু যে ব্যঞ্জনাগুণে ভাষা সাহিত্যে পরিণতি পায়, সৃষ্টির যে রহস্যময় প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতার স্থূল বিক্ষিপ্ত উপাদান মিশে গলে একটি শিখার মত কাব্যরূপে জ্বলে ওঠে—এখানে তার সাক্ষাৎ কচিৎ মেলে। জয়দেব বাংলায় কবিতা লেখেননি, বিদ্যাপতিকেও ঠিক বাঙ্গালী কবি বলা চলে না; এবং এ দুজনকে বাদ দিলে প্রাগাধুনিক যুগে কবি-প্রতিভা হিসেবে আর মাত্র দুটি নাম করা চলে : পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস এবং তাঁর পরে ভারতচন্দ্র। তাছাড়া বাংলায় কবিতা বলতে ছিল কিছু ছড়া, গুটি কয়েক বাউল গান, হয়ত বিশ-পঁচিশটি বৈষ্ণব গীতি, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের এবং আলাওলের পদ্মাবতীর কিছু অংশ, একটি কি দুটি পল্লীপারের গাথা, অসংখ্য পাঁচালী পুরাণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত পংক্তি, রামপ্রসাদের দু-তিনটি গান, হয়ত নিধুবাবু এবং শ্রীধর কথকের গুটিকয় টপ্পা। উনিশ শতকে পৌঁছে বাংলা কাব্য-সাহিত্য, মালার্মে যাকে বলেছেন "গোষ্ঠীর ভাষা" (mote de la tribu), তাতেই শেষ পর্য্যন্ত পর্যবসিত হল। সে ভাষা এবং ভাবনার দরিদ্র উপাদান নিয়ে দাশরথি রায় এবং ঈশ্বর গুপ্ত যা কারসাজী দেখিয়েছেন আমরা তার তারিফ করতে পারি, কিন্তু তাকে কবিতা বললে নিতান্তই সত্যের অপলাপ করা হবে।

অলৌকিক প্রতিভার সামর্থ্যে বাংলা কবিতাকে তার এই দরিদ্র গ্রাম্যতা থেকে উদ্ধার করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট কিন্তু প্রায়-বিস্মৃত শব্দসম্ভারের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি বাংলা কবিতায় ধ্বনি-বৈচিত্র্য এবং অর্থব্যঞ্জনার নতুন নতুন সম্ভাবনা এনে দিলেন; অন্যধারে প্রাচীন এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী কবিকল্পনার সেতুবন্ধ রচনা করে বাংলা কবিতার নতুন মেজাজ গড়ে তুললেন আর সেই মেজাজকে প্রকাশ করার জন্যে সমুদ্র পেরিয়ে আমদানী করলেন নতুন নতুন কাব্যরূপ। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬—এই সাত বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার ইতিহাসে কালান্তর ঘটল। 'গোষ্ঠীর ভাষা' পরিভ্রুত হ'ল ব্যঞ্জিত ভাষায়; গ্রাম্য-সাহিত্য অকস্মাৎ উন্নীত হোল বিশ্বসাহিত্যে। মাইকেল বাংলা কবিতায় যে

বিপ্লব আনলেন, তা পরিপূর্ণতা পেলো রবীন্দ্রনাথে। পথিকৃৎ বলেই হয়ত মাইকেলে উপাদানের বৈভব সব সময়ে নিষ্কম্প সুস্পষ্টার্থ রূপের শিখায় জ্বলে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত প্রেরণায় সংস্কৃত শব্দসম্ভার এবং ইয়োরোপীয় ভাবসম্ভারের পরিপূর্ণ স্বীকরণ ঘটল এবং যা জন্ম নিল তা যেমন নিঃসন্দেহে বাংলা তেমনি নিঃসন্দেহে কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের অমিত সৃজনীশক্তি এবং নিরলস সাধনার ফলে বাংলা কবিতা যেমন অবিশ্বাস্যভাবে সম্পন্ন হয়ে উঠলো অন্যধারে তেমনি সেই সম্পদনির্ভর আত্মতৃপ্তির প্রভাবে তাঁর সমকালীন অন্য বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠল আত্মিক জড়তা এবং অনুকরণ-প্রবৃত্তি। মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রেরণার ওপরে নির্ভর করেননি। একধারে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য এবং অন্যধারে ভাষা ও ছন্দেরব্যঞ্জনা-সামর্থ্য—দুইই বাড়াবার প্রয়োজনে তারা কেবল বাংলার নয়, পৃথিবীর প্রাচীন এবং সমকালীন নানা সমৃদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলন করেছিলেন। তাঁদের কবি-কল্পনায় প্রেরণা এবং বৈদগ্ধ্য পরস্পরের বিরোধী রূপে অনুভূত না হয়ে পরস্পরের প্রবর্দ্ধক হিসেবে সমজসা লাভ করেছিল। এবং এটাইত স্বাভাবিক। কারণ অশিক্ষিত প্রেরণার প্রকাশসামর্থ্য সীমাবদ্ধ; তা শুধু ঘুরে ফিরে একটি কি দুটি কথা বলতে পারে, এবং সে বলার মধ্যে ব্যঞ্জনা স্বভাবতই খুবই সামান্য। বিদগ্ধ প্রেরণার উপাদান সম্ভার বিপুল, এবং সে উপাদানকে ঠিকমত ব্যবহার করার নিপুণতা সে অর্জন করেছে। এ শতকের প্রথম ত্রিশ বছর ধরে রবীন্দ্র প্রতিভার আড়ালে যাঁরা বাংলায় কবিতা লিখছিলেন, তাঁদের বেশীর ভাগই এ-সত্য উপলব্ধি করেননি।

ফলে ঐ সময়ে বাংলা কাব্যে দুটো স্তর পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল। একটি স্তর জুড়ে ছিলেন একা রবীন্দ্রনাথ, সেখানে নিত্যনূতন উপাদান আহরিত হচ্ছে, নিত্যনূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, নিত্যনূতন কবিতার মধ্যে সৃষ্টিধর্মী কল্পনার স্ফুরণ ঘটছে। অন্য স্তরে অসংখ্য পদ্য লেখক যাঁরা প্রেরণার দারিদ্র্যের ফলে বৈদগ্ধ্য বিষয়েও সন্ত্রস্ত, যাঁদের লেখায়

……রেণু, বেণু, কদাচ বেণুও, মিলে, ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে,…

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-ক্ষমতার উৎসের কোনো খোঁজ না করে তাঁর অক্ষম অনুকরণের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজেছিলেন। আমি যতটুকু বুঝি, এই যুগে শুধু

তিনজন কবিকে এর ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিত-লাল মজুমদার এবং নজরুল ইসলাম। এ তিনজনের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথে বৈদগ্ধ্য এবং ছন্দ ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষার সাহসিক মূল্যবান প্রচেষ্টা কচিৎ পল্লব স্তর অতিক্রম করে কবিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। নজরুলে অভিজ্ঞতার অভিনবত্ব এবং তীব্রতা শিল্পবোধের ধারা পরিশ্রুত ও পরিবর্দ্ধিত না হওয়ার ফলে গুটিকয়েক কবিতার জন্ম দিয়ে তারপর গোষ্টির ভাষার কলরবে পর্যবসিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে কবি হিসেবে সার্থকতম বোধ হয় মোহিতলাল• যদিও রবীন্দ্রনাথের পাশে সে সার্থকতা পাঠক চেতনায় খুব একটা ধাক্কা মারে না। এই তিনজনকে বাদ দিলে রবীন্দ্র প্রতিভার অন্তরালে এই তিরিশ বছরের বাকী বেশীর ভাগ বাংলা কবিতাকে কবিতা বলে গ্রহণ করতে আমার অন্ততঃ বাধে। মনে হয়, তাদের যথার্থ স্থান ছাত্রপাঠ্য সংকলন পুস্তকের পদ্য বিভাগে।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটল তিরিশের দশকে। তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ দশ বছর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় নতুন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ এনে এবং রূপ সৃষ্টি করে বাঙ্গালী পাঠককে বারবার বিস্মিত ও মুগ্ধ করছিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু কবিরও এ-দশকে আবির্ভাব ঘটল প্রত্যক্ষ-ভাবে রবীন্দ্রপ্রভাবের বিরোধিতা করলেও প্রকৃতপক্ষে যাঁরা বাংলা কবিতার সম্পদ-বর্দ্ধনে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক। এই কবিদের সার্থকতার একটা কারণ সম্ভবত এটাই যে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কবিকর্মে দীক্ষা নিয়ে এঁরা স্রষ্টা হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ভোলেননি। এবং সেই দায়িত্ববোধের ফলে তাঁরা একধারে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও স্বদেশ-বিদেশের অন্য কবিদের কাছে পাঠ নিয়ে বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনা-সামর্থ্য বাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন; অন্যধারে তাঁদের নিজেদের যুগে অস্তিত্বের যে সব দিক অনিষ্ট চেতনায় পুনরাবিষ্কৃত অথবা নতুন করে প্রতিফলিত হচ্ছিল, তার উপলব্ধির দিকে নিজেদের কল্পনাকে নিয়োজিত করেছিলেন। এই কবিদের নাম আপনারা সকলেই জানেন: আমি বিশেষ করে যাঁদের কথা স্মরণ করছি তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ এবং অমিয় চক্রবর্তী। গত পঁচিশ বছরে বাংলা ভাষার অধিকাংশ সার্থক কবিতা, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, মুখ্যত এই ছ'জন কবির সৃষ্টি।

সমকালীন বাঙালী কবিদের প্রতি

কবিতার পাঠক হিসেবে আমার নিজের একটা অনেকদিনের শখ আছে। যে কবিতা পড়ে আমি আনন্দ পাই, জীবনানন্দ দাশের ভাষায় যে কবিতা পড়ে মনে হয় একটি হৃদয় "পৃথিবীর অন্ধকার-ও-শুভ্রতায় একটি মোমের মত যেন জ্বলে উঠল", আমার নিজের ব্যক্তিগত কাব্যসঙ্কলনে আমি তাদের টুকে রাখি। এ-সঙ্কলন আমার গূঢ়তম আনন্দের উৎস, এবং ঐ সঙ্কলনে উপরোক্ত দু'জন কবির দান কম নয়। কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করি: 'বনলতা সেন', 'মৃত্যুর আগে' 'দময়ন্তী', 'মায়াবী টেবিল'; 'নাম', 'শাশ্বতী', 'জেসন', 'সংবর্ত', 'যযাতি', 'পথ'; 'নীলকণ্ঠ', 'ফেরারী ফৌজ' 'চেতন স্যাকরা', 'সঙ্গৎ,' 'বৃষ্টি'; 'ঘোড়সওয়ার', 'পদধ্বনি', 'অশ্বিষ্ট', 'তিলানেল', 'ক্লান্তিনেই', 'নদীর উৎস যদি জানা থাকে'। অন্যান্য দেশের সমকালীন কবিতার সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে; তাদের সঙ্গে তুলনা করে উপরোক্ত কবিতাগুলিকে স্মরনীয় বলতে আমার অন্তত সঙ্কোচ নেই। কিন্তু এই কবিরা শুধু কয়েকটি ভাল কবিতা লেখেননি: বাংলা কবিতার ভাষায় প্রভূত সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন; তাতে বিচিত্র ছন্দ গড়ে তুলেছেন—যে ছন্দ মাত্র ধ্বনিপুঞ্জের বিন্যাস নয়, কাব্য-অভিজ্ঞতার ধারক এবং বাহকও বটে; কাব্যদেহে বিভিন্ন অভিনব অভিজ্ঞতার স্বীকরণ ঘটিয়ে বাংলার কাব্য জগতকে বর্দ্ধিষ্ণু করে তুলেছেন। কবি-ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এঁরা প্রত্যেকেই অপর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, একজনের কবিতা অন্যের বলে ভুল হওয়া সম্ভব নয়। অথচ বৈদগ্ধ এবং সৃষ্টিশীলতার সামর্থ্যে এঁরা পরস্পরের নিকট-আত্মীয় এবং মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের যথার্থ উত্তরসূরী।

কিন্তু তারপর? তিরিশের দশকের এই কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ এখন মৃত; প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি-প্রতিভা প্রায় অবসিত; বিষ্ণু দে-র সম্প্রতিকালের কবিতায় কচিৎ অলৌকিক বিভা চোখে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথ চিরদিনই কম লেখেন, এখন আরও কম। অমিয় চক্রবর্তীর কল্পনায় চড়ার আভাব দেখা যাচ্ছে। প্রৌঢ়ত্ব বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় গাঢ়তা এবং গভীরতা এনেছে, কিন্তু বর্তমানে তাঁর কল্পনা সৃষ্টির চাইতে অনুশীলনে এবং অনুবাদে অধিকতর নিবিষ্ট। বাংলা কবিতার পাঠক হিসাবে নিজেকে প্রশ্ন না করে পারি না: উপরোক্ত কবিদের তরুণ উত্তর-সাধকরা কোথায়? সম্প্রতি কবিতা-পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে, কবিতার বই-ও কম প্রকাশিত হচ্ছেনা। নামের হিসেব ধরলে সমকালীন তরুণ কবিরা সংখ্যায়

অল্প নন। এ সম্মেলনত' তারই প্রমান। অথচ গত পনেরো বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন নতুন কবিপ্রতিভার পরিচয় পাচ্ছিনা কেন? কিছু কিছু ভালো কবিতা অবশ্য চোখে পড়েছে: যেমন অরুণকুমার সরকারের 'জন্মদিনে' এবং 'বৈশাখী', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'পূর্বরাগ' এবং 'অন্ত্যরঙ্গ', মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'হায় জন্মদুখিনী মা', সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কোদাই' এবং 'হৃদয়ের প্রতি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পিপাসার ঋতু' এবং 'সহজ'। অবশ্য এগুলিই যে প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা, তা নয় কিন্তু এরা যে কবিতা, পদ্য নয়, সে বিষয় আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। উপরন্তু সমকালীনদের মধ্যে বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকবিজয় রাহা, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, রাম বসু, অরুণ ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির কোনো কোনো কবিতা আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। এঁদের কাছে পাঠক হিসেবে আমি কৃতজ্ঞ। তবু স্বীকার না করে পারিনা যে এই কবিদেরই কিছু বাছাই করা কবিতা যখন চটি বই আকারে প্রকাশিত হয়, আর সে-সব বই পড়ে যখন তাঁদের কবিপ্রতিভার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হবার চেষ্টা করি, তখন বারেবারেই মনে হয় যেন গ্রামের ঘরে জলমেশানো কেরোসিন ভরা টিমটিমে লণ্ঠনের আবছা আলোয় বিবর্ণ দেয়ালের দিকে চেয়ে আছি। সেকি আমার চোখের দোষ?

হয়ত তাই। তবু এতক্ষণ যদি পূর্বসূরী বাঙ্গালী কবিদের বিষয়ে পাঠক হিসেবে আমার কথা আপনারা সহ্য করে থাকেন তাহলে আপনাদের কবিতা নিয়ে আমার যে দুঃখ তাও আপনাদের কাছে সংক্ষেপে পেশ করতে দিন। যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাও কাব্যদেহে আনন্দ হয়ে ওঠে। যেমন করে গাছের শিরা-উপশিরা বেয়ে জলমেশানো মাটি রূপ নেয় ফুলে। সেই রূপান্তরের অন্তর রহস্য আমরা জানি না। কিন্তু জানি মাটি চাই, জল চাই, সক্রিয় শিরা উপশিরা চাই, চাই পাতার রান্নাঘর, রোদের আগুন, সবুজ সুরঙ্গ পথে বাতাসের আনা-গোনা। নইলে গাছ শুকিয়ে যায়, ফুল ফোটে না। কবিরও তো চাই অভিজ্ঞতার মাটি জল, শব্দ-ছন্দের শিরা উপশিরা, কল্পনার রান্নাঘর, প্রেরণার রোদ, ঐতিহ্যের হাওয়া। উপমাগুলোয় বেশী ভার সইবেনা, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে সদ্যপ্রতিকালের তরুণ কবিরা সৃষ্টির দায়িত্ব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন কিনা। শব্দ এবং অর্থের সঙ্গে নিরন্তর যে-সংগ্রামের কথা এলিয়ট বলেছেন তার সঙ্গে

এ দের প্রত্যক্ষ পরিচয় কতটুকু ? মালার্মে-কল্পিত রাজহাঁস যে 'শুভ্র আর্তি'র শূন্যতা থেকে মুক্তির চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়েছিল, তাকি কোনোদিন এঁদের চেতনাকে মথিত করেছে ? এ অভাব যদি (আনন্দবর্ধনের ভাষায়) 'অশক্তিকৃত' হয়, তার ওপরে কারো হাত নেই। সে ক্ষেত্রে আলঙ্কারিকেরা যাকে "চিত্রকাব্য" বলেন, তার বেশী কিছু প্রত্যাশা করা চলেনা। কিন্তু হয়ত সমকালীন বাংলা কবিতার অবস্থা অতটা হতাশাজনক নয়। অন্তত, এঁদের মধ্যে কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে অভাবটা "অব্যুৎপত্তিকৃত" বলেই আমার মনে হয়েছে। এঁদের দৈন্য হয়ত ততটা প্রেরণার নয়, যতটা অনুশীলনের। প্রেরণাসমৃদ্ধ কবিরাও যে ঐতিহ্যের চর্চা করে থাকেন, তার কারণ সেই চর্চার ফলে বাক্য এবং ছন্দে ব্যঞ্জনার সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় সে চর্চা অবহেলিত ; আমার অনুমান আজকের অধিকাংশ তরুণ কবিই বৈদগ্ধ্যের দ্বারা প্রেরণার পরিপোষণে হয় অবিশ্বাসী, নয় অনিচ্ছুক, নয়ত' অক্ষম। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই বললেই চলে ; ইয়োরোপীয় কাব্যের সঙ্গে তাঁদের যেটুকু চেনাজানা তাও প্রায়শই সমালোচনা মারফৎ ; এবং বাংলা ভাষা ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট অনুসন্ধানী নন। তবে তাঁদের কথায় যাদু আসবে কোথা থেকে, তাঁদের উপমা-উৎপ্রেক্ষায় গূঢ়তা এবং ব্যাপ্তি সঞ্চারিত হবে কোন সূত্রে, তাঁদের ব্যঞ্জনা-সামর্থ্য পুষ্ট হবে কোন উপাদানে ?

হয়ত এ অবস্থার জন্যে আমাদের সমাজ, পরিবেশ এবং শিক্ষাব্যবস্থা অনেকখানি দায়ী। গত বিশ বছরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বাংলা সমাজকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এ পরিবেশে সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং রূপের সাধনা প্রত্যাশা করাই হয়ত মূঢ়তা। অন্যধারে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই বর্বরতার দিকে ঝুঁকছে : চৈতন্যের বিকাশ নয়, বিনাশ, অনুভূতির সূক্ষ্মতা সাধন নয়, ইন্দ্রিয়লুপ্তিই এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। তবু কবি স্রষ্টা : সাধারণ মানুষের চাইতে তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেশী। তিনি সেই আলাদীনের দীপের মালিক :

যে-দীপের ছায়া
ঘাস, গাছ, রোদ্দুরের অন্তহীন আশ্চর্য কাপড়ে
পৃথিবীরে রূপ দেয়, যে-রূপেরে লক্ষ হাতে হাওয়া

যদিও নিত্যই ছেঁড়ে, তবু পাতা-ঝরার চীৎকার
হার মানে, শুদ্ধ হয়, ছন্দ, পায় যার প্রতিভায়।

পরিবেশ অথবা শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিকূল বলে সে-দীপ কি কবিদের মনেও নিভে আসবে? তাহ'লে নতুন দিগ্‌বলয়ের সন্ধান আর কোথায় পাব?

তরুণ বাঙ্গালী কবিদের কাছে একজন কাব্যানুরাগীর দুঃখ নিবেদন করলাম। রাজনৈতিক নেতাদের মত শুধু দাবী করে নয়, আপনাদের কবিতার মধ্য দিয়েই আমাদের অনুভব করতে দিন বাঁহাতের কড়ে আঙুলে সত্যিই ত্রিজগৎ আপনারা সহজে ধরে আছেন আর অন্ধকার, সমুদ্র, পাহাড়, অবাক চোখে আপনাদের দেখছে; অথবা "শুধু ফাঁকি দিয়ে চোখে ছুঁয়ে ছুঁয়ে" আপনারা সব কিছু দেখে যাচ্ছেন না, 'শিল্পস্নাত চেতনা' নিয়ে অভিজ্ঞতার বিশাল কয়লা খাদে আপনারা হীরা খুঁজছেন। আপনাদের আজকের অনুষ্ঠানের গোড়ার দিকে রিল্‌কের একটি এলিজি পড়ে শুনিয়েছিলাম। আপনাদের কাছে পাঠক হিসেবে আমাদের আশা যে আপনাদের মধ্যে এমন কবির খোঁজ পাব যাঁর সৃজিত জগতের সান্নিধ্যে এসে রিল্‌কের মত আমাদের মনও বলে উঠবে:

Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft
werden weniger.....Uberzahliges Dasein
entspringt mir im Herzen.

(দেখ, আমি বেঁচে আছি। কি করে? শৈশব কিম্বা ভবিষ্যৎ হ্রস্বতর হচ্ছেনা।···অমেয় অস্তিত্ব উৎসরিত আমার হৃদয়ে।)

কবিতা মেলায় প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ

সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র কাব্যাদর্শ

অরুণ ভট্টাচার্য

বিষ্ণু দে-র কাছে ক্লাসিসিজম্ তার কাব্যের বহিরঙ্গ মাত্র, অন্তরঙ্গ নয়—প্রাচীন ঐতিহ্যে বার বার তার ফিরে যাওয়ায় রোমান্টিক নস্টাল্‌জিয়ারই সাক্ষাৎ মেলে। অথচ সুধীন্দ্রনাথ প্রকৃত অর্থে ক্লাসিসিষ্ট; কাব্যকলা ও জীবনচর্যার যুগ্ম দায়িত্ব, সাধ ও সাধনার একান্ত অদ্বয় তার কাব্যে প্রতিফলিত। বিষ্ণু দে-র কবিতায় ছবি ও গান, পরস্পর মিশ্রিত ঐক্যতানে সুরের অদ্বয়, সুধীন্দ্রনাথে জগৎসংসারের নানাবিধ অভিজ্ঞতার সমীকরণ, ফলতঃ নির্বিশেষ স্বকীয় চিন্তার প্রতিবিম্বিত কাব্যরূপ। একথা নয় যে বিষ্ণু দে চিন্তা-ভাবনায় পরাঙ্মুখ অথবা সুধীন্দ্রনাথে লিরিক কাব্যকুশলতার প্রাণময়ী আবেদনের অস্বীকৃতি, তথাপি উৎসুক পাঠকের চোখ এড়ায় না যে বিষ্ণু দে-র চিন্তাভাবনা সাময়িক বিলাস মাত্র, বুদ্ধিবাদী নৈয়ায়িকের স্থৈর্য ও তন্ময়তা সেখানে অনুপস্থিত এবং অন্যত্র, সুধীন্দ্রনাথ লিরিক কাব্যে আস্থা রাখলেও, তার ভালবাসা প্রকৃতিকেন্দ্রিক নয় (এ আলোচনায় স্বীকৃত রয়েছে যে রোমান্টিক কবিতার নানাবিধ প্রকাশের মধ্যে লিরিকধর্মিতাও অন্যতম এবং বিশিষ্ট)।

জীবন অর্থে, রোমান্টিক কবির দৃষ্টিতে, বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় গা ভাসান, ক্লাসিসিষ্ট এর কাছে পূর্বচিন্তা অনুযায়ী অভিজ্ঞতার একীকরণে প্রয়াস: বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উপরি-উক্ত মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। যে অর্থে অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অথবা সুকান্ত ভট্টাচার্য বামপন্থী, সে-অর্থে বিষ্ণু দে বামপন্থী নন। তার কবিতার বামপন্থী অথবা মার্কসীয় ধারার উপলক্ষ্য ব্যক্তিগত বোধ ও বিশ্বাসে ততটা নয় যতটা যুগচিন্তার অস্পষ্ট প্রভাব ও ইশারায়। এমনকি অ-পরিণত কিশোর কবি সুকান্তও যখন স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সতর্ক, বিষ্ণু দে তার এবম্বিধ চিন্তাধারায় সংকুচিত, দ্বিধাগ্রস্ত। বস্তুতঃ চিন্তাভাবনার সচেষ্ট প্রয়াস তার কবিকুশলতাকে মুক্তি দেয়নি, বরং বিশুদ্ধ আবেগ—যা তার কাব্যের প্রাণশক্তি—তাকে নানাস্থানে প্রতিহত করেছে। সেকারণে বিষ্ণু দে-র কবিতার সমগ্র বুদ্ধিবাদী আবেদন আমাদের কাছে বর্তমান যুগের ক্ষুরধারবুদ্ধি ইন্‌টেলেক্চুয়ালের পোজ্ মাত্রই হয়ে থাকল, ঘনিষ্ট প্রতীতীতে রূপ পেলনা। অন্যত্র

সুধীন্দ্রনাথ জীবনকে কল্পনার আশ্রয়ভূমি মাত্র মনে করেন নি। কল্পনা যখন চিন্তার আশ্রয়ে গড়ে ওঠে তখন সে অভিজ্ঞতাকে সহায় করে, নচেৎ কল্পনা শুধু বিলাস মাত্র। জীবন অর্থে যেমন কল্পনা, তেমনি অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তারও দ্যোতক। এই দুয়ের যুগ্ম উপস্থিতিই একমাত্র কবিকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, স্বকীয় চরিত্রে উজ্জ্বলতর করতে সক্ষম হয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সেই বিশিষ্টতার উদাহরণ।

প্রেম, প্রকৃতি যেমন একদা কবিতার উৎসস্বরূপ বিবেচিত ছিল, ইদানিং মানুষের ভাব-অনুষংগ আরও গভীর অর্থবহতায় তাকে নিমগ্ন রেখেছে। অভিজ্ঞতার পরিধি তার সীমিত নয়, বিচরণের ক্ষেত্র তার ব্যাপক, অবিমিশ্র দুঃখসুখের স্বাদও বিলুপ্তপ্রায়। উনিশ শতকের উদার ঐতিহ্যে যে নিয়মতন্ত্র ও একই সময় নৈতিক স্থিরচিত্ততা ছিল, মহাযুদ্ধ, বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা ও পারিবারিক সংহতির অন্তর্ধান-এর ফলস্বরূপ তার অধোগতি হয়েছে। অনিবার্য উদাহরণ তার মানুষের বর্তমান অস্তিত্বে, যন্ত্রণার সঙ্গে সে বিধৃত করেছে তার অপমৃত্যুর কথা। এ হেন সময় বিষ্ণু দে এক দিকে ঐতিহ্য আশ্রয় করলেন, অন্যদিকে মার্ক্সীয় চিন্তার স্রোতে গা ঢেলে জনসাধারণের কথা কবিতার অঙ্গীভূত করলেন। সুধীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ মননের শিল্পী বলেই এ শতকের অভিজ্ঞতাকে চিন্তার সংহতিতে একাগ্র করেছেন। জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনা তার কবিতায় ব্যক্তি, সমাজ কি রাষ্ট্র, ধনতন্ত্র বা গণতন্ত্র, প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যাবলীতে নতুন রূপে দেখা দিল। তিনি যে বিংশ শতকের বিভ্রান্ত পৃথিবীতে একজন, এ জগৎসংসারে তাকে যে অনিবার্যরূপেই প্রত্যহের গ্লানিমুক্তির পথ খুঁজতে হবে এ সত্য তার কাব্যে প্রতিভাত। এবং সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের যা কিছু রিয়ালিজম্ এখানেই বর্তমান, এই একান্ত ঘনিষ্ট স্বীকৃতিতে, বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মত দ্বিধামুক্ত কণ্ঠের নির্লিপ্ত উৎসাহে। সেকারণে তার কবিতার পাঠক, প্রথমে বাক্‌বিন্যাসে সামান্য হোচট্ খেলেও, সমাপ্তিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এই বলে, যে কাব্যপাঠ বিফল হ'লনা, বিষয় এবং বিষয়ীর অভেদে, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অদ্বৈত মূল্যায়নে লাভবান হওয়া গেল।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রকৃতি-প্রেম সুধীন্দ্রনাথে বিরল, যদিচ প্রথমোক্ত কবির মুখ্য আশ্রয় শুধুমাত্র প্রকৃতি নয়, এমন কি সম্ভবতঃ শুধুমাত্র প্রেমও নয়; কোন

কিছুকে অশেষ করে ধরে রাখবার স্থৈর্য তার কাব্যে অনুপস্থিত। কারণস্বরূপ হয়ত বলা চলে, বিষ্ণু দে-র কলাবৈকল্যে এক আপাত বিরোধ লক্ষ্যণীয়, সে বিরোধের মূল তার এই স্বৈত সত্তার অনুসন্ধানে। যেখানে তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ সেখানে তিনি শব্দে, চিত্রে এক অপরূপ সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন—এবং এ প্রক্রিয়ার পেছনে সচেষ্ট প্রয়াস নেই—বিষ্ণু দে-র কাব্যকলার সার্থকতা এখানেই। হয়ত প্রকৃতি, হয়ত বা প্রেম, কখনো কলকাতার বিচিত্র জীবনধারার টুকরো ছবি, বিদেশী সাহিত্যের ছিটেফোঁটা, এদেশ ওদেশের ক্লাসিক চরিত্রের উদ্ধৃতি—এই সব কিছু মিলে যে সিম্ফনি সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হোত যদি তিনি এই আশ্চর্য সুরের জটাজাল সৃষ্টিতে অসমর্থ হতেন। তার কবিতার প্রকৃতি, ব্যাপক অর্থে, সুরের এই অনুসন্ধানে নিহিত—অজান্তে যেমন কোলরিজ্ কুব্‌লা খানের স্বপ্ন দেখেছেন, নিজেও সঠিক বুঝে উঠতে পারেননি কেমন করে অপরূপ সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে, বিষ্ণু দেও তেমনি এক আশ্চর্য অনুভূতিময় লালিত্যে কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেখানে তিনি এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তার কবিতাও নিতান্তই অর্থহীন, অসার হয়ে গেছে। অন্যত্র সুধীন্দ্রনাথ এই রোমান্টিকতার বিপরীতগামী পথে নিজের অনিষ্ট খুঁজেছেন, (একথা অবশ্যই স্বীকার্য, রোমান্টিক ও ক্লাসিক কবিতার মূলতঃ যে ফারাক তা জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের পার্থক্য হেতু। অন্য প্রভেদগুলো গৌণ, কেননা তা শুধু মাত্রারই প্রভেদ ; চারিত্রিক নয়)। 'ক্রন্দসী' বা 'অর্কেষ্টা'র পৃষ্ঠা জুড়ে এমনতর ক্ষোভের সন্ধান মেলে। তার ব্যক্তিগত আর্তনাদ একদা 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থে মানবের ভাগ্যকেই কেন্দ্র করে অসাধারণ বিস্তৃতি লাভ করেছে। তিনি নিজেকে নায়কের ভূমিকাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই ভেবেই যে এমন একটি নায়ক বর্তমান বিশ্ববীক্ষায় নিজেকে অপাংক্তেয় রাখেনি, তারই মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করেছে এ শতাব্দীর অসহায়তা। সমস্যাসঙ্কুল জীবনের যে পরিধিতে তিনি নিজেকে স্থাপনা করেছেন তার কেন্দ্রে প্রকৃতি নয়, প্রেমও নয়, বরং বৃহৎ জীবন চেতনার সাড়া, ফলতঃ তার কবিতার আবেদন অনেক গভীর ও ব্যাপক। সুধীন্দ্রনাথের মন যে ক্লাসিকধর্মী সেকথার সমর্থনে উপরোক্ত আলোচনা সাধারণের স্বীকৃতি লাভ করবে, আশা করা যায় ; এবং এ প্রসঙ্গে আরও তন্নিষ্ঠ সমালোচক বলতে পারেন হয়ত যে তিনি কোথাও বিষয় ও বিষয়ীর ভেদে সীমারেখা টানেননি। তার মানসিকতা টানাপোড়েনের ফলেও স্থির, সংযত ;

বাক্যবিন্যাস চিন্তাধর্মের অনুকূল, এমন কি প্রতিকূলতাতেও স্বধর্মে আস্থাবান, বিষ্ণু দে, অন্তপক্ষে, অস্থির ; বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তার গতিবিধি কৈশোরক চপলমতির লক্ষণযুক্ত।

২

'উর্বশী ও আর্টেমিস' বিষ্ণু দে-র প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ যেখানে প্রেম কবিতার উপজীব্য। সে সময় কবি তরুণ, আজ থেকে আরো সাতাশ আটাশ বৎসর আগেকার রচনা। 'প্রত্যক্ষ' অথবা 'উর্বশী'র মত কবিতা সেকালে লেখবার অবকাশ প্রত্যেক কবিরই থাকে, যদিচ বিষ্ণু দে-র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তখনো কিছু মেলেনি। যৌবনের যা কিছু দোষ অথবা গুণ তা কবির রচনাতে বর্তায়। তবু 'এপ্রিল' কবিতাটিতে প্রথমেই যে ধ্বনির স্পর্শ লাগে তা পরবর্তীকালে তার কবিতাকে অনুরঞ্জিত করেছে, অথবা 'সন্ধ্যা'র দুএকটি লাইন—যা চোখকে আটকায়, মনকে নিবদ্ধ রাখে। যদিও যৌবন থেকে যৌবনোত্তর কালে উপনীত হতে গিয়ে প্রেমকে তিনি তত উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দাঁড় করাননি তবু একথা বলা অসমীচিন হবে,

শুধু লিলি তোমার শরীর
মসৃণ কোমল পাণ্ডু মর্মর শীতল।

প্রভৃতি পংক্তিতে তিনি প্রথমেই প্রেমের শীতল স্পর্শ অনুভব করেছেন ; বরং তৎকালে রমণীর প্রেম সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর যে ধারণা ছিল, তিনিও সম্ভবতঃ সে ধারনা হৃদয়ে পোষণ করেছেন ; 'কম্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স্‌' নামক অংশ-কবিতাটিতে বুদ্ধদেবের নিশ্চিত প্রভাব রয়েছে মনে করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি'ই বিষ্ণু দে-কে বাংলা দেশের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে—এবং তার পর তিনি যদিও দীর্ঘকাল কবিতা লেখার অভ্যেস ছাড়েন নি তথাপি সে সুরটিকে আর তিনি অমন অন্তরঙ্গ করে এযাবৎকাল পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি ; অথবা পারেননি নতুন সুরে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে ;—কিছু ভালো কবিতা অবশ্য 'পূর্বলেখ' এবং পরবর্তী কবিতাগ্রন্থগুলিতে ইতস্ততঃ রয়েছে। বিষ্ণু দে-র কবিতায় চিন্তা বা বক্তব্য নিতান্তই গৌণ, এবং নানাভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রকাশ করবার চেষ্টায় বহু পংক্তি তিনি ব্যয় করলেও কাব্যপাঠক তার সে কৌশলে মুগ্ধ নয়। তিনি পরবর্তী

সময়ে নিজেকে ক্রমশঃই যে প্রকৃতির পরিবেশে জড়াতে চেয়েছেন তাতে সে আবেগ আর পূর্বেকার মত ফুটে ওঠেনি এবং যদিচ, বুদ্ধদেব বসুর মত তার কাব্যে আবেগের তীব্রতা নেই, তবু আবেগের যে জৈব প্রেরণা ও স্বাভাবিকত্বর ফলে তার কবিতা একদা আমাদের মনোহরণ করেছে—তা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়েছে বললে অসত্যভাষণ হবে না।

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া

অথবা

শরীরে তোমার অলকনন্দা গান

অথবা

পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বল বইবে কে ?

এরূপ স্বাভাবিক, স্বস্থ, উজ্জ্বল পংক্তি পরবর্তীকালে তার কবিতা থেকে খুব বেশী উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় দুই যুগ পূর্বে বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' প্রসঙ্গে যে সব উৎসাহবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা, 'মোহপ্রবণ' (সমালোচকের সবিনয় স্বীকৃতি) হলেও, সত্য এবং কাব্যের বিচারে তিনি মালার্মের বক্তব্যকে নিশ্চিত নজির স্বরূপ উপস্থিত করে দেখাবার যে প্রয়াস করেছেন 'কাব্যের উপাদান ভাবনা নয়, ভাষা' তাতে বিষ্ণু দে-র কবিকৃতির অকুণ্ঠ সমর্থন মেলে। তবু কথা থেকে যায়। কেননা, এ ভাষা নিছক ভাষা মাত্র হলে অনেক ছড়া-লেখক বা ভাষাতাত্ত্বিক বড় কবি হতে পারতেন। এই ভাষায় যিনি রচনা করেন তার মন বলে একটা পদার্থ রয়েছে এবং সে মন কাব্যগুণসমন্বিত শুধু নয়, বিশিষ্ট এবং অনন্য। অন্যত্র বিষ্ণু দে-র সপক্ষে বলতে গিয়ে বন্ধুবৎসল সুধীন্দ্রনাথ যে বলেছেন তার 'মনীষা প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যোগফল' তাতে বহু বিতর্কের অবকাশ থাকে, বিশেষতঃ যখন সৃষ্টিকার্যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন কতদূর সক্রিয় তা বিবেচ্য। দেশজ ঐতিহ্যকে আত্মগত করবার জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সজাগ সতর্কতাই সম্ভবতঃ বেশী কার্যকরী এবং কে না জানে দেখার এবং অনুভবের যে বিস্ময় তা পাণ্ডিত্য দ্বারা পূরণ হবার নয়, যেখানে এই বিস্ময়বোধই কবিতার অথবা যে কোন শিল্পকর্মের নান্দীমুখ। এবিষয়ে

দ্বিমত হবার আশংকা সহস্থানে থাকলেও সুধীন্দ্রনাথের মতামত সাধারণভাবে স্বীকার্য, 'চোরাবালি'র যে সমস্ত কবিতায় 'তিনি সত্য সত্যই সফল, সেখানে তাঁর চর্যা ও চর্চা একাগ্র, বোধি ও ব্যুৎপত্তি ঐকান্তিক, অন্তর ও বাহির অভিন্ন। তখন তার পাণ্ডিত্যকে আর অবান্তর লাগে না, দর্শন বিজ্ঞানের প্রত্যয়াদিতে সুদ্ধ উপমার উপলক্ষণ জাগে; এবং অনন্তর অনভিজ্ঞের জ্ঞান-চক্ষু খুলুক বা না খুলুক, প্রজ্ঞাপারমিত অনুষঙ্গের আহ্বানে অন্তত অনু-কম্পায়ীরা নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে সাড়া দেয়। এই ইন্দ্রজালের সর্বপ্রধান নিদর্শন 'চোরাবালি' কবিতা'। এ প্রসঙ্গে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করে, তবে আধুনিক কবিতার উৎসাহী পাঠকের কাছে বাহুল্য-বোধে তা বর্জিত হ'ল। এই কবিতাটি অথবা 'ওফেলিয়া'—এদের সার্বজনীনতা সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই—এবং কেন যে কবিতা দুটির উৎকর্ষ তা চুলচেরা বোঝাতে গেলে নন্দনতত্ত্বেরও ব্যাখ্যা পর্যন্ত গড়াতে পারে, যেখানে আমাকে নিরুপায় হয়েই আবার অন্তের টীকা অনুসন্ধানে তৎপর হতে হবে।

প্রথমে উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র কাব্যের এবম্বিধ বিচারের যে কোন আপাতবিরোধ নেই তা বলাই বাহুল্য, কেননা তিনি যে চিত্ররূপকে সঙ্গীতের ধ্বনি ও অন্তর্নিহিত লয়ের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন তাতেই তার ব্যবহৃত ভাষা একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে—এবং এ ভাষাতেই চিরকালের কবিতা লেখা হয়েছে। বস্তুত যে কোন শব্দই প্রকাশময়, অর্থবহতা দ্বারা ভাবকে সমৃদ্ধ করতে পারে—কবির কাজ, তাদের যথার্থ অন্বয়-সাধনে। কখন কেমন করে এ সম্ভব হবে তা সঠিক নির্ণয় করা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, এর পেছনে, অদৃশ্য যদিচ, একটি বিরাট বিজ্ঞানী প্রক্রিয়া কাজ করতে থাকে, যেখানে বহু বিভিন্ন উপাদান একই সঙ্গে নিরন্তর এসে মিলিত হয়। আবার এও লক্ষ্যণীয় যে সব কিছুর সাহচর্যে পরিপূর্ণ শিল্পরূপ গড়ে উঠলেও অনেক সময় তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়না। পরবর্তীকালে যখন বিষ্ণু দে তার 'পাণ্ডিত্য' এবং 'অভিজ্ঞতা'কে কাজে লাগাতে চেয়েছেন তখন তার কবিতায় সে আমেজ আর ফিরে আসেনি, 'জন্মাষ্টমী' নামক অতি দীর্ঘ কবিতাটি, যেখানে তিনি স্পষ্টই, মনে হয়েছে আমাদের, মহাকাব্য রচনার ভূমিকা প্রস্তুত করেছেন, কাব্যগুণে ও রসাস্বাদে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে (যেমন হয়েছে অন্যান্য দীর্ঘ কবিতাগুলি যথা, চৈতে বৈশাখে, অদ্বিষ্ট, জল দাও)—নানাবিধ শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগেই

যে কাব্যের স্বকীয় চরিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় না তা নিশ্চয়ই বিষ্ণু দে জানতেন, তথাপি এই সকল কবিতাগুলির সম্ভাবনা যে অঙ্কুরে বিনষ্ট হ'ল তার কারণ, বিষ্ণু দে নিতান্তই গীতধর্মী কবি, রোমান্টিকতা তার অস্থি মজ্জায় স্নায়ুতে— তার পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের বিচারবোধ অথবা চিন্তাশীলতাকে কাব্যে উপজীব্য করা সম্ভব হয়নি। মেজাজ তার চিত্রকরের, ভাস্করের নয় ঠুংরী গানের খেয়াল-খুশী বিস্তারে, ধ্রুপদী চালের নিয়মনিষ্ঠায় নয়। 'জাঁহাবাজ', 'বকেয়া', 'তুখোড়' 'ফট্‌কা' ইত্যাদি শব্দ তিনি হয়ত সাহসের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সমর সেনের মেজাজে যা সহজাত তাঁর চরিত্রে তা একান্তই অনুপস্থিত,—যে কারণে এ সকল শব্দ প্রায় অর্থহীন থেকে গেছে, তাঁর কাব্যে নতুনতর স্বাদ আরোপ করেনি। বিভিন্ন সময়ে চেতনার নিরিখে উল্লিখিত কবিতাগুলি এক স্বাতন্ত্র্য দাবী করে, কিন্তু যেহেতু চেতনাগুলি মনের বিভিন্ন বিকাশের সমধর্মী নয়, সেহেতু পাঠকচিত্তে তা কোন সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। একটি উদাহরণ তুলে দিই :

> সেনিনের চিঠি পড়েছো, রিমার্ক—
> এব্‌ল্ ইন্—
> টারেন্টিং।
> বলো ভাববেনা পাগল সং ? আচ্ছা, না-হয় হেসো।
> কানে কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
> অলকা, আমার দিন-রজনীর স্বপ্ন ভাসে
> নিদ্রাহীন
> পাঁচ বছর, স্টালিনের মতো
> —ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খস্‌রু বেগ ?

বাংলা কেন ইংরেজি কাব্যকলাতেও, চতুরালি চিরকাল কষে পায়নি—প্রথমে যদিও খানিকটা চোখ ধাঁধায়। কামিংস্ এর প্রয়াসের কোন ঐতিহ্য আজকের দিনেও প্রবহমান বলে জানা নেই, অন্ত পক্ষে নানারকম অভিজ্ঞতা বা দেখা-শোনার টুকরো টুকরো বিন্যাস-এ কবিতাকে পোষাক পড়ালেই যে সে প্রাণ পাবে (এলিয়ট পেয়েছেন বলেই ?) তার বিশ্বাস কি ? বরং জামার দোকানে ডল পুতুলই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াবে হয়ত। এলিয়ট যে তার 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' নামক দীর্ঘ কবিতাটিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রতিফলনে একটি সমগ্র রূপ দেবার

চেষ্টা করে সফল হয়েছেন তার প্রধানতঃ দুটি কারণ রয়েছে—যা বিষ্ণু দে-র কবিতায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রথমতঃ তিনি একটি বিশিষ্ট প্রতীক এর সাহায্য নিয়েছিলেন ; ফলতঃ বার বার ঘুরে ফিরে তাকে কতগুলি ঘনিষ্ট চিত্রকল্পের (associate image) সুনিপুণ প্রয়োগ এর 'পর আস্থা রাখতে হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ তার স্মরণে একথা ছিল যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে দার্শনিক চিন্তায় তিনি পৌঁচেছেন তাকে কাব্যে রূপদান করতে গেলে (দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করা সত্ত্বেও) প্রথমতঃ প্রয়োজন পুরোপুরি তত্ত্বকথারই নির্বাসন। সুতরাং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে-কে 'এলিয়ট-ভক্ত' বলে চিহ্নিত করলেও, কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সে প্রমাণ দিতে পারেন নি, (অবশ্য এলিয়ট তিনি পড়তে ভালবাসেন, তার অনুবাদ-গ্রন্থই সে সাক্ষ্য দান করছে) আর তাহলে এলিয়টের চরিত্রের ক্লাসিক ঋজুতার কথা, চিন্তার বলিষ্ঠ স্বকীয়তার কথা মনে রাখতেন, কবিতায় যার প্রতিফলন স্বাভাবিক হ'ত।

অথচ একটি ছোট কবিতার উল্লেখ করি যেখানে বিষ্ণু দে-র কবিকৃতির সরল স্বাক্ষর মিলবে ; এ কবিতাটি হয়ত তার উচ্চাভিলাষী রচনা নয়, কিন্তু মমতা ও অভিজ্ঞতায়, রোমান্টিক কবির সহজাত আবেগপ্রবণতায় এটি উজ্জ্বল-চিহ্নিত :

তুমি কি দেখেছো তাঁকে ? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে ?
পেয়েছেন বহু তাপ, দেখেছেন বহু পাপ, মৃত্যুও অনেক
তবুও অম্লান প্রাণ, শুভ্রকেশ সৌন্দর্য আরেক
মর্যাদার, অনেক দেখার রূপ ;

এবং অন্যত্র

সততার আশা দীপ্ত শীতের আকাশ সে-নয়নে
স্থিরপ্রজ্ঞা, নিরুপমা, উপমা কি ? খুঁজেছো স্বদেশ ?

এ কবিতায় প্রাজ্ঞতার ছাপ রয়েছে, দ্বিধাহীন হয়ে বলতে পারা যায় তিনি সার্থক কল্পনার সঙ্গে অভিজ্ঞতার একাত্মকরণে সমর্থ হয়েছেন। বর্তমানকালের নানা ঘটনা, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নানা বিষয়ের ইঙ্গিত, চাষী মজুর ক্ষেত খামারের উল্লেখ, বস্তী কারখানার বর্ণনা দিয়ে তিনি কবিতার পরিধি বিস্তৃত করতে চেয়েছেন হয়ত, কিন্তু সেখানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন ; কেননা সহজাত বোধ থেকে কি এমন উক্তি সম্ভব :

তাকেই ত খুঁজি এই জনতার হাটে বাটে বন্দরে।

এবং একথা স্বীকার্য এমন সরলীকৃত উক্তিকে সম্পাদকীয়র পর্যায়ভুক্ত করলে অন্যায় হবেনা। অথচ যখন তিনি বলেন

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে

তখন সংশয় থাকেনা তার কবিতার প্রকৃত উৎস কোথায়।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর এবং তারপর সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থের (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, আলেখ্য) কবিতাগুলিতে একটি নরম সুর বাজছে সারাক্ষণ; রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি এক পাশে ঠেলে তিনি নিমগ্ন হবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সে আবেগ, সে-প্রাণের দাহন নেই—এ অনেক শান্ত, প্রায়-স্তিমিত। তবু তিনি তার নিজের জগতেই ফিরে আসতে চাচ্ছেন। এ প্রয়াসের পেছনে যদি জীবন-চেতনার স্পর্শ লেগে থাকে তবে তাকে অস্বীকার করবার সাধ্য কি? আশা করা যাক্ পরবর্তীকালে তিনি স্বধর্ম চিনতে ভুল করবেন না।

৩

সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য যে যুগে কাব্যরচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায়-একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যকে কূপমণ্ডুকতার গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে বিস্তীর্ণ ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন—এবং সাহিত্যের মানদণ্ড এমন এক স্থানে এনে দিয়েছিলেন যে কবিযশঃপ্রার্থীকে ছন্দ আর মিলের দিকেই শুধু লক্ষ্য রাখলে চলতনা, শব্দচয়ন, চিত্রকল্প ও পরিশেষ ব্যঞ্জনার দিকেও অশেষ সতর্কতা রাখতে হ'ত। অর্থাৎ সাধারণভাবেই সাহিত্যচর্চা অনেক দুরূহ বিষয় বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না এবং কবির কাজও সমপরিমাণেই কষ্টসাধ্য হ'ল। সৌখীন কাব্যরচনার যুগ অবসিত হয়ে কবিকে পরিশ্রমী, চিন্তাশীল ও মিতব্যয়ী হ'তে হ'ল। রবীন্দ্রনাথই যে এজন্য পূর্ণ মাত্রায় দায়ী এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই—এবং যেহেতু সেকালে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই ব্রাউনিং, বা ম্যাথ্যু আর্নল্ড পড়তেন, পড়তে ভালবাসতেন এবং রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্ত প্রভৃতি কবিরা নিজেরাই বিদেশী কাব্যের অনুবাদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেহেতু বাংলা কাব্যের ভৌগোলিক মানচিত্র কিছু বিস্তৃত হ'ল সন্দেহ নেই।

ক্লাসিক চরিত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ট্রাডিশনে আত্মস্থাপন এবং এ বিষয় সন্দেহাতীত যে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে বৃন্তাঙ্গুষ্ঠ দেখাননি। তিনি যে বাংলা কবিতার সরল গতিপথকে স্বীকার করেই কাব্যরচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে আচম্‌কা কিছু করবার বা আসরে বাজী মাৎ করবার কোন উদ্দেশ্য তার ছিলনা। নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে, অসীম ধৈর্য্যে; কেননা কাব্যকলায় নিষ্ঠা ও নিয়মতন্ত্রের যে উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ আনলেন তা সকল দেশের সকল কালের শিক্ষানবীশী কবির পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। এই শিক্ষার মূল্যবান দিনগুলিকে তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁর কবিতার যে কোন দুটি পংক্তি উদ্ধার করে দেখান যেতে পারে।

সুধীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা কবিতার এই বিস্তীর্ণতাকে এড়িয়ে চলেননি, বরং অভিনন্দিত করেছেন তেমনি ট্রাডিশনকেও সমপরিমাণ মর্যাদা দান করেছেন। ফলতঃ তার কাব্যে যে দুরূহতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল তা উগ্র আধুনিকতার নয়। তিনি আশা করতেন, কবি যেমন শব্দচয়নে পরিশ্রমী হবেন, চিন্তার সাযুজ্য অব্যাহত রাখবার জন্য তৎপর হবেন, পাঠকও তেমনি কাব্য-উপলব্ধির জন্য সক্রিয় ও সচেষ্ট হবেন; সৌখীন কাব্যরচনা যেহেতু তার পক্ষে অবাস্তব কল্পনামাত্র সৌখীন পাঠকের দায়িত্বহীনতাও তেমনি তার কাছে অবাঞ্ছিত—সুতরাং দুরূহতার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে উঠলেও তিনি কাব্য-রচনায় স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। আত্মবিশ্বাস যে কোন শিল্পসৃষ্টির প্রধান সর্ত, এবং যুগধর্ম অনুযায়ী বিচার বিবেচনায় অনেক সময় শিল্পীকে দুর্বোধ্য মনে হলেও কালধর্মের স্বীকৃতি যে তারা বহু সময়েই লাভ করে থাকেন এমন নজির ইতিহাসে বিরল নয়। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন,—তিনি দুর্বল incompetent কবি হতে লজ্জা পান (চতুরঙ্গ, বৈশাখ, ১৩৬১); একথা সঠিক বিচার-প্রসূত নয়, বরং সাধারণভাবে রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যকলা, রবীন্দ্র-নাথের ঐতিহ্যে অনুসৃত হয়েই, উৎকর্ষ ও প্রয়োগনিপুণতায় যে উন্নতমানে অধিষ্ঠিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ গুণটি শুধু যে তাঁরই একলার তা নয়, বিগত তিনদশকের সকল কবিই অল্পবিস্তর এ বিষয়ে তৎপর, কেননা, তাঁরা জেনেছেন, বাংলা কবিতার বিচার আজকের দিনে শুধু ঈশ্বর গুপ্তের প্রেক্ষিতে হবেনা, সে সঙ্গে ইংরেজি ফরাসী জর্মন কবিদেরও টান

পড়বে। এবং সুধীন্দ্রনাথ অন্য সকল কবিদের চেয়ে যে বেশীরকম নিয়মনিষ্ঠ ও উদ্যোগী তারও কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তাঁর চরিত্র নির্বিশেষে নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণেই পরাঙ্মুখ। ধৈর্য ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ যে শিল্পসৃষ্টি তাতেই তাঁর আস্থা বেশী, কেননা শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য শুধুমাত্র কবির ব্যবহারিক কলাকৌশলের 'পর নির্ভরশীল নয়, মনের মিশ্র ধ্যানধারণাও সে জন্য অনেকাংশে দায়ী।

একথা যদি স্বীকৃত হয় নিয়মনিষ্ঠা ও কবির তৎগত আত্মচিন্তা ক্লাসিসিজমের লক্ষণ তাহলে অবশ্যই রোমান্টিকতা স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন—এমত বিচার অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন। বস্তুতঃ রোমান্টিক ও ক্লাসিক কবির মূলতঃ কোন বিরোধ নেই এবং স্বেচ্ছাচারিতা যদি খেয়ালখুশীরই নানান্তর তবে কোন মহৎ কাব্যই এরূপ ধারণায় সম্ভব নয়। শিবনারায়ণ রায় তার একটি মূল্যবান প্রবন্ধে এরূপ উল্লেখ করেছিলেন যে ক্লাসিকের ধ্যেয় রূপ, রোমান্টিকের সাধনা প্রকাশ (শিবনারায়ণ রায় : ক্লাসিক ও রোমান্টিক। উত্তরসূরী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)। অবশ্যই এ মন্তব্যে বিরোধের আশংকা নেই, কিন্তু 'রূপ'-চিন্তা শুধু যে ক্লাসিসিষ্টের অথবা 'প্রকাশ'এর সাধনায় শুধু রোমান্টিকেরই অধিকার এমন উক্তি পুরোপুরি মেনে নেওয়া কষ্টকর। রূপের প্রকারভেদ আছে, যেমন রয়েছে প্রকাশ-রীতির ; এবং মনে হয়, ক্লাসিক ও রোমান্টিকের প্রভেদ চিন্তায় নয়, অনুচিন্তায় ; বিষয়ে নয়, বিষয়ের যাথার্থবোধে। অর্থাৎ রূপচিন্তা যেমন ক্লাসিসিষ্টের লক্ষণ, প্রকাশ তার অনুষংগ ; অন্যত্র রোমান্টিসিষ্টের পক্ষে রূপের প্রসঙ্গ নির্বাসনে রেখে কেবলমাত্র প্রকাশের সাধনায় নিমগ্ন হওয়া সম্ভব নয়। কীটস্‌কে রোমান্টিক কবি বলেই ইংরেজী সাহিত্যে চিহ্নিত করা হয়েছে, অথচ তার অনুপম odes গুলি কি 'রূপ' এর ধ্যান নয়, শুধুমাত্র অভিব্যক্তি ? আমার ত' মনে হয়েছে এলিয়টকে ক্লাসিক কবি আখ্যা দিলে যেমন সত্যের অপলাপ হবে না তেমনি রোমান্টিক কবি বললেও অধ্যাপকেরা নম্বর কাটবেন না। অবশ্যই, প্রভেদ আছে—কিন্তু সে প্রভেদ জীবনধর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে দৃষ্টিকোণের পার্থক্য সূচিত করেছে। অর্থাৎ সমগ্র জীবনের চিন্তাভাবনায়, দেখাশোনায়, অনুভূতি অভিজ্ঞতায় দুটি দিক রয়েছে—একদিক বিজ্ঞানীর, অন্যটি দার্শনিকের। বিজ্ঞান কোন কিছু 'নিশ্চিত' জ্ঞানে বিশ্বাস করেনা, নতুনের সন্ধানে সে আলস্যহীন, কর্মচঞ্চল, তৎপর। ঘর

বাঁধবার আগ্রহ যদি বা তার থাকে, ঘর ভাঙবার জন্য সে কম উৎসুক নয়। অন্যত্র, দার্শনিকের অভিসন্ধি এই বিশেষ জ্ঞানের আত্মগত ধ্যান ও আত্মশুদ্ধির 'পর। অর্থাৎ তার চরিত্র নিরাসক্ত পুরুষের—যা দুঃখে বিভ্রান্ত হয় না, সুখে অচঞ্চল থাকে, যে ব্যক্তি ভোগের আনন্দ আস্বাদ করেও বিগতস্পৃহ। জীবনধর্মকে গ্রহণ করায় যে চারিত্রিক পার্থক্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকে বর্তমান, তা সমভাবেই রোমান্টিক ও ক্লাসিক কবিতে পরিস্ফুট। প্রকৃতপক্ষে সুধীন্দ্রনাথের মত কবি যখন 'আত্মশুদ্ধি'তে সবিশেষ আস্থা ঘোষন করেন তখন সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে ধ্রুব লক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টি যেমন নিবদ্ধ, সাময়িক বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও তিনি তদ্রূপ নিরুৎসাহ।

এবং এরূপ বিচার প্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে নিজের কবিতার কাব্যাদর্শের ভূমিকা তিনি নিজেই করে গিয়েছেন। 'অর্কেষ্ট্রা'র পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ও তাঁর নতুন গ্রন্থ 'সংবর্ত' অল্পদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় এবং দুটি পুস্তকে তিনি অতি মূল্যবান, যদিচ সংক্ষিপ্ত, ভূমিকা লিখেছেন। কাব্যরচনা বিষয়ে তার বক্তব্য দুটি ভূমিকা থেকেই যথাযথ বোঝা যাবে বলে আমার বিশ্বাস এবং 'অর্কেষ্ট্রা'র ভূমিকাতে তিনি যখন স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন 'স্বরচিত নিয়মের অঙ্গীকারেই আমার মুক্তি' তখন তাঁর বিবেক-কে স্বীকার করলে কাব্যের রসাস্বাদে ব্যাঘাত ঘটবেনা, বরং উক্তি ও প্রকাশভঙ্গির সাযুজ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যাবে হয়ত। সে কারণে তার বক্তব্যগুলিকে টীকা আকারে উপস্থিত করে তার কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ নিলেই মনে হয় সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। ভূমিকা দুটিতে এতটা মূল্য আরোপ করবার পেছনে দুটি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, সুধীন্দ্রনাথ গদ্য কম লেখেন এবং গদ্য বলতে তিনি যুক্তি-আশ্রয়ী লেখাই মনে করেন। সেহেতু, তিনি যাই লিখুন, আমাদের স্বীকৃতির অপেক্ষা না রাখলেও তা সম্পূর্ণ অর্থবহ। দ্বিতীয়তঃ, নিজের কাব্য-কলার প্রেক্ষিতে এসব কথা বলতে গিয়ে তিনি স্বভাবতই ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, সত্যভাষণকে যেমন মানদণ্ড করেছেন, অতিশয়োক্তিকে তেমনি বর্জন করতে দ্বিধা করেননি।

৪

মালার্মের চিন্তা অনুসরণ করে তিনি তার কাব্যাদর্শ স্থির করেছেন যে

কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ। অবশ্য শুধুমাত্র একথার মতামতই প্রকাশ পায়, অর্থ ঘনিষ্ঠ হয়না। তবু ধরে নিতে পারি যে শব্দের ব্যবহার এবং প্রয়োগনিপুনতার পর কবি অনেকটাই নির্ভরশীল। মার্লাম্যে, যতদূর জানি, 'logical statement' কে কবিতার অঙ্গীভূত করতে চাননি, অথচ শব্দের অর্থবহতায়, চিত্রকল্প সৃষ্টির ক্ষমতায় তার কলাবৈকল্য এখনো শিক্ষনীয়। হয়ত সেকারণে তার বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পগুলি ধ্বনিসুষমায় গ্রথিত হয়ে মনের অবচেতনকেই বেশী স্পর্শ করত। সাধারণ কাব্যপাঠক এখানে বিভ্রান্ত হবেন, কেননা সুধীন্দ্রনাথের কবিতা স্পষ্টতই, এর বিরোধী না হলেও, ব্যতিক্রম। একথা ঠিক যে মালার্মে যেমন ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রকাশের জন্য একান্তই নিজস্ব শব্দসম্ভারের সন্ধানে বহু সময় ব্যয় করেছেন, সুধীন্দ্রনাথও একটি শব্দ বা ঢিলেঢালা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে ঘনিষ্ঠ অর্থবহ বিশেষণ ব্যবহারের প্রচেষ্টায় দিনরজনী অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু এ মিল শুধুমাত্র প্রকরণগত, নিতান্তই বাহ্যিক; মালার্মে কবিতার মুখ্য উপাদান হিসেবে যে শব্দ ব্যবহারের ওপর এতটা জোর দিয়েছেন তা স্বীকার করতে হলে তার কাব্যের পরিমণ্ডলকে সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রতীকী কাব্যের আশ্রয়ে তাকে রুদ্ধগতি স্বপ্ন-ইশারা-চৈতন্যের মুক্তিকামনা করতে হয়েছে। 'হেরোডিয়াস্' অথবা 'ফনের দিবাস্বপ্ন' কবিতাটিতে অথবা ছোট ছোট সনেটগুলিতে তিনি যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন সেখানে তার নিজস্ব শব্দ ও চিত্রকল্প ব্যবহার না করে অন্য উপায় ছিলনা, কেননা চিরাচরিত প্রথায় শব্দের অর্থকে গ্রহণ করলে ও ব্যবহারের রীতিতে আস্থাবান হলে তিনি যে বিশিষ্ট ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হ'ত :—

> Poetry must not be fettered by the use of words in their customary context, the static image dear to the Parnassians is liberated by an idea of flight or even absence, the sentient must be rendered by the auditory and silence cultivated as a capacity for music.

কোন বস্তুর সরাসরি উল্লেখে তার কাব্যগুণ বিনষ্ট হবে মাত্র, সমান্তরাল অন্য কোন সমগুণাত্মক চিত্র ব্যবহারেই কাব্যমাধুর্য বেশী প্রকাশ পাবে। একথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে 'ফনের দিবাস্বপ্ন' নামক অনূদিত কবিতাটির ভাষ্যে—সুধীন্দ্রনাথ. যেখানে নিজেই স্বীকার করেছেন, মালার্মের কাছে শিল্প-

সামগ্রী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি। এবং সেকারণে ঐকান্তিক ভাবনাকে যথাযথ রূপদান করতে গিয়ে প্রতিটি শব্দের নতুন অর্থবহতায় তাকে সচেষ্ট হতে হয়েছে। হেরোডিয়াস্ এর বিশুদ্ধতা যখন ক্রমশই অভিজ্ঞতার সাহচর্যে নতুন চরিত্র লাভ করছিল, নার্সের সামান্যতম ইঙ্গিত ইশারা ও আচরণে সে অভিভূত হয়ে পড়ছিল তখন এই সূক্ষ্ম নিমগ্ন অনুভূতিকে প্রকাশের জন্য তাকে যে ভাষার, যে চিত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে তা একান্তই নিজস্ব ও ব্যক্তিগত। Anguish কবিতাটিতে

I ask of your bed *heavy sleep* without dreams

অথবা Apparition এ

In the evening, you in laughter appeared to me
And I thought I saw the *fairy with her cap of brightness*

উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে তিনি যখন বিভিন্ন ইঙ্গিতের আশ্রয় নেন তার যাথার্থ অনুসরণ করতে গেলে তার কবিতার ছড়ানো আকাশকে, আলো আঁধারকে তখন দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে হবে। তিনি যে বিশুদ্ধ কবি সেকথা রঁ্যাবার ক্রাই স্বীকার করতে গিয়ে 'pure poet' ও 'poetical poet' এর পার্থক্য অনুসন্ধান করেছেন :

> The poetical poet makes use of words and material already consecrated by poetry, and with this he ornaments and embroiders his own theme. Mallarme's method is the opposite of this. His poetry is the unfolding of something implicit in the theme.

এর বিষয়বস্তু অনুধ্যানে তিনি বিভিন্ন নতুন শব্দ, চিত্র ও রূপকল্পের সন্ধান পান ; এমনকি 'unsuspected relations' খুঁজে বার করেন। মালার্মের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে অন্য এক বিদগ্ধ সমালোচক প্রস্তাব করেছেন যে, একে স্বীকার করেই তার কবিতার অর্থ খুঁজতে হবে। কেননা এই দুর্বোধ্যতা ইচ্ছাকৃত নয়, যেহেতু it derives from the strangeness of a mode of thought turned back upon itself—সেক্ষেত্রে যে সকল 'mystery' বা 'obsession' তার কাব্যের অন্তর্গত হয়েছে তাকে উদ্ধার করা কাব্য পাঠকের দায়িত্ব, বিশেষতঃ যেখানে মালার্মে এমত অবস্থায় নিরুপায় ভাবেই শব্দব্যবহারে নিজ বিশ্বাস ও কল্পনার 'পর আস্থা রেখেছেন।

অপরপক্ষে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার উৎসসন্ধানে তৎপর কোন পাঠক অবশ্যই স্বীকার করবেন যে এ হেন কাব্যের পরিমণ্ডলে তিনি নিজের কাব্যকে দাঁড় করান নি। প্রত্যেক কবির কবিতার ভাষা বিশিষ্ট এবং তার চিন্তা ও ধারণার 'পর সে ভাষা নির্ভরশীল। সুধীন্দ্রনাথের জগৎ মালার্মের জগৎ নয়; যে অর্থে শব্দের নতুন সম্ভাবনাকে মালার্মে স্বাগত জানিয়েছেন সে অর্থে সুধীন্দ্রনাথ শব্দের ব্যবহার করেননি। যেমন তার অপূর্ব চারিটি পংক্তি,—

একটি কথার বিধাধরথর ছুড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি

এমন ভাবগম্ভীর অর্থবহ অথচ কাব্যের পূর্ণ সুষমামণ্ডিত পংক্তি, বাংলা কাব্যের পরিধিতে যত্রতত্র মিলবেনা তথাপি স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এ নিতান্তই অন্য জাতের, অন্য মেজাজের কবিতা। দৃঢ়বদ্ধ, যুক্তি-আশ্রয়ী অথচ আবেগধর্মী শব্দের যথাযথ বুননিতে এর নিশ্চিত পরিণতি। অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য কাব্যের থেকে এ শতযোজন দূরে (এটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা এবং যদিচ সুধীন্দ্রনাথ পরবর্তী সংস্করণে 'ভর করেছিল'র পরিবর্তে 'বাসা বেঁধেছিল' এমন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে সুখী হয়েছেন তথাপি কাব্যপাঠক হিসেবে আমরা তাতে সন্তুষ্ট হইনি)। তার প্রেমের ধারণায় mystery বা obsession এর কোন স্থান নেই, 'flight into idea' যদিবা রয়েছে—সে idea প্লেটোনিক তত্ত্বের ধার দিয়েই যায়নি 'হৈমন্তী' কবিতাটির শেষে তিনি এমন ঘোষণা করতে ইতস্ততঃ করেননি :

বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার
আজি আর ফিরিবনা শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে॥

পরন্তু তিনি নিজেই ভূমিকাটিতে স্বীকার করেছেন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যথাশক্তি অনুশীলনের ফলেই তিনি একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদে পৌঁচেছেন। মালার্মের কাব্যাদর্শে এমন কোনরূপ সুসঙ্গত logical deduction পাওয়া গেছে কিনা জানিনা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ প্রথম জীবন থেকে সুরু করে আজো পর্যন্ত মানব ইতিহাসের ধারাটি অনুসরণ করে যে বিশেষ সত্যদর্শনে পৌঁছুবার চেষ্টা করেছেন মালার্মের কাব্যে সেমত কোন প্রয়াস নেই। এবং তাঁর 'কাব্য-

জিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য' হলেও, যেহেতু একটি অন্যটির পরিপূরক সেহেতু আধার-আধেয়ের মৈত্রী স্বীকার না করলে কবিতা শেষ পর্যন্ত জিম্‌নাষ্টিক্ হয়েই দাঁড়ায়। সুধীন্দ্রনাথ এবং মালার্মে দুজনাই নিজ নিজ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়েছেন এবং যখন দুজনার আধেয়ের স্বরূপ ভিন্ন, আধারও স্পষ্টতই একই লয়ে গ্রথিত নয়। একারণে সুধীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'দশমী' থেকেও অনুরূপ পংক্তি উদ্ধার করে দেখান যেতে পারে যে তাঁর প্রস্তাবিত কাব্যাদর্শ অন্ততঃ তার নিজস্ব কাব্যচর্চার প্রতিফলিত সিদ্ধান্ত কখনো নয়।

অথচ ভূমিকা দুটিতে তিনি অন্য যে সকল সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সায় রয়েছে এবং সুধীন্দ্রনাথের যে কোন উৎসাহী পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যে কেন তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট' অথবা 'ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের পরম সার্থকতা'। বস্তুতঃ পূর্বে যা যা বর্ণিত হয়েছে এসকল কথা তারই সংহত সংজ্ঞা। প্রথম কবিতাগ্রন্থগুলি যথা 'তন্বী', 'অর্কেষ্ট্রা' বা 'ক্রন্দসী' থেকে 'সংবর্ত' বা 'দশমী' পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রচেষ্টায় 'ব্যক্তি' সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই 'ব্যক্তি' সর্বশেষে 'মানব' এমন বিশেষণ লাভ করেছে। প্রেম অভিজ্ঞতায় পরিশীলিত হয়ে ব্যক্তিগত সুরকে অতিক্রম করে 'বিশ্ববীক্ষা'য় স্থান লাভ করেছে। সুতরাং তাঁর কাব্যে দার্শনিক জিজ্ঞাসার ক্রম-উত্তরণ রয়েছে যিনি সুরুতে বলতে পেরেছিলেন 'সম্মুখে নিখিল নাস্তি' পরে তিনিই স্বধর্মে আস্থা রাখতে দ্বিধাবোধ করেননি :

বিপরীত স্রোতে
সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও
ভুলিনি শান্তির চেয়ে স্বধর্মই শ্রেয়॥ (জেসন্ : সংবর্ত)

উটপাখী যে একক মানুষের নিঃসঙ্গতার প্রতীক সেকথার যেমন তিনি প্রারম্ভেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তেমনি অভিজ্ঞতার দ্বারা জেনেছেন 'একনায়কের শুবে মেদিনী মুখর' হলেও বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্বের অন্তই 'শুক্তির তাণ্ডবে' যোগ দিতে হবে। জীবনের একদিকে নিষ্ঠুর নৈরাশ্য, অন্যপক্ষে মানুষের দুরূহ প্রচেষ্টা—এর অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত নন।

সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র কাব্যাদর্শ

'ক্রন্দসী' 'অর্কেস্ট্রার' যুগে তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য ছিল প্রেম ; এবং তাঁর পরিকল্পিত নারী ছলনাময়ী, তীব্র সুরার আস্বাদনে সে পুরুষকে আকৃষ্ট করে, কেননা যৌবনময়ী নারী আরণ্যক দুর্দাম পুরুষের সঙ্গিনী হতে পারে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তখনও তার অপর সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতাকে স্মরণে রেখেছেন :

তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়
গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়

বুদ্ধিদীপ্ত চৈতন্যের কাছে কি প্রেম, কি জীবনজিজ্ঞাসা কিছুই অবশ্য চিরকালের স্থির দর্শন নয়, তথাপি 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা'র স্তর অতিক্রম করে যখন তিনি 'কাব্যগত অভিজ্ঞা'য় পৌঁচেছেন তখন তিনি অস্থির যুবকের পরিণতি বিয়োগান্ত নাটকের ভূমিকায় নিশ্চিত জেনেছেন

মৃত্যুর পাথেয় দিতে কাণাকড়ি মিলিবেনা যবে
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেইদিন মহাসত্য হবে।

অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতায় প্রেম জীবনের বিরাট সত্যরূপে প্রতিভাত যদিচ 'অতল শূন্যের শেষে পড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়'—এমন মর্মান্তিক সত্যভাষণ শূন্যবাদেরই নামান্তর বুঝিবা। প্রেমের কবিতার পরেও যখন তিনি মূল্যবোধের কথা ভেবেছেন তখন তাঁর তৎকালীন কবিতায় একটি সচেতন মনের বিকাশ ধরা পড়েছে—যে-মন ব্যক্তিজীবন ও ব্যষ্টিজীবনের নানা সমস্যার আপাত সমাধানকে চরম বলে গ্রহণ করেনি, বরং একটি স্থির দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রয়াস করেছে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতি প্রায় অনুপস্থিত, তার নায়ক ব্যক্তিপুরুষ যার অন্তর 'উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকার' এবং যে একলা 'ধ্বংসাবশেষ কালের 'পরে' 'চতুর্দিকে আদিম অন্ধকার' ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। 'উত্তরফাল্গুনী'র কবিতাতেও সেই সুর বার বার ফিরে এসেছে, যেমন,

হৃদয় তবু বিষাদে ভরে ওঠে
নিরুদ্দেশ শূন্যে যবে চাই—

প্রেম-বিষয়ক কবিতাবলীতে সুধীন্দ্রনাথের একটি সুস্থ সুন্দর লিরিক্যাল মেজাজ পাওয়া যায়; বিভিন্ন কবিতার কয়েকটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি :

তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে,
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে
পুষ্পিত তৃণদলে

এবং 'নান্দীমুখ' কবিতাটিরই অন্যত্র

তবু অন্তরে থামে না বৃষ্টিধারা
আদ্র, ধূসর, বিদেহ নগর,
মৎসর প্রেত-পারা,

(অবশ্য এ কবিতাটি ব্যক্তি-প্রেম থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বমানবিক পটভূমি আশ্রয় করেছে)। 'সংবর্ত'র সুরুতে

এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে

অথবা

তোমার আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহেনা

এমন সকল পংক্তি যে কোন রোমান্টিক কবি লিখতে পারলে খুশী হতেন। লিরিসিজম্ বাংলা কাব্যের পটভূমি ; সুধীন্দ্রনাথ, ক্লাসিক ঋজুতায় অভ্যস্ত হয়েও, এ আশ্রয়ে মাঝে মাঝে নিশ্চিন্তি লাভ করেছেন।

'সংবর্ত'র কবিতাগুলিতে বা 'দশমী'র, দেশবিদেশের রাষ্ট্রনীতি, দর্শন ও জীবন জিজ্ঞাসা বৈদ্বিক পটভূমি আশ্রয় করেছে—তাঁর উদ্বেল অনুসন্ধিৎসা আমাদেরও পীড়িত করে। এমন ধারণা হয়, মানব-মানবীর প্রেম ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ভালবাসায় শেষ নয় ; জগৎ সংসারের বিরাট ইতিহাসে সে কাহিনীরও যথার্থ স্থান অবশ্যই আছে, অঙ্গাঙ্গী হয়ে, এবং পরিপূরক হিসেবে। তাঁর জীবনধর্মের সঙ্গে তাঁর কাব্যের এক আশু সমীকরণ ঘটেছে—সেজন্য কাব্য-সুষমা তাঁর ক্ষেত্রে স্ব-অভিজ্ঞতার সত্যদর্শনের নামান্তর। ইতিহাস অথবা 'অপমৃত ভগবান', মানব সভ্যতা অথবা তার বিকল্প যেন সব কিছুতেই তাঁর চিন্তা তন্নিষ্ট, কেননা তিনি 'বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগী নায়ক ;' এবং 'বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী' হয়ে তিনিই জেনেছেন, বিশ্ববীক্ষা এবং তৎসংলগ্ন সমাজ সমস্যার নানাবিধ রূপ,—প্রগতি অথবা পশ্চাদ্‌গতির,—বিভিন্ন সত্যাসত্যের সাহসী জিজ্ঞাসাতে ফলবতী হয়।

কবিতাবলী

শ্রাবণ-স্মৃতি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথ

বর্ষামঙ্গলের গান শুনি।
কেমন করে যে আজ গান করে গুণী
ভাবি তা-ই—চোখ ভিজে আসে না কি তার
একটি শ্রাবণতিথি ভেঙে দিয়েছিল বলে' বৃক্ষল পাহাড়?

গান্ধীজি

হে গুর্জ্জর-প্রতিহার চিনতে এ পাহাড়ের দেশ।
ভুলবনা তোমার আশ্লেষ,
তোমার চোখের নীল তারা
যা আমার সতত পাহারা।
তুমি যেই ভাবিনে ত মনে,
বেকারের রাত্রিদিন চেয়ে থাকে তোমার আননে॥

সুপর্ণাকে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

॥ এক ॥

নরকাগ্নি থেকে আমি আসি,
এখনো তোমাকে ভালোবাসি
সুপর্ণা আমার—
তোমার মুখের নীল স্নিগ্ধ অন্ধকার
আগুনেও ছিল।
সে আগুনে নীলও
তাই যেন অপূর্ব্ব, শীতল।
আগুন নেবালে তুমি চোখে এনে জল।

॥ দুই ॥

আলোকিত কর তবে স্নিগ্ধ অন্ধকারে
এই রুদ্র ঘর
যা অবিনশ্বর।
পথে পথে বহু বিচরণ
শেষ হল, শেষ সমুদ্রের পারে-পারে
ভ্রমণেরও। ভ্রান্ত ক্লান্ত মন
তোমার পুণ্যাঙ্ক চায় আজকে, পক্ষিণী,
যুগে-যুগে আমি ওই পাখা দু'টি চিনি॥

দময়ন্তী

(যতীন্দ্র রায় সুহৃদবরেষু)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[এক : রাত্রি]

তুমি চ'লে গেলে, চ'লে যেতে হয় ব'লে
অসময়ে। আমি ছিন্ন বসনে শরীর
ঢেকে অন্ধকারে হাঁটি। গভীর জঙ্গলে
শ্বাপদের কান্না শুনি। ক্ষুধায় নিবিড়
হ'য়ে কেউ আসতে চায়, দস্যু কি প্রেমিক
সাপ কি মানুষ।

আমি মাটি নেই ব'লে
আকাশে তাকাই : চাঁদ জড়িয়ে বৃশ্চিক
লুব্ধ ইশারায় জ্বলে। নদীর কল্লোলে
ভেসে যেতে চাই। দেখি হরিণী মায়ের
নাভি ছিঁড়ে কুমীরের রক্তে-ভাসা দাঁত
তুলে নেয় ভ্রূণ-শিশু।

কোথাও জন্মের
শঙ্খধ্বনি নেই। শুধু মৃত্যুর করাত
ছেঁড়ে প্রতীক্ষার রাত্রি : নিয়তি আমার···
কোথাও চোখের স্বচ্ছ আলো নেই আর ॥

[দুই : ভোর]

তবু আশা রাখতে হয়, তবু চ'লতে হয়
সর্বাঙ্গ তুষার, তবু কঠিন প্রস্তরে

উত্তরস্থরী

নদীর উৎস-কে খুঁজে দেখতে হয় ; তার
জ্যোতির্ময় চেতনার বুকের ভেতর
শিশুর মতন মুখ রাখতে হয়।

রাত্রি
ভোর হ'লো অরণ্যের, নদীর, আমার,
এখন সম্মুখে যাত্রা। নির্ভয়, স্থবির
তুমি শরবিদ্ধ : ক্রুদ্ধ শিকারী, শিকার
সকলই অতীত।

রাজ অন্তঃপুরে দিন
চার-দেয়ালে নিরাপদ, আজ আর নেই,
কিন্তু সূর্যোদয় আছে। আছে অবিরাম
ভগীরথ শঙ্খধ্বনি এই পাহাড়েই :
কান পাতলে শোনা যায়।

চ'লে গেছ তুমি···
আমার আশ্রয় নদী, জল, জন্মভূমি॥

এই যে আলোকবৃত্ত

পরিমল চক্রবর্তী

এই যে আলোকবৃত্ত যন্ত্রণার দিগন্তের বাঁকে
কেবলি আমাকে ডাকে দুর্নিবার মায়াবী আঙুলে
প্রতিদিন প্রতিরাত, কিছুতেই যার আকর্ষণ
কাটাতে পারিনা আমি, আমি যার প্রাণস্পর্শী ডাকে
পারিনা না দিয়ে সাড়া, প্রত্যহের চেনাপথ ভুলে
মনে হয়, যেন তার ডাকে সাড়া দিয়েছি কখন !

কারণ আমিতো আজো ব্যথাবিদ্ধ সে আমিই আছি—
যৌবনের রূপাঞ্জন চোখে মেখে যে-আমি বাউল

এই যে আলোকবৃত্ত

পিপাসার গানে গানে ভ'রে দিয়ে দুরন্ত দুপুর
বৈশাখী হৃদয়ে হানি নৈঃসঙ্গের থরোথরো সুর
কখনোবা তাকে খুঁজি অন্ধকারে আমি যে বাউল
কান্নার দিশারী হয়ে তাকে চাই প্রেমে কাছাকাছি !

আমি বাঁচি প্রণয়ের রাঙা পথ ধরে। বেঁচে আছি
তারই বেদনা নিয়ে যে আছে স্মৃতির কাছাকাছি ॥

প্রশ্ন

সুশীলকুমার গুপ্ত

একদিন পার্কে বসে বললে সে, 'যদি পাই তাকে
আর কিছু চাই নাকো। তার প্রেমসমুদ্রের বুকে
খেলা ক'রে কাটাবো সময় আর ডুবে সৃষ্টি সুখে
পাবো মুক্তা। নিবিড় চুলের বনে বসন্তের ডাকে
হারাবো হৃদয়। কাল চোখের আকাশে নীল মন
মেঘ পাখি আলো হ'য়ে নিজের খুশিতে হবে হারা ;
হাতের রক্তিম নীড়ে স্বপ্ন খুঁজে পাবে সুনির্জন
নিশ্চিত আশ্রয়। তার নামে গড়ে যাবো শিল্প তারা।'

অবশেষে পেল তাকে। কয়েক বৎসর গেলে কেটে
এলো সে আবার। তাকে বললাম, 'ভাল আছো, হেম ?'
ভোরের তারার মতো চোখ তুলে বললে সে, 'ভাই,
তাকে পেয়ে সুখে আছি, তবু যেন অন্য কোনো প্রেম
খুঁজে মরে মন। এক ব্যথিত শূন্যতা আসে হেঁটে
হৃদয়ের ঘরে ; আজো জানিনা কি চাই, কাকে চাই।
কাকে বলে প্রেম, বন্ধু ? হৃদয়ের ঠিকানা কোথায়।'

উত্তরে হিমেল হাওয়া মাথা খুঁড়ে গেল জানালায়।

স্মৃতির জন্ম

শোভন সোম

তুমি আমায় একদিন একটি ফুল দিয়েছিলে ;
তারপর সে ফুল শুকিয়ে গেছে
সে ফুলের কথা হয়ত তোমার মনেও নেই—

আশ্চর্য, সে ফুল আজও বাঁচিয়ে রেখেছি
দুটি নীল পৃষ্ঠার মধ্যে
আর তারই স্মিত সৌরভ
এখন আমার অকূল নির্জনতায় অবলীন !

এই হাওয়া ফাল্গুনের

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এই হাওয়া ফাল্গুনের। এই হাওয়া যন্ত্রণাকাতর
প্রেমিক মায়ের বুকে ঘোরে। শুষ্ক পাতার জঞ্জাল
মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে মুহ্যমান মাঠ-তেপান্তর
সচকিত করে। রক্তমুখ কৃষ্ণচূড়া, নিভৃত পিয়াল
চোখ তুলে আকাশে তাকায়। দূর দিগন্তের নীলে
চিকন সোণার মেঘ চিত্রময় বসন্ত বিন্যাস
খোঁজে প্রকৃতিতে। আহা, আজ স্বাখো সমস্ত নিখিলে
মাঠে তেপান্তরে বনে অন্তর্লীন প্রাণের আভাস।

কে তুমি ছড়িয়ে দাও নিজেকেই সর্বত্র সমানে
ক্ষুধা তৃষ্ণা যন্ত্রণাকে ভুলে। বার বার রক্ত ঢেলে
ভাঙাঘর আবার সাজাও। অনন্ত স্রোতের টানে
আনো ঢেউ মজা নদীতেও। অন্ধকারে দীপ জেলে
দেখাও গোপন পথ অন্ত দিকদিগন্তের। আর,
গবাক্ষ সাজাও ফের, বুকে আনো বিলুপ্ত ঝঙ্কার ॥

সম্রাজ্ঞী

অনিরুদ্ধ কর

কোথায় লুকালে ? তুমি পুনর্বার লুকালে কোথায় ?
আমি তো এখন-ও খুঁজি গান্ধারীর আচ্ছাদন চোখে,
এবার করুণা করো, অকরুণ মায়াবী খেলায়
দিওনা রোদনে এনে যৌবনের আশার ভস্মকে !

প্রাণের ঈশ্বরী তুমি, তুমি জানো কার স্পর্শে, ঘ্রাণে
ফুটে উঠবে শতদল অলৌকিক পরম বিভায়,
তুমি জানো চেতনার দ্যুতিময় চিত্রিত প্রজ্ঞানে
অনুরাগমণি জ্বলে পাতালের গোপন গুহায় ।

আমি তো রক্তের স্তবে শুনতে পাই তোমার বৈভব,
এবং হৃদয় থেকে হৃদয়ের দূরান্ত প্রদেশে
কী প্রচ্ছন্ন ভাবে তুমি খেলা করো, অথবা উৎসব ?
নিরন্ত যন্ত্রণা থাকে ছদ্মবেশী সময়ের বেশে ।

তোমার শিল্পের কারুকার্যে এই সসাগরা ধরা
দীপ্ত হয় পরিচিতে ঐশ্বর্যের স্থিরপ্রভ কায়,
তুমি তো প্রাণের সখী পাতালের প্রাচীনা অপ্সরা—
জলে এসে দাঁড়িয়েছি, বলো আজ লুকাবে কোথায় !

খদ্যোতের আলো আজ অন্ধকার আরও তীক্ষ্ণ করে
চক্ষুতে দেখিনা কিছু কে আমার দূরে ও অদূরে
এখন দুহাত ধরো স্পর্শ নাও চিবুকে অধরে
অনুরাগমণি জ্বলবে জীবনের শুদ্ধ অন্তঃপুরে ।

কোনো ভীরুর ভাবনা

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

সে-কথা ভাবতে ভয় লাগে, ভয় লাগে !
দুই চোখে হানি বরং পড়ুক আগে,
পেশীগুলি যাক শুকিয়ে ঘাসের মতো,
মুটো ফুসফুসে ক্ষত হোক একশত :
কিছুতেই যেন এ না হয় তার আগে,
যে-কথা ভাবতে ভয় লাগে, ভয় লাগে।

পদ্মপাতায় শিশিরের মতো আয়ু,
তত্ত্ব শোনায় এ-দেশের জলবায়ু ;
আবেগী চোখের আর্দ্রতা যৌবন,
কখন সে এসে মিলায় জানে না মন :
ঘরে বাতি নিবে যায় যদি তারও আগে,
সে-কথা ভাবতে ভয় লাগে, ভয় লাগে।

দু' ভরি সোনার সুখাতুর সংসার
এক রতি তার খসলেই মার-মার।
মেহেদি-বেড়ার এককোণে নিরিবিলি
সবুজ চারায় ফোটাই কোমল লিলি,
তাই যদি ঝরে বিকেল যাওয়ার আগে,
ভাবতে পারি না, ভয় লাগে, ভয় লাগে ॥

বরাকরের বিকেল

নবেন্দু চক্রবর্তী

এখন কী যে ভালো লাগছে ভালো
বিকেলবেলার সুচিস্মিত আলো
আদিগন্ত আকাশেতে উদার দুহাত তার
ছড়িয়ে দিয়ে ছবি আঁকছে পরম অসীমতার।

প্রসন্নতার ছোঁওয়া পাচ্ছে পাথর, মাটি, ঘাস
হৃদয় যেন শান্ত এক নদীর অবকাশ
হতে চাচ্ছে, এবং এই নির্বিরোধী আলো
মেখে নিচ্ছে মুগ্ধ চোখ, বলে উঠছে ভালো।

ইচ্ছে হচ্ছে অনেকদিন বাঁচি,
এসে মহান্ নির্বিকার তোমার কাছাকাছি ;
ইচ্ছে হচ্ছে জড়িয়ে থাকতে মগ্ন
ঘাসের উপর শিশিরকণার মতন এই লগ্ন।

তুমি ভাবছো নেশার ঝোঁকে বেহেশ্ ওটা মাতাল,
মদের ঝোঁকে ভুলতে বসছে চরম সত্য পাতাল ;
জাগবে যখন পড়বে পিঠে হড়ো,
চমকে উঠবে স্বপ্ন তখন ভাঙবে গুঁড়োগুঁড়ো।

হয়ত স্বপ্ন ভাঙবে ঠিক, আবার জমবে গান,
নগ্ন মৃত্যু পিছন থেকে আপ্‌টে ধরবে কাঁধ ;
ঠেলে ফেলতে অন্ধকার খাদে,
ভরবে ভুবন সব হারানোর তীব্র আর্তনাদে।

জাগব ঠিকই, কিন্তু আমি যতক্ষণ এই বিকেল আলোর মদ
আকণ্ঠ পান করছি সুখে বুকের মধ্যে শুনছি তখন সেতার
কিংবা সরোদ
চেনা হাতের আলাপ আহা, দিচ্ছে সুস্থিরতা
হৃদয় এক হয়ে উঠ্‌ছে বিশাল সেতু পাহাড় মাটি, নদীর কাছে
জানিয়ে আত্মীয়তা।

এখন আলো, এমন আলো বিকেল বেলার আলো
অখণ্ডতা ফিরিয়ে দিল, আঘাতহীন সময় এ-কী আন্‌লো!
বুকের মধ্যে ভরে উঠছে, পায়ের ছোঁয়া পাচ্ছে নদী, জল,
স্রোতের শব্দে ভালোবাসার কথা শুনছে হৃদয় অবিরল।

বুড়ুর বায়না

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

'মাইরা বেরোলে আজ। দেখোনা মা বাইরে মেঘের
চেহারা কেমন যেন ; হঠাৎ যে বড় ভয় করে!
রোজ রোজ চলে যাও, মিছে বলো, আনোনা কিছুই।
বড় ভয় মা, বড় ভয় এলো বুঝি বৃষ্টির ঘুঙুরে!'

আর কত সয় বলো, সমস্ত বায়না তার ঘরে।
এটুকু বোঝেনা ; বলে,—অবুঝ শব্দের সাথে যাবে,
ঘরে বাইরে একাকার, বৃষ্টির পিছল সুর যেন
ফিরে ফিরে শুভ্রতায় অন্য এক হৃদয়ে মিশেছে।

কি তোমার কাজ বলো, এই মেঘ-বৃষ্টির নূপুরে?

ভবিতব্য

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

স্মৃতি
চিরদিন
পর্দার আড়ালে
রয়েছে অপেক্ষমান,
মুখে তার ঝর্ণার তলায়
পাথরের অসংখ্য স্রোত, ক্ষত রেখা।
কুঁড়ির মতন ছোট এক পাণ্ডু পাখি
মেঝেতে লুটিয়ে আছে, দেখো, আকাঙ্ক্ষার রক্ত
তার ভাঙা ডানা বেয়ে নিরুৎসুক ধীরে নেমে আসে।
এই তবে নির্বিকল্প অন্ধ নিয়তির অনিবার্য রীতি ?
তাই ঝরা বকুলের অভিভূত সুরভি বাতাসে
ছড়িয়েছে বুক-চাপা কান্না শুধু, মন্ত্র নক্ত
নিয়মিত আসে তাই গোপনে একাকী!
পাবে না পাশের ঘরে কারও দেখা;
যদি গিয়ে দাঁড়াও সেথায়
দেখবে ব্যথায় ম্লান
দেয়ালে দেয়ালে
ক্ষমাহীন
ধৃতি ॥

নাগকেশর

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত ভাই চম্পার তুমি এক ভাই
পারুল তোমায় খোঁজে তাই।

একটি অর্পিত সত্য যত্নে রাখো ঢেকে
মাঠের ছড়ানো রোদ দেহে মেখে মেখে
নিজেরি প্রশান্তি ক্রোড়ে সুবাস-শীতল যতো ছায়া করো জমা
নাগেশ্বর, হে বিপুল, এ কেমন প্রমা ?

সে সত্য কি স্মৃতি আজ তোমার নিবিড় ছায়াতলে
কত রোদে পুড়ে আর ভিজে কতো প্রাবৃটের জলে
অতীত জড়ানো দিন গোপন সত্যের মতো পুঞ্জি ক'রে শেষে
উড়ালে সুদূরে লীন নীল নিরুদ্দেশে।
হে নাগকেশর !
কই সে পারুল মেয়ে তুমি যার নাকের বেশর !
পারুলেরই মতো কেউ ছিলো বটে আরুলের বনের ওপার
হে নাগকেশর !
সেই স্মৃতি পাতি-পাতি খুঁজে রাখো সুনিশ্চিত জানো
তোমার অরণ্য-মন খুঁজে নিক্ কোথা আছে সে-স্মৃতি ছড়ানো !

সাত ভাই চম্পার তুমি এক ভাই
পারুলের পেলে আশ্‌নাই।

নাগকেশর, নাগকেশর !
গৌরী-মেয়ের নাকের তুমি কোন্ বেশর ?

নাগকেশর

কণা তোমার পরাগে ভরপুর
সুবাস হ'য়ে ছড়িয়ে গেলো সুর !
প্রাণের দ্বারে হাজির যে আজ স্পর্শ নিয়ে কোন্ সুদূর ?
অনেক দিনের স্মৃতির ভাঙা পেরিয়ে গেলে মাঠে—
খরায় ঝরায় দুপুর তোমার আপন গন্ধে কাটে ।
সেখান থেকে স্মৃতির যে-দীপ এনেছিলাম জ্বেলে
মনের খানিক এসেছিলাম তোমার ছায়ায় ফেলে !
আর কিছু না, দাও সেটুকু ফিরে—
প্রাণে আমার লেগেছে আজ গত দিনের হাওয়া—
চম্পা নামের ফুল-সোহাগী প্রণয় পারুলটিকে—
জারুল গলির বাঁকে সে যে অনেক দিনের পাওয়া ।
সব কুহেলীর কুহক ছিঁড়ে বন-সহেলী হাঁকে
উদাস মেঠো রিন্‌রিনানি চৈত্রদিনের ফাঁকে
নাগকেশর, নাগকেশর !
পারুল মেয়ের নাকে পরাও কোন্ বেশর !

সাত ভাই চম্পার তুমি এক ভাই
পারুল তোমায় খোঁজে তাই
আশা যার নেই তারও থাকে আশ্‌নাই ॥

ভবিষ্যতের ভয়

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

কেন এই বিষণ্ণ জীবন রাখা
বিষাদের বিবর্ণ আঙুলে
মুখে চোখে পাণ্ডুর রঙ মেখে
কতকগুলি অজস্র আলোর পুতুলকে
আড়াল ক'রে দাঁড়ানো !

উত্তরসূরী

যখন নদীর কলোচ্ছ্বাস
পাড়ের মানুষকে ডেকে ডেকে
গান শোনায়, লোক শোনে
তোমার মূর্তির ছায়া সেই জলে
ভবিষ্যতের ভয় ছড়ায়।
আহা, কেন তোলো না, জীবনের
রঙিন মোড়কে পণ্য দিনগুলোর
বেসাতি তোলোনা, লেন-দেনে হার
সে তো আছেই ; তাহ'লে চলো
যেখানে নদীর জল স্থির, অখিল নীল
মায়াহীন, অপরূপ
অপরূপ অন্ধকার—
জীবনের আলেয়া-আলোক
ছাড়িয়ে।

রবন ঠাকুরের শ্যামলী

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

বুকে রাখো সুবর্ণিকা, গান রৌদ্র বেলা।
প্রীতি করো বুকে ধরো দুঃখী তাপী দিন
দেখ হে সুবর্ণরেখা উন্মোচিত স্বর্ণচূড়া জলে
কেমন অলস খুশী খুলে তবু রহস্যের নদী।

কাছে পাই তাকে বলি, ধুলো মাটি হাওয়া
ঝাউয়ের স্বভাব জানা, মননের বিচিত্র তমসা ;
ছুটো কিংবা চারটে বুধ এঁকেছি বা মুছেছি তুলিতে
কখনো জ্যোৎস্নার অঙ্ক খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেছি বুঝি
একটি সহজ মন,
যাকে ঘিরে মহাপ্রাণ উদ্ভাসিত বাটি।

রবন ঠাকুরের স্তাবলী

দরিদ্র শিল্পের ঘরে ক্রন্দনের কল্যাণী আকাশ
নামবে আমি তার প্রার্থনাই
এখানে আলাই,
সুগন্ধময় উর্দ্ধে জ্যোতি দেখি
অন্তর্যামী আনন্দের শীর্ষে তাকে স্থির আনতে চাই।

দামান্তের হাতে মাত্র টিঁকে থাকা
অন্ন নিয়ে আছি এই
আমার যা-কিছু যায় মেঘরৌদ্রে লীন সনাবেশ।
চঞ্চল সুদূর আমি প্রতিবেশী সন্ধ্যা,
নিয়মী পাখির রেখা, সূক্ষে ফেরে, মনান্তরে গোধূলির ছবি।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে।
সমস্ত আকাশ মেঘলা মুখ
ভালোবাসা
একলা অবকাশের। কয়েকটি আত্মীয় স্মৃতি,
তন্ময়তা,
নির্বাসিত বৃষ্টির নির্জন।
খোলা আছে দরোজা হাওয়ার
কাকে ডাকি, কাকে বুকে রাখি।
নীল আলো অন্ত মনে একা-একা জ্বলে

দেখতে যদি
বিশ্বিত ঝড়ের রঙ
বাইরে, ঘরে
প্রাণের হাওয়াকে
মেঘের লিখনে বেঁধে উড়িয়েছি উদর সাগরে॥

সাতটি কথা

অর্ণব সেন

প্রথম কথা : আহা পাখিটা, বোকা পাখিটা শুধুই ঘুরে মরে
হলুদ ফুলে নীলচে মাছি, গা ঘিন্ ঘিন্ করে।
দ্বিতীয় কথা : সেই ছেলেটা, বোকা ছেলেটা, মেয়েটার নাম রুমি
মেয়েটা শুনি রূপসী ছিলো, পালালে কেন তুমি ?
তৃতীয় কথা : চেয়ারে বসে ছেলেটা শুধু প্রেমিক চিঠি লেখে
ছাতের পাশে থমকে বসা কাঠবিড়ালি দেখে।
চতুর্থ কথা : দুপুরবেলা বউটি শুয়ে নভেল-নাটক পড়ে
ছোট ছেলেটি ঠাণ্ডা হলো তারই এক চড়ে।
পঞ্চম কথা : ফুল এনেছো, ফুল এনেছো, খোঁপায় গুঁজে দাও
অনেক রাত, লক্ষী আমার, এখন শুতে যাও।
ষষ্ঠ কথা : আস্তে চলো, আস্তে চলো, পথের শেষে হাওয়া
আসুক ঘরে, যাইবা হ'ল ঘুমের দেশে যাওয়া।
সপ্তম কথা : আম কেটেছি, জাম কেটেছি ফলের মধ্যে পোকা
সাত সকালে পোকা পেলাম, তুমি আস্ত বোকা।

আয়না তার আলো

অরুণ ভট্টাচার্য

(বিমল কর বন্ধুবরেষু)

একথা কেন বলো !
শরীর তার যন্ত্রণায় বিফলতায় কালো
রক্ত পুঁজে মাখামাখি, অসুস্থতা, মৃত—
ছবিটি তার টাঙানো ঘরে আয়না তার আলো ।

একথা কেন বলো !
সংকুচিত লজ্জায় সে অন্ধকারের বিবর্ণতা মেখে
মাছির সঙ্গে মাছি হয়ে ঘরের কোণে নিমগ্নতায়
বসলো ; তবু দেওয়াল জুড়ে মুখ ঢাকলো তার ।
অনন্যতা উজাড় করে আকাশ তাকে ডাকলো তিনবার ।

একথা তাকে বোলো,
সুখ চেওনা, দুঃখ বরং অপার আশা দিয়ে
মন ভোলাবে অজস্রতায় কৃষ্ণচূড়ার লাল
সারা আকাশ রাঙাবে, আর ভালবাসায় ভরবে সংসার ।
শূন্য ঘর, কঠিন হাওয়া ;—আয়না জুড়ে বাঁচবে কতকাল !

নীল ঘর

আলোক সরকার

রাজার কুমার : কিন্তু তুমি কেমন ক'রে চুল বেঁধেছো ?
একেবারে এলো খোঁপা, স্বর্ণজালিকার
কোথায় উজ্জ্বল সেই বৈশাখী আলোর
তীব্র সমারোহ ? খোঁপায় পরবার জন্যে কী ফুল এনেছো ?
আমি একে চিনতে-ই পারি না। আমি একে কখনো দেখিনি।
মাত্র একটি ফুল, তা-ও সাদা, যেন আমার বাড়ির
নিচের তলার এক অপরিচিত উঠোন, আমি
চারতলার থেকে কোনোদিন নেমে এসে সেখানে দাঁড়াইনি।

মেয়েটি : তোমার কি ভাল লাগছে ? আমি তোমার জন্যেই
হিজলতলার সেই শ্রাবণ মেঘের মতো বিস্তৃত শীতল
বাগানে অনেক ঘুরে ফুল এনে খোঁপায় রেখেছি।
তুমি তো আমায় চিনে নিয়েছিলে। চারতলার কোলাহল
থেকে নেমে এসে শুভ্র দরিদ্র পথের এক ধারে।
অবশ্য আমাকে পাবার জন্য সেদিন আসোনি।
তুমি অন্যমন
পথ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ আমার-ই
দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলে চকিত বিস্মিত ভালোবাসায়।
তেমনি নীল হৃদয়ী আলোয়
এই সাদা ফুল তুমি তোমার আপন ক'রে নাও।

রাজার কুমার : এই সাদা ফুল আমি এতো আলো কখনো দেখিনি
আমার দু-চোখ যেন ভয় পায়। আমি
বৈশাখী আলোর সেই স্বর্ণজালিকার দিকে কখনো চাইনি
তবুও যখন চোখে এসেছিলো সইতে পারতুম।
কিন্তু তোমার ফুল কোন বিদেশের অনুগামী
যেন দীপ্ত তেপান্তরে আমাকে এনেছে।

নীল ঘর

মেয়েটি : আমার নিজের দেশে তোমাকে আনবো তাই সেজেছি এমনি ক'রে।
তুমি তো আমাকে ভালবাসো। তুমি এসো
আমার ঘরের এই মাটির দাওয়ায় তুমি বসতে পেরেছো।
তুমি সাজো
আমার ঘরের এই মাটির শ্যামল রঙে। কিংবা চলো
আর একটু দূরের ওই বনের ভিতরে। যেখানে আমার
সারাদিন কাটে মেঘের ছায়ার রঙ দেখে।

রাজার কুমার : তোমার সঙ্গেই আমি যাবো। চিরদিন
থাকবো তোমার পাশে-পাশে। তোমার চোখের মতো
পূর্ণিমা কখনো দেখিনি আমি। তোমার চোখের-মতো
ভালবাসা কখনো দেখিনি আমি।
ভালবাসা চিনে নেবো ব'লে পথে নেমে এসেছিলুম
সেই ভালবাসা আমি চিনতে পেরেছি
তোমার চুলের ওড়া দেখে।
কিন্তু কোন বিদেশের পথে তুমি
আমাকে আপন ক'রে নেবে ?

মেয়েটি : দেখো, দূরে বনের ভিতরে
খুব অল্প আলো সেই অল্প আলোয়
কিছুটা মধুর বলা, আর যা এখনো হয়নি বলা
তাকে আমরা প্রেম ভালবাসার রঙে
স্পষ্ট ক'রে চিনে নেবো।
বিদেশ তোমার প্রিয় আপন ঘরের মতো হবে।

রাজার কুমার : বনের ভিতরে সব যেন ছড়ানো রয়েছে
সব যেন এলোমেলো। আমি ঠিক বুঝতে পারি না
আমি যেন ভয় পাই—আমার বারবার স্পষ্ট মনে পড়ে
চারতলার সেই নীল আলোকিত ঘরটির কথা।
তার আসমানী আয়না থেকে
আকাশ দেখতুম আমি
এবং অনেক বড় আর এক আকাশ

সেই ঘরে সাজিয়ে রেখেছিলুম
চাঁদ-তারা-ফুল-পাখি সব-ই সেখানে ছিলো।

মেয়েটি : তাকে ভুলে কেন তবে নেমে এসেছিলে ?

রাজারকুমার : ভালবাসা পাবো বলে। এখন বলবো
তোমাকে পাওয়ার জন্যে। তুমি-ই আমার ভালবাসা।
আমাকে আপন ক'রে নাও।

মেয়েটি : তোমাকে আপন ক'রে পাবো এই বনের ভিতরে
যেখানে আমার সব ভালবাসবার রঙ
আছে। তুমি চলো। কিন্তু খুলে ফেলো
এই রেশমের উত্তরীয়
বনের ভিতরে
রাজার পোষাক মানাবে না।
আমার চোখের ভালো-লাগা দিয়ে তোমাকে সাজাবো
তোমাকে আপন ক'রে পাবো।

[দু-জনে বনের ভিতর]

রাজার কুমার (মনে মনে) : বিস্তৃত বনের মধ্যে নদীর কিনারে
আমি যেন কিছু-ই দেখতে পাই না।
বড়ো-বড়ো গাছ আর ঘুঘুর ডাকের মতো নদী
যেন এক অবিরহ বেদনার সান্দ্র অন্তমন।
আমি যেন এইখানে হারিয়ে গিয়েছি
অন্ধকার গাছগুলো শত্রুর দেশের সৈনিকের
মতো মনে হচ্ছে। যেন আমাকে লুট ক'রে নেবে বলে এলো ;
আমি কি পালিয়ে যাবো ? কিন্তু দেখো-দেখো
মেয়েটির মুখ যেন বৃষ্টি-থামা দিনের মেঘের
মতন রহস্যময়। সুন্দর কিন্তু কী প্রখর
প্রান্তরের কণ্ঠে ডাক দেয়। কোথাও পারবো না যেতে আমি
এখানেই থাকতে হবে।···কিন্তু সেই নীল ঘর !

মেয়েটি : কী ভাবছো ?

রাজার কুমার : কিছুই না। তোমাকে দেখছিলুম আর দেখছিলুম
না-না আর কিছুই দেখছিলুম না আমি।

মেয়েটি : দেখো ওই আমাদের ইচ্ছার মতন নদীটির
স্রোতের নিবিড় রেখা আকাশের সবগুলি তারা
আকাশের সবগুলি মেঘ
বুকের ভিতরে এনে রেখে এক সম্পূর্ণ আকাশ।
এর-ই তীরে আমরা দু-জনে একরকম ঘর বাঁধবো।

রাজার কুমার : (মনে-মনে) নদীর স্রোতের বুকে আকাশের সব তারা আছে
সব মেঘ আছে কিন্তু সেই তারা সেই মেঘ নেই
যে-রকম মেঘ-তারা আমার বিস্তৃত নীল ঘরে ছিল।
যেখানে নিবিড় আমি সব সময় বেঁচে থাকি।
যে-ঘর সাজাবো বলে বাইরে এসেছিলুম
ভালবাসার রঙ খুঁজে নিতে।
সেই ঘরটির মতো নিবিড় অমল রঙ
এখানে কোথাও নেই। কিন্তু ভালবাসা আছে।
দেখো দেখো মেয়েটির মুখ যেন অস্পন্দ দিঘির
ভিতরে বিকেলবেলা যে-রকম আলো নামে
সেই রকম আলো। যেন পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরের
উপরে প্রথম আলো। যেন আমায় মাঠ পার হয়ে
উঁচু-নিচু টিলা পার হয়ে ছুটে যেতে হবে।
যেন কোনোদিন থামতে পারবো না।·····
(মেয়েটিকে) তোমার পাশেই আমি থাকবো চিরদিন, বাঁধবো
এক রকম ঘর।
কিন্তু তুমি আর একটু কাছে এসো, স্পষ্ট ক'রে চাও
তোমাকে এখন-ও যেন চিনতে পারছি না।
কিংবা তোমাকেই একমাত্র চিনতে পারছি।···
কী যেন হয়েছে চারদিকে
যেন ধুলো, যেন বালি, যেন ঝড়···
তোমার মুখের রেখা এই মুহূর্তে স্বর্গের মতন

মনে হচ্ছে—আমার দু-চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে
তোমার মুখের তীব্র উন্মুখর ঢেউ ছাড়া আমি
আর কিছু দেখতে পারছি না।

মেয়েটি : শান্ত হ'য়ে বসো, ধরো আমার দু-হাত
তাকাও আমার দিকে, দেখো
সূর্যের মতন নয় ভোরবেলাকার শিউলির
মতন আতপ্ত ঘর। তুমি এই ঘরে বসো।
দেখো দূরে বকুল ছড়ানো, দেখো দূরে পাতার সবুজ
আর এক সমগ্র দুপুরবেলা বুকের ভিতরে স্পষ্ট শোনো।

রাজার কুমার : ঠিক তাই। তোমার মুখের দিকে যতোবার চাই
মনে হয় হাজার-হাজার জানলা খোলা
তুমি স্পষ্ট করে ডাকো। আমি যাবো। আমি যেন
অনেক-অনেক দূরে হারিয়ে গিয়েছি।
কিন্তু অনেক দূর কেন
আমি যেন নিবিড়-নিবিড় কাছে আবার এসেছি।
তোমার দু-হাত যেন স্পন্দিত প্রাসাদ
আমাদের দু-জনের থাকবার একরকম ঘর
হাজার রঙের মেঘ আছে, হাওয়া আছে
খঞ্জনা পাখির ডাক আছে···সব আছে।
কোথায় বাঁশবনের মধ্যে হাওয়া বইছে শুনতে পাচ্ছো
কে যেন মিনতি করে বলবে কিছু···
নীল ঘরটির রঙ ক্রমেই আবছা হয়ে আসছে।

মেয়েটি : তোমার চোখের ভাষা কী রকম যেন
যেন তুমি অন্য কিছু ভাবছো। আমাকে
বলবে না? কোথাও বাঁশবন নেই, শালবনের ভিতর
হাওয়ার প্রার্থনা শুনে অতো ভয় পেলে কেন?
ওরা আমাদের
মিলনের শুভ কামনায়
ঈশ্বরের কাছে দেখো আনত হয়েছে।

রাজার কুমার: কিছুই ভাবছি না। তুমি আর একটু কাছে এসো
তোমার চুলের অন্ধকারে হাত রাখতে দাও।
আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না
কিছু-ই দেখতে পাচ্ছি না—কেবল তোমাকে ছাড়া।
প্রার্থনা করছে কারা? কেন করছে?
কিছুই জানি না আমি। জানতে চাইবো না কিছু। তুমি
আর একটু কাছে এসো তোমার মুখের শ্যামলিমা
স্পর্শ করতে দাও।

[মেয়েটি আরো কাছে এলো। রাজার কুমার আরো কাছে। বনের ভিতর হাওয়া, হাওয়ার শব্দ; পাতার ছায়া, পাতার উড়ে-যাওয়া, ঘুরে ঘুরে ওড়া পাতার শব্দ। সব মিলিয়ে নির্জন। নিবিড় স্পন্দিত নির্জন মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে।]

রাজার কুমার: সুন্দর মেয়েটি আমার কোলের উপর মাথা রেখে
ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি
আবছা আলোয়। এলোমেলো পাতার ছায়ারা
ওর মুখে চন্দনের টিপের মতন শান্ত, যেন ওর মুখ
বিকেলবেলার যত প্রণত নীরব।
কখনো দেখিনি যেন আমি এতো বিস্তীর্ণতা,
যেন আমি কখনো ফিরতে পারবো না দীর্ঘ মাঠ পার হয়ে,
যেন রাত্রি হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় ফিরবো?
ফিরতে আমি চাই না কখনো।
তোমার মুখের আলো বনের ভিতরে
লক্ষ লক্ষ পদ্মের মতন। আমি কখনো ফিরবো না।
কিন্তু কারা যেন ডাকে। বাঁশবনের ভিতরে হাওয়ার
মিনতি কোথায় যেন স্পষ্ট। যেন অভিমান, যেন
প্রতিবাদ, যেন ঘন বনের আবছা অন্ধকার
এখনি খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে যাবে। যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি
সব গাছ সব পাতা তীব্র কথা বলছে।...
ভয় লাগে বনের ভিতরে
অতবড়ো বিস্তীর্ণতা সইতে পারি না আমি।

চারতলার সেই নীল জানলা থেকে আকাশ দেখতুম আর
নিজের মনের মতো আকাশ সাজাতুম। কিন্তু এই
বনের চারিদিকে একটি দেয়াল নেই। একটি আড়াল নেই
যেন বড়ো-বড়ো স্রোত একমুহূর্তে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে
অসীম বিদেশে। নিয়ে যাবে কেন? অসীম বিদেশে যেন
আমাকে এনেছে।
আমি কিছু চিনতে পারছি না, কিছুই দেখছি না···
সেই নীল ঘর তাকে আমি সাজাতে চেয়েছিলুম
তাকে আমি সাজিয়েছিলুম সমস্ত জীবন ধরে
বিচিত্র রঙের সমাহারে—
আর একটি রঙ খুঁজতে বাইরে এসে আমি কোন রঙে
নিজেকে সাজালুম—ভালবাসবার রঙ, কিন্তু ভালবাসা
আমার নিবিড় নীল ঘরে সে যাবে না।
বলতে পারবো না তাকে যেতে। যদি বা সে যায়
বিকেলবেলার মতো প্রণত আলোর বিস্তীর্ণতা
সেখানে পাবো কি? আমি ভয় পাই। কিন্তু পাতায় পাতায়
তীব্র হাওয়ার প্রতিবাদ কোথায় হাজার রক্ত
ভেঙে ফেলছে। কোথায় চৈত্রের বনে আগুন লাগলো,
পুড়িয়ে দেবে সে যা-কিছু সঞ্চয় তুমি করেছিলে
যা-কিছু সঞ্চয় তুমি করতে চাইছো।

[রাজার কুমার মেয়েটিকে কোলের থেকে মাটিতে আনলো। রাজার কুমার তাকে একবার দেখলো, বনের গভীরতা দেখলো, নিজেকে দেখলো]

তুমি ঘুমিয়ে থাকো এই বনের ভিতরে
প্রবাহিত বিস্তৃত স্বাধীন।
আমার ভালবাসা আমি এই বনের ভিতরে
থাকতে পারি না। আমার অপর ঘর আছে
প্রবাহিত বিস্তৃত স্বাধীন।

আলোচনা

জয়সের পত্রাবলী

মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জানতেন লেখকের আত্মজীবনীতে কোন উপায়ে লেখক নিজ চরিত্র উপস্থিত করেন। আমার উক্তিটি অসার মনে হতো না, যদি পাঠক তন্মুহূর্তেই 'স্বরচিত জীবনচরিত'-এর কথা স্মরণে আনতে সক্ষম হতেন। গভীর অধ্যয়নের সীমা যদিও অসীম নয়, তথাচ, স্বদেশ এবং বিদেশের কিছু কিছু মনীষীদের ভুবনবিখ্যাত আত্মচরিত ও জীবনস্মৃতি পাঠে আমার ক্ষুদ্র সীমার গণ্ডিও লঙ্ঘিত হয়েছে। এবং যেহেতু একালে বুদ্ধি-বৃত্তির মহাপ্রসাদে সকলেরই কিঞ্চিদধিক অধিকার সুতরাং সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার বিচক্ষণ পাঠকের বিবেচনার ওপর ছেড়ে আমার বক্তব্য : 'স্বরচিত আত্মচরিত'এ বিদ্যাসাগর মশাই-ই একমাত্র পিতামাতার পরিবর্তে উক্ত পূজ্যপাদকের স্বনামে সম্বোধিত করার সক্ষম। এ বিষয়টি আপাত যতটা সহজ, কার্যক্ষেত্রে ততটা নয়। কারণ 'ঠাকুরদাস' এবং 'ভগবতী দেবী' শব্দদ্বয় ব্যবহারে প্রমাণিত হয় যে বিদ্যাসাগর জানতেন শিল্পক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি মহৎ শিল্পীর লক্ষণ। তদুপরি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির অর্থ নির্মমতা নয়, মোহহীনতা।

জেমস জয়স্-এর উপন্যাসাবলীতে তেমন দৃষ্টির উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যাবে। অবশ্য, বর্তমানকালের অধিকাংশ আলোচকের সিদ্ধান্ত : স্টেফন ডেডলাস্ ও লিওপোল্ড ব্লুম আসলে রক্তমাংসে জেমস জয়স্ স্বয়ং। প্রখ্যাত সমালোচক এবং সম্পাদক R. A. Scott-James তো পরিষ্কার বলেছেন—The long fragment of an autobiographical novel published after his (Joyces) death, Stephen Hero, tells the history of Joyce's undergraduate life at the National University in Dublin ; কিন্তু এমন কথা উঠতে পারে যে উক্ত আলোচক তাঁর গ্রন্থে অনেক ভুল ভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং আসলে জয়স্ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ধোঁয়াটে। অধিকন্তু তিনি

ব্লুম ও জয়স্-এর মধ্যে কোন ভেদ-চিহ্ন টানা না-টানার দায় গ্রহণ করেননি। কিন্তু সে দায় গ্রহণ করেছেন অন্য কিঞ্চিৎ আধুনিক প্রবন্ধকার স্টেফন ব্লুম তাঁর প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে জয়স্-এর পত্রাবলীর স্টুয়ার্ট গীলবর্ট কর্তৃক সম্পাদিত সাম্প্রতিক সঙ্কলন উপলক্ষ্যে। তাতে আছে : In many of these letters Joyce is a real Leopold Bloom ; Stephen Dedalus and Leopold Bloom, the Hellenese and the Jew, the artist and the philistine, the son and the father—by the time Joyce's death these two dissimilars seem to have found a comforting oneness in the man who created them ; ক্রমিক আলোচনায় দেখা যাবে ব্লুম সাহেবের উক্তির মূল কোথায়। অর্থাৎ তিনি কোন সব চিঠির উপর নির্ভর করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।

নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হলেও, আমার মনে হয়, স্বদেশে তো বটেই বিদেশেও আজ চতুর সমালোচকের অভাব নেই। তাঁরা কিছু ধোঁয়াটে প্রসঙ্গ তুলে সহজেই পাঠক-কে কাহিল করেন। স্টেফন ব্লুমও তেমনি প্রচেষ্টা করেছেন। সহজেই বোধগম্য যে তিনি সাহিত্য-শিল্প-সমালোচনায় ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের কার্যকারণে আস্থাবান। যদিও জাগতিক মনুষ্যজাতির একাংশ প্রায় মার্ক্সএ বিশ্বাসী এবং এ সত্য ব্লুম সাহেবের ওপর অরোপিত না করেও—অর্থাৎ সাম্প্রতিক সমালোচনার জগতে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি পদ্ধতির প্রয়োগ স্মরণ না করিয়েও বলা যায়—চরিত্রাবলী যখন লেখকের মনের দূতীগিরি করে পাঠক-সকাশে তখনই লেখকের সত্যকারের দৃষ্টিমোচন হয়,—যাকে বলা যায় দিব্যদৃষ্টি। জয়স্-এর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি কতদূর সত্য তা' পরে বিচার করা যাবে।

সত্য বটে, শিল্পীকে তাঁর রচনার দ্বারা বিচার করার একটা হুজুগ আজকের সমালোচকদের উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁরা মনেন না, শিল্পীর একটি বিশেষ মনের অবস্থায় তাঁর শিল্পের বিশেষ পরিণতি ঘটে। অথবা, সামাজিক কোন পরিবর্তন

---

১ R. A. Scott-James : Fifty years of English literature : Longmans.
স্টেফন হেরো, গ্রন্থটি জয়স্-এর মৃত্যুর পরে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিরূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর রচনাকাল আরো আগে। এবং দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর জয়স্ এটি পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিতরূপে প্রকাশ করেছিলেন—নাম, A Portrait of the Artist as a young man.

শিল্পীর মনে যে দোলা জাগায় তারই প্রতিরূপ পাওয়া যায় শিল্পে। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও টেনিসনের বিশালায়তন জীবনচরিত পাঠে বলেছিলেন—এইটি টেনিসনের আত্মজীবনী, কবির নয়। অর্থাৎ কবির আত্মজীবনী যা' হবে, রবীন্দ্রনাথ অন্তত যা' চেয়েছেন তা' 'জীবনস্মৃতি'। আশা করি এ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের উক্তির পক্ষে অপব্যাখ্যা নয়। পক্ষান্তরে, যাঁরা ফ্রয়েডে আস্থাবান, তাঁদের সিদ্ধান্তে: এ নর জীবনে মানুষ যা' ভাবে তা' করে না অথবা যা' সচরাচর ক'রে থাকে তা হয়ত ভাবেই নি। একারণে তাঁরা শিল্পীকে বিচার করতে যে উপাদান নিতে ইচ্ছুক, তা, গ্রহণ করেন শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিবৃত্ত হতে। তাঁদের যুক্তিতে, সেখানেই পাওয়া সম্ভব সব রহস্যের সমাধান। আমার মনে হয়, এই ফ্রয়েডীয় সমালোচকেরা, যদি একান্ত অসুবিধে না হতো, তবে সাহিত্য শিল্প-বিচারের প্রয়োজনে শিল্পীর স্বপ্নকাহিনীও বিশ্লেষণে বসতেন এবং তা' থেকেই আরও সহজতর হতো যে কোন শিল্পবিচার। বস্তুত পরাবাস্তবতার শিল্প তো স্বপ্ন ও সজ্ঞার সঙ্গমে উৎপত্তি হয়েছে। সেহেতু, ফ্রান্সে দাদাইজমের পরে পরে ব্রিস্তঁ ৎসারার সময়েই সুররিয়লিজম-এর সংজ্ঞা দেওয়া গেছে:

Pure psychic automatism by means of which it is proposed to express, either verbally, in writing, or in any other way, the real process of thought—in the absence of all control excercised by reason and outside all aesthetic or moral considerations.

এই সূত্রের শেষাংশের শব্দাবলী কেবলমাত্র 'psychic automatism'কে প্রতিষ্ঠিত করতেই ব্যবহৃত হয়েছে। সজ্ঞার সঙ্গে reason, aesthetic, moral ইত্যাদি শব্দের কোন যোগসূত্র আছে কিনা জানি না। কিন্তু ওরা শুধুমাত্র জোর দিতে ইচ্ছুক consions এবং unconscious শব্দ দুইটির গুরুত্বে। সুতরাং ফরাসী সাহিত্যের বহুশ্রুত এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্রেয়ার্ড ঠিকই বলেন:

This emphasis on the unconscious and its arbitrary separation from the conscious, stemmed from the theories of Freud.....Applying them to literature and art, the surrealists were led to attach great importance to dreams and to 'automatic writing'.

সে জন্যই স্বপ্নবিচার মানুষের মন জানার প্রকৃষ্ট উপায়। এবং অনেকক্ষেত্রেই এ ভিন্ন ফ্রয়েডীয় চিন্তাশীলদের কাছে গতিরন্যথা।

সুতরাং আত্মজীবনী যদি অন্তত, লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের আনুবৃত্তিও গ্রহণ না করে, তবে শিল্পবিচারে অসুবিধে হবে তা'তে দ্বিমত নেই। সে হেতু মধ্যযুগের দান্তে, পরবর্তী যুগের গ্যেটে, টলষ্টয়, রুশো ইত্যাদি এঁদের প্রত্যেকের আত্মজীবনীতে শিল্পীর চেয়ে বড় হয়ে দেখা গেছে মানুষকে, তাঁর সুখ দুঃখ, হতাশা যাচ্ঞা, প্রেম অপ্রেম, পরিণয় বিচ্ছেদ এসব নিয়ে। আসলে তাঁরা সেখানে মানুষ হয়েছেন, নিজের নিজের কথা নিঃসঙ্কোচে লিখেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি, এ শ্রেণীর জীবনস্মৃতিতে অনেক সময়ই রচয়িতার আত্মধিক্কার বোধ জেগে ওঠে ও পাপক্ষালন প্রবৃত্তি দেখা যায়। যেমন কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজের গিরিশ সেন মহাশয়ের বিখ্যাত 'আত্মজীবনী'তে দৃষ্ট। তা' অনেকটা ইয়োরোপীয় কায়দায় মহামান্য চার্চের নিকট নিজ পাপ স্বীকারে মুক্তিপ্রার্থনা। অনেকাংশে এ সব দুর্বলতা আমাদের কাছে আজ হাস্যকর হলেও, এ কথা সত্য যে উক্তশ্রেণীর আত্মচরিতেই ফ্রয়েডীয় সমালোচকেরা সুবিধে পান বেশি। যেহেতু মানসিক চিকিৎসায় আজো অচেতন প্রগল্‌ভতা সর্বাংশে কার্যকরী বলে প্রচারিত।

কিন্তু জয়স্‌-এর এমন কোন আত্মজীবনী নেই। এবং জয়স্‌, প্রুস্ত বা কাফ্‌কার মত এত দুর্বোধ্য যে যদিনা তাঁর উপন্যাস পাঠের সমস্যা নিতান্ত কাটিয়ে ওঠা গেল, তবু তাঁর অন্তে পৌঁছানো একান্তই সাধারণ পাঠকের সমস্যা। সুদ্ধ সাধারণ বলি কেন? জয়স্‌ পাঠের জন্য ভিন্নতর মনের প্রয়োজন, নিদারুণ ধৈর্যেরও। অবশ্যই যে কোন মহৎ শিল্পীর রচনা পাঠের জন্য উক্ত সব গুণাবলীর একত্রীকরণ আবশ্যিক। ওয়ার এ্যণ্ড পীস্‌, ম্যাজিক মাউণ্টেন, দি ফল্‌ ইত্যাদি এবং কাব্যে মেটাফিসিক্যাল গোষ্ঠী অথবা এজরা পাউণ্ড; এলিঅট, হতে এদেশের সুধীন দত্ত বিষ্ণু দে, এঁদেরও হৃদয়ঙ্গম করতে যে পরিমান অধ্যবসায় প্রয়োজন, আমার মনে হয়, তাতে নবতর সৃষ্টিও অনেক ক্ষেত্রে হয়ত সম্ভব। যাঁর অভিজ্ঞতা আছে তিনি জানেন, ইনটেলেক্‌চুয়াল না হওয়া সত্ত্বেও মর্কিন আপ্‌টন সিনক্লেয়ার-এর 'দি ওয়ার্ল্ড্‌স্‌ এণ্ড' গ্রন্থাবলী সমাপ্ত করতে কি অমানবিক পরিশ্রম হয়। এ কারণেই ওয়েল্‌স্‌ একদা জয়স্‌কে লিখেছিলেন :

You have in your composition a mighty genius for expression which has escaped discipline,.....So I ask who the hell is in this Joyce who demands so many working hours of the few thousands; I have still to live for a proper appreciation of his quirks and fancies? এবং জয়স্-এর প্রত্যুত্তর: Writing in English is the most ingenious torture ever devised. The English reading public explains the reason why.

বস্তুত ওয়েল্‌সের অভিযোগ আজকের প্রায় প্রতিটি পাঠকের মর্মকথা। কিন্তু যে শিল্পী তাঁর উপন্যাসের জন্য দীর্ঘ সোড়শ বর্ষ ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তিনি সে রচনার জন্য পাঠকের নিকট কিছু পরিশ্রম দাবী করবেন ন্যায়ত। মালার্মের সেই 'কুন্তারাল টোষ্ট' রচনার পর প্রভাতে স্ত্রীর নিকট প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করুন। স্ত্রীর দ্বিতীয় প্রসবের সন্তান যদি বিশ্বে নিজ আসন না পেতো তবে জন্মদাত্রী তাঁর বেদনা ভুলবে কোন উপায়ে।

সেই হেতু আমি মানি যে শিল্পীর জীবনরহস্য সর্বাংশে উপলব্ধি করতে পারলে তাঁর সাহিত্য সম্যক বোঝা সহজ। এবং তা' যখন তাঁর আত্ম-জীবনীতে লাভ করা সর্বদা সম্ভব নয়, যেমন জয়স্-এর ক্ষেত্রে হয় নি তখন আমাদের অপেক্ষা করতে হয় একান্ত ব্যক্তিগত পত্রাদির প্রকাশনার জন্য। আমার বিশ্বাস ষ্টুয়ার্ট গীলবর্ট জয়স্-এর পত্রাবলীর সঙ্কলনটি প্যাট্রিশিয়া হকিন্সের গ্রন্থ James Joyces World রচনার পূর্বে সঙ্কলন করতেন তবে ও গ্রন্থ জয়স্‌কে বোঝার পক্ষে উল্লেখ্য হতো। এবং একমাত্র উক্তরূপ কোন সঙ্কলন না থাকায়—পক্ষান্তরে সম্প্রতি 'পত্রাবলী' প্রকাশিত হওয়ায় ও বইটি আজ রচয়িতার অসীম বিদ্যাবত্তার ও ধৈর্যের পরিচয়ই শুধু বহন করছে। তন্নিবন্ধন আশা করা যায় যে বর্তমানে জয়স্-এর মনের পটভূমি যথেষ্ট ও যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ পন্থায় দর্শান সম্ভব হবে।

'লেটর্স অব জেমস্ জয়স' এ জয়স্‌কে লিখিত কতিপয় এবং জয়স্-লিখিত পত্রগুচ্ছ সঙ্কলিত হয়েছে। জয়স্-এর ঊনবিংশ বয়ঃক্রমের সময়, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, হেনরিখ্ ইবসেন-এর জন্মতিথি উপলক্ষে প্রথম পত্র। তাঁদের দুজনের মধ্যে—বস্তুত, তেয়াত্তুর বৎসরের বৃদ্ধ এবং অন্যজন অতি তরুণ, ইনটেলেক্-চুয়াল গ্রুপের নতুন নায়ক—পত্রবিনিময় এই প্রথম। এর কিছুদিন পূর্বে, 'দি

ফর্টনাইটলি রিভিয়্যু' তে জয়স্-এর When we dead awaken নামে একটি প্রবন্ধ রচনা উপলক্ষ্যে ইবসেন এই তরুণকে স্বাগত জ্ঞাপন করেছিলেন উইলিয়ম আর্চারের মারফৎ। এবং এই দূতব্যক্তিই জয়স-এর ১৯০১ সনের পত্ররচনা ব্যাপারে প্রধানতম অনুপ্রেরণা। প্রসিদ্ধ সমালোচক এবং হেনরি জেমস্-এর টীকাকার লিওনেল ট্রিলিং এই পত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন :

It is really a superb letter—it is meant to be just that, in the literal sense of the word : it was the young man's announcement that he was claiming his birthright, that he was taking his place in the tradition. (Encounter Vol. IX, No. 2).

ট্রিলিং সহেবের উক্তির সত্যতা প্রমাণে আমি এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এতে মাত্র উনিশ বছরের একটি যুবকের আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা নিশ্চিত আমাদের বিমূঢ় করবে—Do not think me a hero—worshipper, I am not so. And when I spoke of you in debating societies and so forth, I enforched attention by no futile rantings. But we always keep the dearest things to overselves.

এবং পরে

As one of the younger generation for whom you have spoken, I give you greeting not humbly, because I am obscure and you in the glare, not sadly because you are an old man and I am a young man, not presumptuously or sentimentally —but joyfully, with hope and with love, I give you greeting."

ইবসেনকে লিখিত উক্ত পত্রের সমতুল অন্য কোন পত্র এ গ্রন্থে বিরল। এমন কি 'উলিসিস্'-লেখকের কলমে এই পত্রের ভাষার সারল্যও আমাদের বিমুগ্ধ করে। এবং সমগ্র গ্রন্থে এমন ভাষাও আর দ্বিতীয়বার দেখা যাবে না।

জয়স্-কে তাঁর প্রায় সমস্ত জীবন কঠোর অর্থ কৃচ্ছতায় কাটাতে হয়েছে। এমন কি পাউণ্ড, য়েট্স, ওয়েলস্ প্রমুখর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি জয়স্-এর বাল্যবন্ধু হ্যারিয়েট শ' ওয়াভার-এর ১৯৩৭ থেকে গোপন অর্থ সাহায্যও তাঁকে মুহূর্তের নিশ্চিন্তি দেয় নি। তিনি যেমন নিজের খ্যাতি বিষয়ে অমনোযোগী, অসাবধানী, তেমনি ছিলেন অর্থোপার্জনের কায়দাকানুন সম্বন্ধে : অবশ্য তাঁরই রচনায় সেই secrecy, silence, and cunning এই তিন সূত্র লিখিত হয়েছে। এবং তিনিই সে ব্যক্তি যাঁর 'ডাবলিনর্স' প্রকাশিত করার ইতিহাস সাহিত্যজগতে বিখ্যাত হয়ে গেছে। দীর্ঘ নয় বৎসর ধরে এই

সংগ্রাম চল্লিশটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি একাই চালিয়ে গেছেন। এবং জীবনে তিনি শুধু এই একবারই মাত্র কঠোর সংগ্রাম করেছেন। তাছাড়া আরও শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন নির্বাহ বিষয়ে তাঁর শুধু আকাঙ্ক্ষাই ছিল, সংগ্রাম ছিল না।

বোধ করি সর্বকালের মহাশিল্পীরাই কিঞ্চিদধিক আত্মপ্রত্যয়ী হন। একথাতো বহুজন খ্যাত নমস্য শিল্পী পিকাশো বলেন: They say I draw better than Raphael, and probably they are rihgt. তাছাড়া গত অর্ধশতক তিনি যে চিত্রকলায় সমগ্র য়ুরোপকে পরিচালিত করেছেন, সে কথাও শোনাতে ছাড়েন না। অবশ্যি তাঁর এসব উক্তিই সত্য। এমন কি, তিনি যখন পারীতে Unesco'র নতুন ভবনের দেওয়াল অলঙ্করণ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরির সমতুল বলে বর্ণনা দেন, তখনও সেটি অসমীচীন নয়, বাতুলতাও নয়! কারণ তিনি তাঁর শেষ চিত্রেও—woman by a window, যাতে তাঁর শেষ রক্ষিতা জাকুল্যান রোক্-এর ধারাবাহিক পঞ্চাশটি চিত্র আছে—একথার প্রমাণ দিয়েছেন। পিকাশোর কথা বললাম জয়স্-এর কথা ভেবে। জয়স্-এর পত্রাবলীর সঙ্কলনটা পড়লে মনে হবে তাঁর মনে একটি মহাগর্বী মানুষ লুকিয়ে ছিল। বস্তুত, মানুষের দ্বিসত্তায় আজ আমাদের অনাস্থা নেই। ফ্রয়েডের ভাষায় Doppelganger কেও আমরা নিশ্চিন্তে মেনে নিয়েছি। অন্তত যাঁরা এতাবৎকাল এই spiritual double theory'তে বিশ্বাস রাখতে পারেন নি তাঁরাও সম্প্রতি—ভিয়েনীজ নাট্যকার আরটার শনিৎলার-কে ১৯২২ এ ফ্রয়েড্ কর্তৃক লিখিত পত্র পাঠে—আস্থা পাচ্ছেন। বিষয়টি প্রাচীনতায় প্রায় মিশরীয় সভ্যতার সমকালীন। কারণ, পৌরাণিক ইজিপসিয়াস চিত্রে দেখা যায়, ফারাওদের ঠিক পেছনে প্রধানচিত্রের অনুরূপ পোষাক পরিহিত কিন্তু ক্ষুদ্র অন্য একটি মূর্তি রয়েছে। ওইটি এই ফারাও এরই ক্ষুদ্ররূপ। কিংবা বলা চলে ওই ক্ষুদ্রমূর্তি Doppelganger-ই হচ্ছে প্রধান মূর্তিটি। জয়স্ সম্পর্কেও উইণ্ডহাম ল্যুইস এই অভিযোগ দীর্ঘকাল পূর্বে দিয়েছিলেন। ল্যুইস এর নিজের ভাষায়:

Joyce was forever worried about his gentility or gentlemanliness and he thought of his genius not only as sacred spiritual trust but a property, as an investment that had to be made to pay.

আমার মনে হয়, জয়স্-এর এই মনই তাঁকে লরেন্স প্রসঙ্গে, বর্ণার্ড শ'র সম্পর্কে অনেক অসংযত উক্তি করিয়েছে। এমন কি প্রুস্ত সম্পর্কেও তাঁর অসহিষ্ণু মতামত আমাদের বিমর্ষ করে দেয়। আসলে তিনিও জানতেন যে উপন্যাসে তৎকালে তাঁর যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন ফরাসী প্রুস্ত। তথাপি তিনি কখনো প্রুস্তে 'বিশেষ মনীষা' কিছু দেখেন নি। তাঁর মতে এমন কিছু প্রতিভা প্রুস্তের নেই যা' নিয়ে গর্ব করা চলে। একটি বিষয় বোধ করি প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছেন—জয়স্-এর প্রথম জীবনে প্রায় কোনই বান্ধব ছিল না। ওয়েলস্, য়েটস্, পাউণ্ড ও মার্স-ও যে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাও মনে করার সুযোগ নেই। যদিও তাঁদের প্রত্যেকের ঐকান্তিকতা ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব হবে বলে আমি মনে করি এবং যথার্থই তাঁদের জয়স্-এর রচনা প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা অত্যন্ত মূল্যবান হয়েছিল তার পক্ষে। আর্থিক সাহায্যের কথা বাদ দিয়েও বলা চলে, এঁদের সাহচর্য বিনে জয়স্-এর সাহিত্য-চর্চাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কারন, 'উলিসিস্' শ্বেতদ্বীপে ও মার্কিনে 'Obscene' আখ্যায় প্রচার বন্ধ হয়। সর্বশেষ উপন্যাস 'ফিনেগানস্ ওয়েক্' তো সে দিনের পাঠকের কাছে—সেদিনেরই শুধু নয়, আজকের অনেক পাঠকের কাছেও-(যেমন শিবনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ 'লেখক ও পাঠক' গত ১৩৬২ র শারদীয় 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত, সেখানে উপযুক্ত উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর মতামতও জয়স্-এর পক্ষে কিছুমাত্র প্রশংসার নয়) কেবলমাত্র 'written by a lunatic for lunatics' ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই সব সমস্যার সঙ্গে তাঁর অর্থসংকটও বর্তমান ছিল। তাঁর বন্ধুরাই এ থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন প্রথমে। অবশ্যই এঁদের মধ্যে হ্যারিয়েট উইভার-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব প্রায় আবাল্যের। আসলে আধুনিক লেখকদের জয়স্ সহ্য করতে পারছিলেন না। আধুনিক চিত্রকলায়ও তাঁর নিকট প্রায়, ক্রয়েডের যেমন, তেমনি অসহ্য মনে হতো। উভয়েই চিত্রশিল্পে বর্তমান কালের পরীক্ষা নিরীক্ষা বিষয়ে সমান নির্বিকার ছিলেন। তথাচ পিকাশো প্রসঙ্গে তাঁর কিছু উল্লেখ্য উক্তি আছে। কিন্তু তা' পিকাশোর বিষয়ে প্রশংসা বা নিন্দা নয়, শুধু জয়স্ হতে পিকাশোর শিল্পচর্চার পরিস্থিতি বা আবহাওয়া কত উপযোগী ছিল তার প্রমাণেই তিনি ওর নামোচ্চারণ করেছেন। তিনি, নিজে ষ্টেফন ডেডলাস-এর ন্যায়, বায়রণকে ইংরিজি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি

বলে মানতেন। এ ছাড়া, শোনা যায়, আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র এলিয়টের 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'-এর কিছু অংশ তাঁর মুখস্ত ছিল যা তিনি মাঝে মধ্যে আবৃত্তি করেছেন। আধুনিক শিল্পের যে কোন বিভাগের মধ্যে এই একজন মাত্র কবির, এই একটি মাত্র কবিতাই তিনি ভালোবাসতেন। এমন কি এজরা পাউণ্ড সম্বন্ধেও তিনি নির্বাক। এতে তাঁকে ভুল বোঝার প্রভূত অবকাশ আছে বলে মনে হয় বস্তুতঃ এ থেকে তাঁকে ভুল বোঝাও হয়েছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি: রবার্ট ব্রীজেস তাঁকে এক কপি The Testament of Beauty উপহার দিয়েছিলেন যে কারণে, তা' জয়স্-এর ভাষায়: with an inscription expressing his full sympathy with what I am doing—এই পোয়েট লরিয়েটের এ রহস্যময় কার্যে জয়স আশ্চর্য হয়েছিলেন, The approachement between myself and the very old man is very curious ;—তথাপি যেদিন তিনি জানলেন ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাঁর রচনা সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে, সেদিনে তাঁর আনন্দের সীমা ছিলনা। বাথা অধ্যাপক জর্জ সেণ্টস্‌বেরীকে একখানি 'য়ুলিসিস' উপহার দেবার জন্য তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন এমন প্রমাণও আছে এবং তার কারণ দর্শিয়ে লিখেছেন: I am old fashioned enough to admire him though he may not return the compliment ; জয়স্-এর মনের এই জটিল অংশটি আসলে আজও কুয়াশাচ্ছন্নই রয়ে গেছে। তাই জয়স্‌কে অনেক সময়ই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাকার করে ফেলতে হয়,—যা তিনি নন বলে আমার বিশ্বাস।

জয়স্-এর মনোবিশ্লেষণ করার যুক্তিসঙ্গত অধিকার আমার নেই তথাচ, এটুকু বুঝেছি, তাঁর মনের গহনে ওলোটপালট অনেক চিন্তাই ছিল। প্যাট্রিশিয়া হকিন্স তার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু সমাধান করতে সক্ষম হয় নি। জয়স্-এর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী নোরা বারনাক্‌'র সম্বন্ধও তেমনি একটি ঘটনা। ওঁরা দুজনে একত্রে ঘর করেন সাতাশ বছর, এবং অবশেষে ১৯৩০ এ তাঁদের পরিণয়-চুক্তি হয় লণ্ডনের একটি চার্চে,—এ-কথা প্রায় অনেকের নিকট অজ্ঞাত। তাঁদের দুটি সন্তানেরই-লুসিয়া ও জীয়রগীর—জন্ম হয় ঐ সাতাশ বছরের মধ্যে। জয়স্-এর জীবিতাবস্থায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একদিনের বিচ্ছেদও হয়নি, এমন কি তাঁরা একদিনের জন্য দূরেও থাকেন নি এবং সে কারণেই শ্রীমতী নোরাকে

লিখিত কোন পত্র এ সঙ্কলন গ্রন্থে নেই। এবং কোন্ সূত্রে তাঁদের প্রেম এসম্বন্ধে জয়স্ কিছু বলেননি পর্যন্ত। কিন্তু তিনি তাঁর পুত্র কন্যা ও স্ত্রীকে এত ভালবাসতেন যে তা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। জয়স্-এর মনের এই বৈপরীত্য ওয়েলস্ সাহেব ঠিকই বুঝেছিলেন ; তিনি লিখেছেন : you really believe in chastity, purity and the personal God and that is why you are always breaking out into cries ;—জয়স্-এর এই double soul বিষয়ে একথা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তিনি কখনো নিজের এই বিপরীত চরিত্র পরিচয় তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদেরও জানান নি। তাঁদের সঙ্গে জয়স্-এর ঠিক আন্তরিকতা ছিল না বললেও অন্যায় হবে না ; বন্ধুত্ব ভদ্রতার পর্যায় থেকে আরও গভীরে নামে নি, যেখানে পৌঁছোলে লেখক মানুষ হয়ে ওঠেন, নিজের অন্তর সমস্যা বন্ধুকে জানান। ষ্টেফন ব্লুম বলেন : Even to his closest friends Joyce seldom laid bare his soul ; অথচ এই জয়স্-ই যখন পুত্র কন্যাকে পত্র লেখেন, তখন তিনি—'ফিনেগান্স্ ওয়েক ও য়ুলিসিস্'এর লেখক নন, তাদের স্নেহশীল পিতা। তাই পুত্র গীয়রগীর সঙ্গে তিনি সহজেই হাল্কা ভাষায় সংগীত বিষয়ে পত্রালাপ করেন। কন্যা লুসিয়ার প্রসঙ্গে তিনি এত যত্নশীল, অনুভূতিপ্রবণ যে আশ্চর্য হতে হয়! লিওনেল ট্রিলিং সাহেবের উক্তি হতেই বোঝা যাবে কন্যা সম্পর্কে পিতার মনোভাব। এদের বাদ দিলেও তাঁর মাসী মিসেস মুরীর প্রতিও তিনি বিশেষ হৃদয়বান ছিলেন। 'উলিসিস্' প্রসঙ্গে এমন অনেক কথা তিনি মুরীকে লিখেছেন যা' অত্যন্ত কৌতূহলদীপক। ওই উপন্যাস পাঠারম্ভের আগে পূর্বকর্তব্য হচ্ছে 'ওডেসী' পাঠ ; অন্তত ল্যাম্ব-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনীটির পাঠ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এ নির্দেশ তিনি নিজেই মুরীকে দিয়েছেন নানা পত্রে। এবং ডাবলিনাসদের বই ধার নিয়ে ফেরৎ না দেওয়ার অভ্যাস বিষয়ে তাঁর ভারী মজার চিঠিও আছে। বস্তুতঃ, এসব পত্রে তিনি যেন একজন অতি সাধারণ মানুষ হয়ে গেছেন। এমন কি তাঁর সেই সব পত্র, যা' তিনি আয়ারল্যাণ্ডে তাঁর আত্মীয়দের লিখেছেন, সেখানেও তাঁর মনের এইদিকের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। জীবনের অধিকাংশ দিন তাঁর স্বদেশের বাইরে কেটেছে—যাতে তাঁর সে দেশ সম্বন্ধে উৎসুক্য এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তিনি স্বদেশের এমন সব খবর জানতে পেতেন যা' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই সব পত্রেই জয়স্‌কে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়,

অনুভব করা যায়, তাঁর মনের একটি অপরিচিত দিক যখন তিনি most human, the most conventional ; এবং It was not easy for him to form associations in the world, but the strangest of his family associations was enormous and touchingly open ; আরও সহজ করে, আরও অনুচ্চারিতরূপে জয়সকে ধরা যায়, পিতৃবিয়োগের পর তাঁর গভীর বেদনাপূর্ণ চিঠিগুলোতে, যা' তিনি টি, এস, এলিঅটকে, মিস য়ুভারকে লিখেছেন। এলিঅটকে লিখিত পত্রে : 'very broken down,' 'had an intense love for me,' অথবা একটি পুরো লাইন 'I feel that a poor heart wich was true and faithful to me is no more' ইত্যাদি শব্দার্থ বোধক ছত্রের অভাব নেই। মিস য়ুভারকে লিখিত পত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তিনি স্পষ্টই বলেন : I was very fond of him always, being a sinner myself, and even liked his faults Hundreds of pages and scores of characters in my books come from him. প্রকৃতপক্ষে পিতার প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা তো মনীষী টলষ্টয়ে এবং প্রাতঃস্মরণীয় রবীন্দ্রনাথেও দেখা গেছে। কিন্তু জয়স্-এর উপযুক্ত উক্তি সমূহের ভিন্নার্থ আছে ; তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করতেন 'a Joyce crying in the wilderness.' এর অর্থ উইণ্ডহাম ল্যুইস-এর সেই পূর্বোক্ত অভিযোগেও পাওয়া যাবে না, পক্ষান্তরে আমাদের মনে রাখতে হবে, ল্যুইস-এরই আবিষ্কার জয়স্, লরেন্স—এঁদের শিষ্টাচার বিরোধীতা, বলা যাক, আধুনিকতার প্রতি অশ্রদ্ধা সমান প্রবল ছিল। এঁদের কাছে শিল্পচর্চা অবসর বিনোদনের উপায় নয়, আত্মোন্নতির পথ। প্রসঙ্গান্তর হবে বলে বিশেষ বিশ্লেষণে না গিয়ে সংক্ষেপে বলছি, জয়স্ লরেন্স-এর সঙ্গে কাফ্‌কা কাম্যুর প্রভেদ দুস্তর। পরবর্তী দুজনের যতখানি যুক্তিনির্ভরতা, পূর্ববর্তী দুজনের তত নয়। এবং আমাদের এ কথা জানা যে, যুক্তিনিষ্ঠাই আধুনিকতার প্রধানতম লক্ষণ। জয়স্ একারণেই আধুনিক আর্ট বুঝতেন না, অথবা বুঝতে চাইতেন না, অথবা উদাসীন থাকতেন। একারণেই তাঁর ফ্রয়েডের প্রতি অশ্রদ্ধা যদিও ছিল না, তবু তাঁকে বা তাঁর পদ্ধতি তিনি মানতেন না। চিন্তাকে কেটে টুকরো করার চেয়ে চিন্তার সম্পূর্ণ রূপই এঁদের কাছে অর্থবহ। লরেন্স-এর শেষ বয়সের অমার্জিত উপন্যাসও—'দি ভার্জিন এণ্ড দি জিপ্‌সী' ও 'দি ম্যান,

হু ডাইড'—পাঠান্তে মনে হবে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রূপক উপন্যাস—যে কোন একজন আধুনিক লেখকের পক্ষে যা' অসম্ভব। সার্ত্র'র তা' পারেন না, কাম্যু তা' পারেন না, কাফ্‌কা তা' পারেন নি। তেমনি জয়স্ আর্টে সেক্সের সমস্যা বুঝতেন না, আর্টে সময়ের সমস্যা বুঝতেন। আধুনিক আর্টের প্রতিনিধি, গত অর্ধশতাব্দীর আর্ট আন্দোলনের পুরোধা পিকাশোর সঙ্গে জয়স্-এর প্রভেদ এখন স্পষ্ট হয়ে গেল হৃদয়ঙ্গম করা গেল, তাঁর উপরিউক্ত উক্তির সার্থকতা। এবং কেন তিনি মরমীশিল্পের প্রতি আধুনিক শিল্পের চেয়েও অধিক অনুরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। কেন তিনি বায়রণকে ইংরিজি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন। জয়স্-এর জটিল মনের এই সব বিভিন্নতার পরিচয় বস্তুত ওর পত্রাবলী সংকলন পাঠেই লাভ করা সম্ভব।

এ পৃথিবীটা শিল্পীর বাসের উপযুক্ত কিনা, এ প্রশ্ন প্রাচীন কালের কবিকুল হতে আজকের তরুণ চিন্তাশীলদেরও ভাবায়। জয়স্-কে স্বাভাবিক নিয়মেই ভাবিয়েছে। কিন্তু তাঁর দুর্মর আশা পৃথিবী থেকে তাঁকে বিতাড়িত করে নি, তাকে গ্রহণ করিয়েছে। এখানে আলব্যর কাম্যু তাঁর শিষ্য, তিনিও জগতের সমস্ত সমস্যার বিরুদ্ধে লড়তে চান এবং সংগ্রামই শিল্পীর জীবন, এ সত্যে বিশ্বাস করেন। জয়স্-কে আমরা তাই শ্রদ্ধা করি এবং তিনি নির্বিবাদে মহাশিল্পীদের পাশের আসনে বসেন।

জয়স্-এর পত্রাবলী সংকলনের প্রথম পত্রে তিনি ইবসেনকে যে নতুন দিন আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন, গ্রন্থের শেষ পর্ব—ৎসুরিখের মেয়রকে লিখিত পত্রে—তিনি উক্ত আলোকিত দিনাবসানের বেদনাপূর্ণ ইংগিত দিয়েছেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে, জয়স্-এর মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্বে, এ পত্র রচিত হয়েছে। এই তাঁর শেষ রচনা।

কমলেশ চক্রবর্তী

উষা সে কোথায় যায়

ইউ, এন, নোগুচী

উষা সে কোথায় যায় দেখিবারে গেনু পিছে পিছে,
দিনের দীপ্তির মাঝে দিল সে মিশায়ে আপনার।
গোধূলির সাথ ধরি গেলাম তাহারে অনুসরি
নিশীথ-তিমির-ঘন অকস্মাৎ গ্রাসিল তাহারে।

কাল রাতে মোর চোখে এলো জল আনন্দ উল্লাসে,
আজ রাতে শোকাবেগে দুনয়ন ঝর ঝর ঝরে।
হে আলোক, অন্ধকার—হে আনন্দ, হে বিষাদ,
চলিতেছ তোমরা কি যুগ যুগ একই পথ ধরে?

কবিতা মেলা-র সৌজন্যে অনুবাদ : মনীশ ঘটক

ভবঘুরে

জ্যাঁ আর্থুর র‍্যাঁবো

বেচারা ভাইটি আমার! বর্বর সাবধানতার জন্যে কি গভীর ভাবেই না আমি ঋনী তার কাছে। "আমি এ-বলিষ্ঠতা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরিনি। তার চিলেমীর সুযোগ নিয়েছি পুরোপুরি। আমরা যদি ফিরে যেতুম নির্বাসন অথবা দাসত্বে, তাহলে আমারই দোষ হতো।" আশ্চর্য নির্দোষ ভাব আমার কাছে সে প্রকাশ করেছে, তার সাথে যোগ করেছে বিশুদ্ধ যুক্তি। এ-পিশাচ ডাক্তারের উত্তর আমি ভদ্রভাবেই দিয়েছিলুম এবং শেষ পর্যন্ত জানালা

পথে পালিয়ে বেঁচেছি। এ-শহর এ-শহর, থেকে অনেক দূরে (সুরমাধুর্যে বিচলিত হয়ে) অনাগত রাতের জৌলুষের অপচ্ছায়া সৃষ্টি করেছি।

এ-চিত্তবিক্ষেপের পর স্বাস্থ্যবিধি মত শুয়ে পড়েছিলুম খড়ের মাদুরের 'পরে। আর প্রায় প্রতিটি রাতে, সে ঘুমুলে পর আমার অভাগা ভাই ঘুম থেকে জেগে উঠতো, মুখে তার কুষ্ঠের দগ্‌দগে দাগ, ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে চোখ দুটো যেন—হয়তো স্বপ্নে সে নিজেকে দেখেছে এমনি ভাবে!—আর নিজের নির্বোধ দুঃস্বপ্নকে সচিৎকারে তাড়িয়ে দিয়ে আমায় নিয়েছে ঘরে।

আন্তরিকতার সাথে আমি শপথ করেছিলুম তাকে ফিরিয়ে নিতে তার আদিম "সূর্যের পুত্র" অবস্থায়, তাই আমরা ঘুরেছিলুম (মদ আর শুকনো বিস্কিট খেয়ে), প্রয়োজনীয় স্থান আর সূত্রের খোঁজে দ্রুত ঘুরেছি আমি।*

Les Illuminations থেকে। অনুবাদ : ফখরুজ্জামান চৌধুরী

জ্যোৎস্নার রূপালিতে

মারুফ আর্ রাসাফী

১ : ৩ সমুদ্র তরঙ্গহীন, কোথাও আকাশে
এক বিন্দু মেঘ নেই। চাঁদের জ্যোৎস্না গলে গলে
চার পাশে আলোর কুয়াসা হয়ে আছে।
পূর্নিমার শুভ্র চাঁদ জলে,
সমুদ্রের জলে কাঁপে ছায়া।
মনে হয় রূপবতী কোনও ষোড়শী নারী-মুখ
সমুদ্র দর্পনে চমকায়।

কী হাসি, কী হাসি।

---

* বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৫ উত্তরসূরীতে আঁদ্রে জিদ্ এর একটি বক্তৃতার (সাহিত্য প্রভাব) অনুবাদ করেছিলেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী। ভ্রমবশতঃ অনুবাদকের নাম ছাপা হয়নি। সম্পাদক : উত্তরসূরী

জ্যোৎস্নার রূপালিতে

সমস্ত সাগর বেলাভূমি
এখন নীরব কোনো ধবধবে তাঁবুর মতন ;
রাতটা দাঁড়িয়ে আছে ছায়া-ঘেরা দিগন্তের পাশে।

১ : ৪ অথবা সে চাঁদ
মনে হয় ঘুমহীন সম্রাটের শিরে
কী উজ্জ্বল সোনার মুকুট।

১ : ৬ অথবা আকাশ যেনো আলোর সমুদ্র,—
অসংখ্য তারার মুক্তো অতলে তলিয়ে আছে তার
কিছুটা বরফ খণ্ড—ভাসমান জলের উপরে।

আকাশ

সমুদ্র

মাঝখানে তার
চাঁদের রুপোলী রেখা অপরূপ সেতু।
কী আলো কী আলো!

সমুদ্র তরঙ্গহীন ; কোথাও আকাশে
এক বিন্দু মেঘ নেই। আঁধার তাড়িয়ে
আলোর মিছিল কী যে খুশী,—

ঝির ঝিরে হাওয়া,
ঝির ঝিরে হাওয়া।

মূল আরবী থেকে অনুবাদ : আবদুল মান্নান

বক্তব্য—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।

ঠাট্টা করে বলা যায় যে ধূর্জটিপ্রসাদ সর্বদা পাঠককে তাঁর ছাত্র ঠাওরান ও নিজে উঁচু আসন থেকে অপূর্ব সমাচার ঘোষণা করেন। এই ঠাট্টা হয়তো অনেকাংশে সত্য ; কারণ তিনি সত্যিই তাঁর মতামত ব্যক্ত করার আগে বা পরে বক্তব্য বিশ্লেষণ করেন না, যুক্তি দেন না। অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব ও চিন্তার কোন্ কোন্ পথ বেয়ে কেমন করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হন তার দিশা থেকে পাঠক সর্বদা বঞ্চিত থাকে। উদাহরণ হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থে "রবীন্দ্রনাথের চিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধটি নেওয়া যাক্—এ প্রবন্ধে তিনি বিস্তর মন্তব্য কেটেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিত্রী রবীন্দ্রনাথের বা রবীন্দ্রনাথের চিত্র দুটোর একটি বুঝতেও লেখাটি পাঠককে সাহায্য করে না। এমন সন্দেহও হয় যে লেখক তাঁর নিজের কতকগুলি ধারণা ও বিশ্বাসকে পাঠকের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন।

এই জন্যে ধূর্জটিপ্রসাদ যখনই কোনও গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যেমন "অতঃ কিম্", "রবীন্দ্রসমালোচনার পদ্ধতি" প্রভৃতি প্রবন্ধে করেছেন, তখনই তার তাৎপর্য পালটে যায়। আমাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন না তুলেই বলা যায় যে আমাদের আসল সমস্যা দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, পরিকল্পনার উদ্দেশ্যহীনতা কিংবা পরিকল্পনার অভাব। আমরা যখন কিছু করতে শুরু করি তখন তার পেছনে একটা ঝোঁক থাকে বটে কিন্তু আমাদের দম খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। তাই আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার 'পরে ব্যর্থতা জমে উঠেছে। যদি কেবল রবীন্দ্রনাথ নামক এক ব্যক্তিকেই ধরি তা হলেও দেখব যে সেখানে আমাদের দৃষ্টি কত সংকীর্ণ, কত খণ্ডিত। অবশ্যি ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের

দু'তিনটে প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক বিচারের চেষ্টা দেখেছেন। আমি যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথের উপর অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধের সংখ্যাও অমনই সামান্য। অথচ রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যত বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তার সংখ্যা কি সামান্য? ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, এই বিপুল অপচয়ের মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। কথাটা শুনে চমকে উঠতে হয়। কিন্তু অনস্বীকার্য। কোন্‌টা শ্রদ্ধা ও কোন্‌টা ভক্তি তা ধূর্জটিপ্রসাদ যথেষ্ট প্রাঞ্জল ভাষাতে বুঝিতে দিয়েছেন। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্র সমালোচনার যে-পরিকল্পনা পেশ করেছেন তার দ্বারা আমরা অশেষ উপকৃত হব বলেই আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর মাত্র আর তিন বছর বাকি এসময়ে এ-প্রবন্ধটি আমাদের সবারই অবশ্যপাঠ্য। যথাসম্ভব সংক্ষেপে ধূর্জটিপ্রসাদ এই ছকটি এঁকেছেন, কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিকতার আভাস।

যে কথাটা বিশেষ মেজাজে আমি ঠাট্টার অর্থে বলি, একটু বিচার করলেই দেখা যাবে যে তার মর্ম ভিন্ন। ধূর্জটিপ্রসাদের একটা গুরুজনসুলভ বাচনভঙ্গি আছে বটে, কিন্তু সেটা তাঁর বেলায় অতি সার্থকভাবে মানিয়ে গেছে। তিনি যে-যুগের বা যে-দলের মানুষ এই মানিয়ে যাওয়াটা সেই যুগ বা দলের জন্যে সম্ভব হয়েছে, বা নিছক তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যে সম্ভব হয়েছে সেকথা বলতে আমি অক্ষম; বোধ হয় দুটো কারণই সত্য। "বক্তব্য" পড়তে পড়তে তাই ধূর্জটিপ্রসাদকে অনেক দূরের মানুষ মনে হলো। কারণ তাঁর কৌতূহল, অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা ও কল্পনা এত প্রবল, ব্যাপক, গভীর ও দূরপ্রসারী যে সেসব নিয়ে আমাদের যুগের মানুষদের সঙ্গে তাঁর কোনও তুলনার চেষ্টাই অনর্থক। তাই তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ, তাঁর মতামত—এমন কি অত্যন্ত অতর্কিত মন্তব্যও—সমস্তই এক অনন্য চিত্তের পরিচায়ক। সে-চিত্ত উন্নত ও উদার, সংস্কৃত ও বিদগ্ধ। সুতরাং আমাদের কাছে গুরুজনের আসন তাঁর প্রাপ্য।

যে-সব স্থলে ধূর্জটিপ্রসাদের সংগে পাঠকের মতৈক্য ঘটে সেখানে পাঠক সেই মতটিকে বিশ্লেষণপূর্বক বিশদ করে তুলতে পারেন; ধূর্জটিপ্রসাদ কেবল সূত্র এগিয়ে দিয়েছেন, সেটাকে সুদে আসলে খাটিয়ে নেওয়াটা আমাদের কাজ। কিন্তু তর্কেও ধূর্জটিপ্রসাদের আন্তরিক রুচি। এ-গ্রন্থের প্রায় প্রতি

প্রবন্ধেই তর্কের প্রচুর অবকাশ বর্তমান তাই আগ্রহ মন তাঁর, রচনার সংস্পর্শে সহজেই সঞ্জীবিত হবে। তিনি কতকগুলি নিজস্ব ধারণা ও বিশ্বাসকে পাঠকের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চান, এমন সত্যকে তাই শেষ পর্যন্ত সত্যের দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায় না; কারণ তিনি বুদ্ধিমান ও মুক্ত বিচারবোধ সম্পন্ন পাঠকের কাছ থেকে সর্বদাই প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ একটা দুর্লভ sportsman spirit-এর অধিকারী। আর এটাই "বক্তব্য"-র আলোচনা করবার পক্ষে প্রধান বাধা, কারণ এখানে তর্কের জন্যে স্থানাভাব। অতএব বইটির পরিচয় দেবার জন্যে আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকাটির শরণ নেওয়া যাক: "বক্তব্যের মধ্যে তিনটি মোটা সূত্র রয়েছে। প্রথমটি ইতিহাস, এবং তারই চারপাশে আরো গুটি কয়েক লেখা দানা বেঁধেছে, দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এবং তারই সম্পর্কে···কয়েকটি প্রবন্ধ গড়ে উঠেছে। শেষ সূত্রটি হল 'অথ কাব্য জিজ্ঞাসা' এবং তারই সংক্রান্ত আরো কয়েকটি প্রবন্ধ।"

বইটির ছাপা ও বাঁধাই সুরুচি ও উচ্চমানের পরিচায়ক।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

জনরব : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়।

বাংলাসাহিত্যে জীবনের বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধ রূপায়ণ হয়েছে কাব্যে, উপন্যাসে ছোটগল্পে, কিন্তু নাটকে জীবনের কোন সার্থক ও রসোত্তীর্ণ প্রতিফলন রয়েছে বলে মনে করি না। বাংলা সাহিত্যের এই দৈন্য সম্বন্ধে অধুনা কিছু সচেতনতা এসেছে।

জনরব—নামেই নাটকখানির পরিচয়। দুটি অবচেতন মনে যা গোপনে ছিল তাই কেমন করে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে' এক দাম্পত্যজীবন বিষাক্ত করে তুললো—এই নাট্যবস্তু।

প্রথম দৃশ্যে এই নাট্যবস্তুর অবতারণায় নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় আছে। এই অবতারণা প্রসংগে যে নাটকীয় উন্মুখতা সৃষ্ট হ'য়েছে তা দৃশ্য পরম্পরায় ঘনীভূত হ'য়ে হ'য়ে অবশেষে এক চরম পারিবারিক সর্বনাশের উপর যবনিকাপাত করলো। নাট্যরসের এই ঘনীভূত হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আছে নাটকের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

মধ্যবয়সী বিমলাপ্রসাদের সুন্দরী, তরুণী ভার্যা রেবা। অরূপ বিমলা-প্রসাদের আদরের আশ্রিতজন। এককালে অরূপের পিতার নিকট অবিস্মরণীয় কৃতজ্ঞতার কারণ ঘটেছিল বিমলাপ্রসাদের। আটিষ্ট অরূপের সঙ্গে খুব স্বাভাবিক কারণে রেবার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা জন্মায়। কিন্তু সংসারের অমোঘ নিয়মে ওদের সম্পর্কের এই স্বচ্ছ জল ঘোলা হ'ল। অরূপ, রেবা, আপনভোলা মানুষ দেবতুল্য বিমলাপ্রসাদ সবাই এই নোংরা ঘোলা জলের পঙ্কে ক্লেদাক্ত হ'য়ে উঠলো। যা ছিল সুন্দর তা হলো কুৎসিৎ।

বিমলাপ্রসাদের প্রসন্ন প্রৌঢ়ত্ব যেন বেলাশেষের নরম রৌদ্র উজ্জ্বলতা এখনো আছে কিন্তু দাহ নাই। যৌবন বিগত; ভার্যার তরুণ উষ্ণ আবেগোজ্জ্বলতার ভাগীদার নন—এমন একটা অস্ফুট করুণ সচেতনতা আছে। অরূপ তার অশেষ স্নেহভাজন, তার প্রতি অগ্রজপ্রতিম স্নেহ ও বিশ্বাস আছে। জনরবের তীক্ষ্ণ বিষমুখো শর এই পরম স্নেহ ও বিশ্বাসের স্বর্গলোকে বিঁধলো।

অরূপ ও রেবা চরিত্রে অবচেতনে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ আছে তা কয়েকটি রসতীব্র ঘটনার মাধ্যমে অপূর্ব নাট্যকুশলতায় শেষ দৃশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাস নাটকে আছে। বিমলাপ্রসাদ, রেবা ও চরিত্রচিত্রণে গতিশীল বিকাশ ক্ষমতা ও মনঃ অনুসন্ধানী শিল্পচেতনার পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার; সমস্ত নাটকটি পড়ে মনে হয় যে নাটকখানি বেশ একমুখী ও মন্থনগতি। কোন অকারণ জটিলতা নাটকখানির গতিকে ব্যহত করে নি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। সংলাপ আরও ভাবঘন ও মার্জিত হতে পারতো। তাতে নাটকখানির কৌলীন্য আরও বাড়তো। নাটকখানির বিদেশী ছায়া নাট্যকার সার্থকভাবে অপসারিত করেছেন; মনেই হয়না যে সাগরপারের কোন প্রভাব আছে নাটকখানির কোথাও।

মৃণাল গুপ্ত

বাংলা নাটক—দেবকুমার বসু। রত্নসাগর গ্রন্থমালা ॥ ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

আজকাল সচরাচর আলোচনাগুলোতে যুগের সঙ্গতির দিকে অনুসন্ধানে নিশ্চেষ্টতা দেখা যায়। ফলে, সাধারণ আলোচক ছাড়াও গবেষক মহলেও যুগাসঙ্গতির ফাটল ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এর মূলে আছে তথ্যসহিষ্ণুতা বা

পল্লবগ্রাহিতা। প্রকৃতপক্ষে এ সব আলোচনায় একদিকে যেমন ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যধর্ম আলোচনায় বিভিন্ন প্রভাবের অসঙ্গত ক্ষেপন চলছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন এক অধ্যাপক মন্তব্য করেছেন, মাইকেলের প্রহসনের ওপর দীনবন্ধুর প্রহসনের প্রভাব আছে। বিভিন্ন রচনাগুলোর প্রকাশের তারিখ সম্বন্ধে ধারণার অভাবেই এরকম প্রমাদ ঘটে। দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'বাংলা নাটক' বইটির উদ্দেশ্য সেই ধরণের প্রমাদ ঘটতে না দেওয়া —অন্ততঃ তাই বলেই মনে হয়।

রবীন্দ্রধর্মী প্রবন্ধগুলোর ক্রমপ্রভাবে প্রবন্ধে তথ্যচেতনা অন্তর্হিত হবার সামিল হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের জন্মতারিখ ২৫শে ফাল্গুন কি ২৬ শে ফাল্গুন, তা তার কবিধর্মের আলোচনায় খুব দরকার পড়ে না। কবিধর্মের আলোচনাও খৃষ্টাব্দমুখী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের কবিধর্মে বাঙ্গালীত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে হয়তো তাঁরা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারীর আবেদন পত্রে কবির বাংলা স্বাক্ষরটিকে নিয়েই মত্ত থাকবেন। অপর দিকে, উনিশ শতকের মাঝারি সময় নিয়ে যে কোনো আলোচনাতেই প্রবন্ধকারের অন্ততঃ একটা সামান্য ধারণার দরকার হবে—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পরে উমেশ মিত্রের নাটকটি লেখা হয়েছে কি না; কিংবা নাটুকে রামনারায়ণের কোন বইএর পরে দীনবন্ধুর কোন্ বই—ইত্যাদি। দেববাবুর বইটি এইদিক থেকে যে কোনও আলোচনা বা গবেষণাকে সাহায্য করবে।

বইটির প্রথমে প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপকবৃন্দের আলোচনা আছে। আমার মনে হয় কাটতির ওপর লক্ষ্য না রেখে তালিকাটিকে পুষ্ট করলেই আদর্শের দিক থেকে নিষ্কলঙ্ক হতো। যেমন ধরা যাক, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ—তারাচরণ শিকদার—ভদ্রার্জ্জুন—বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য অমুক গ্রন্থের প্রকাশিত হয়েছে কিনা, অথবা মূল বইএর কপি কোথায় বর্তমানে লভ্য—ইত্যাদি ইঙ্গিত। এটা পরিশ্রম-সাপেক্ষ। কিন্তু এতে দেশের সাধারণ লোককেও গবেষক করে তুলতে উৎসাহ দেবে এবং তাতে বাংলা গবেষণায় উন্নতিই হবে।

অধ্যাপকবৃন্দের আলোচনাগুলো পরিশিষ্টের মধ্যে ফেললেই ভালো হতো—অন্ততঃ যাতে সাধারণে ভাবতে পায় যেন তালিকাটিই লক্ষ্য, প্রবন্ধগুলো উপলক্ষ্য। আলোচনাগুলো নিয়ে বিশদ মন্তব্যের স্থানাভাব।

বইটিতে খৃষ্টাব্দ সংক্রান্ত কিছু গোলযোগ লক্ষ্য করেছি। ডাঃ সুকুমার

সেনের অনুগতি গ্রহণ করলেও তাঁর মতামত সম্পর্কে যথেষ্ট বিবেচনার অবকাশ আছে। নাট্যাভাসযুক্ত পুস্তিকাগুলোর চয়ন বর্জনে নাট্যগুণের দিকটি নজর দেওয়া হয়নি। তাই পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত কয়েকটা উন্নততর ধরণের নাটক-রচনা বাদ পড়ে গেছে, আবার কলকাতায় প্রকাশিত তার চেয়েও বাজে রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য চয়নবর্জনে ত্রুটি মুক্ত থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। মুদ্রিত কপির প্রথম সংস্করণের প্রকাশ তারিখের অভাব কিংবা বাংলা সন মিলিয়ে হিসাব রাখার চেষ্টা যে ত্রুটির সৃষ্টি করেছে, সেটার জন্য সম্পাদককে সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না।

জয়ন্তকুমার গোস্বামী

•

ধূলিমুঠি সোনা। ফণিভূষণ আচার্য। কৃত্তিবাস প্রকাশনী॥ আষাঢ়ে শ্রাবণে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বুক রিভ্যু॥ মনঝাউ। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স॥ ফুলপিঁড়ি। শচীন দত্ত। কবিতা প্রকাশ সংস্থা॥ আজ চোখ মেলে। সুকুমার রায়। শতভিষা প্রকাশনী॥ সমুদ্র-শর্বরী। রঞ্জিত সিংহ। পূর্বমেঘ॥ তিমির কান্না। শঙ্করলাল রায়। জলার্ক॥

যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগে হালফিলের বাঙলা কবিতা আক্রান্ত, তা অধিকাংশই স্বল্পপাঠজনিত। কিংবা দুর্বল নির্বাচনের কারণে। বহু আলোচিত তিরিশ-এর যুগ, যে-যুগ সম্পূর্ণতার 'কল্লোলে' উত্তরণ পেতে চেয়েছিলো, সংহতি-কালিকলম এবং এমন কি পূর্বের সবুজপত্রেও যার কঠিনতা আকার ধরেনি—ধরতে পারেনি। তিরিশ-এর অন্তর্ভুক্ত কবিদের সততায় কোনো ফাটল ছিলো না। ছিলো চিন্তা সম্পৃক্তির ঈষৎ অভাব। ফলত তাঁদের একটা বৃহৎ অংশ আজ বিপর্যস্ত। সাহিত্যের বহুবর্ণ প্রয়োজনে অসহায় সমর্পিত। সত্যকথনে দোষ না থাকলে, প্রায়বিক্রীত। সেদিনকার কবিতাসাহিত্যের অলঙ্কার স্বভাবতই এখন আত্মধ্বংসী।

সাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটির রূপায়ণ সর্বতোভাবে একক উদ্ভূত প্রকাশে শুধু নির্ভরশীল। সমষ্টির বোধে 'এক' নয়: এক-এর নিমগ্ন অধ্যয়নে মানবিক ভালবাসা সকলের জন্যে। তিরিশ-এর সমষ্টিবোধ তাই বিপুল বালি দুর্গ গঠন

•

করতে ভেবেছিলো যাবতীয় হুঙ্কার মার এড়াবে। কিন্তু যুগান্তে পৌঁছবার আগেই অভিজ্ঞতার নতুনতর তত্ত্বগুলো সহজেই বানচাল করেছে সেই কাঠামো, সেই উচ্চারিত উচ্ছ্বাসের স্বপ্নগুলোকে। তিরিশ-এর যুগ তবু আমার কাছে আন্তরিক শ্রদ্ধার। সেই ঐতিহাসিক সূর্যাস্তে আমি অভিভূত।

তিরিশ-এর যুগ ছাড়িয়ে দু যুগ পেরিয়েছি। তৃতীয় যুগও আসন্ন সমাপ্তির চৌকাঠে যখন চতুর্দিকে যান্ত্রিকতার টানা-পোড়েন আরো ঢের যন্ত্রণার, সহজতার সব দরজাগুলোই যখন রহস্যময় জটিলতার কারুকাজে দূর, অনাত্মীয়। বড়ো রাস্তায় বৈজ্ঞানিকতার তীক্ষ্ণ সীমানির্দেশ। উচ্ছল আবহাওয়ার দুরন্ত দৌড়নো, মেঘরৌদ্রের সরল কুটুম্বিতা স্তব্ধ, সন্ত্রস্ত শিশু মাত্র। সামনেই যখন এক থমথমে-মন্থর নির্বাণ দেওয়াল তুলছে, তখন দৃষ্টির ফোঁটায় কোনো শিহর থাকে না। যদিচ আধুনিক কবিরা তাতেও তাঁদের কিঞ্চিৎমাত্র কার্পণ্য দেখান নি। কিংবা তিক্ততা। এবং আমরা জানি এমন ভয়ঙ্কুরে তীর্থ-সন্ধানে, আমাদের বিরাট দুঃখের সংসারে, এই কবিরাও অন্তর্ভুক্ত আছেন। মানসকূটের নিপুণ কাঁটাগুলোকে মাথার মুকুট করে তাঁরা অন্যমনস্ক,—একটি আশ্চর্য নিলীমার তলায় তলায় আমাদের সঞ্চারিত করতে চান। প্রেম, ব্যর্থতা, মৃত্যু ও উজ্জ্বলতার জ্যোতির্ময় সংঘর্ষের উত্তাপে আমাদের অগ্নিশুদ্ধ করে দেবার সযত্ন ইচ্ছা রাখেন।.....সুতরাং আধুনিক কবিতায় একক ব্যক্তির প্রকাশ তাঁদের আনুসঙ্গিক গভীর ব্যক্তিনিষ্ঠার ছাপ রাখবেই। এবং কদাচিৎ সেসব রচনা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হতেও পারে। যত্নশীল সাবধানী পাঠক তাঁর বিবেচিত পঠনধৈর্যে এই আড়ালের স্বল্পতা অতি সহজেই অতিক্রম করবেন।

ফণিভূষণ আচার্যের কবিতা সংকলন 'ধূলিমুঠি সোনা' তেমন কোনো জটিল পোষাকে বিশ্বাসী নয় মনে হলো। 'ধূলিমুঠি সোনা'-র সর্বত্রই একটি বিক্ষত, বেদনারিক্ত মন ছড়ানো যার দাবীগুলি সরল ; অধিক ভাবনার দায়ে দেউলিয়া হয়ে যায় নি। এবং সেই সঙ্গে নিসর্গের পায়ে পায়ে হাঁটা শীতল অভিমানও আছে, যা মাত্র সমর্পিত বঞ্চনাতেই নিমগ্ন থাকে।

পৃথিবীর পু থিঘরে ছক কাটা মেঘের পাতায়
রক্তের স্বাক্ষর রেখে স্বর্গ ভোবে প্রত্যহের পাটে
অজস্র ছোটোখাটো বঞ্চনা ও ফাঁকির খাতায়

অংক বাড়ে, কান্না জমে এ ধুসর মনের মলাটে। (আহত গোধূলি)

কিংবা, কান্নায় আনো গান এ অগ্নি নীড়ে

তবে তাই হোক ক্ষমাতেই আলো দাহ। (তবে তাই হোক)

ফণিভূষণের কবিতাগুলিতে দক্ষ হাতের সাক্ষাৎ পাই। ছন্দের কারুকলায় আঙ্গিকে অনবদ্য আখ্যায়িত হতে পারে 'ধূলিমুঠি সোনা'। তবে যে কারণে শিল্পীও মনসৌকর্য ধূলি মুঠির মধ্যেও স্বর্ণ উদ্ভাস দেখে, তার যথাযথ যুক্তির অভাব লক্ষিত হবে এই সংকলনেরই কিছু কিছু কবিতায়, যেমন—

পারবো না সাড়া দিতে। অনাবৃত আকাশে উপমা

আঁচলে কুড়িয়ে কোনো অশরীরী তিমিরে সেদিন

ছায়াবৃত্তে স্বর্গ-প্রিয়া তার দিল আকাশিনী ফনা

আমার শোণিতে শোধ করেছি সে ঈশ্বরের ঋণ। (অলৌকিক)

এমন অভিজ্ঞান পলায়নের। অথবা পূর্বোক্ত নিরুপায় সমর্থনেরই। অকারণ আশাবাদের তিরিশ-যীয় উচ্ছ্বাস যে-কারণে পুনর্বার রচিত হবে না, সেই সমান্তরাল যুক্তিতেই অনাস্থা রাখি এই দুর্বল অন্ধকার যাত্রায়। আনন্দের কথা, ফণিভূষণ আমাদের সর্বত্র নিরাশ করেন নি। তাঁর স্বাভাবিক অভিমান সত্ত্বেও আমরা কয়েকটি মনোরম হৃদয়ী কবিতা পেয়েছি, যেগুলি আধুনিক কবিতায় উল্লেখ্য সংযোজন। বইটির ছাপা-বাঁধাইয়ের জন্যে কৃত্তিবাস প্রকাশনীকে ধন্যবাদ।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সম্প্রতিকালের কিছু রচনা আমার ভালো-লাগাকে তীক্ষ্ণ করেছে। তাঁর 'আষাঢ়ে শ্রাবণে'তেও তেমন স্তবক ও পংক্তি আদৌ দুর্লভ নয়, যেগুলি অন্ততঃ কিছু না কিছু অনুরণন রাখে পাঠান্তে। স্বপক্ষে উদ্ধৃতাংশ :

তবু ভোরের শিল্পে দুঃখ আছে জানতো কে আগে—

এখন আনন্দ শুধু অনির্বাণ দুঃখ হ'য়ে জাগে,

শিয়রের কাছে গাছ সান্ত্বনার স্বরে ছুঁয়ে যায়—

ভোরের যন্ত্রণা নাকি ফুল হয় বিস্মিত ব্যথায়। (ভোর)

কিন্তু 'আষাঢ়ে শ্রাবণে' যেহেতু পূর্বের রচনা সুতরাং তাঁর বর্তমানের চিন্তিত অন্বয়, ততোটা সঠিক প্রকট হয়ে ওঠে নি। 'আষাঢ়ে শ্রাবণে' ক্লান্ত দুঃখিত সেই শিল্পীর অবানবন্দী থাকে প্রকাশ্যে হাঁটা রাস্তা, একটি মাত্র ছবিই এসে দেয়।

পথে বেরোতেই ভোরের শংখ হাতে তার ছবি,

মৃত সুর মুছে অন্ধকারের সেই চেনা মুখ (তিন জন)

অথচ আশ্চর্য, কবি তাঁর একমাত্র চেনা মুখকে যে ক্লান্তির মধ্যে দেখেন, সেখানে যথাযথ পরিচয়ের প্রতিধ্বনি তোলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব মনে হলো।

'আষাঢ়ে শ্রাবণে' কেবল ব্যর্থতার অভিযোগ

যদি কোনো চেনা ব্রততীর বুকে চিরায়ু ঘুমাই
সময়ের তাপে সেই প্রিয়লতা হলুদ হলেই
আমিও দগ্ধ অরণ্যে হবে ম্রিয়মান খড়! (হরিণ)

আরেক আপত্তি এই প্রসঙ্গে। বইটির সর্বত্র ছড়ানো 'ছায়া-দীপ' 'মন্ত্র-ভিরু' 'চিকুর-সীমায়'-এর মতো যুক্ত শব্দের বাহুল্য পীড়াদায়ক। এবং 'কী-রঙ' অথবা 'কী-অনবদ্য'কে বিযুক্ত করলেও অর্থের ভারসাম্য থাকে। 'আষাঢ়ে শ্রাবণে' একটি সুশীল সম্পূর্ণ কবির আগমন জানিয়েছে, যাঁর ক্লান্তিতেও 'পদ্ম-দীঘির প্রিয় কল্লোল' চারণধর্মী উপকথনের তরঙ্গ সৃষ্টি করে, এবং 'মণিপক্ষ পাখি'র আশ্চর্য রূপক উপস্থিতি আরিত আনন্দের মেজাজ এনে দেয়

করুণ ধুলোয় মেলে আশার বিচূর্ণ কুম্ভ, আলোর প্রপাত;
তখন কোমল গালে জলের দাগের মত পথ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে কিছুদূর গেলে পরে গাছ
সেখানে এ-মণিপক্ষ পাখা বুঝি মাঝে মাঝে আসে (রূপকথার গল্প)

মোহিত চট্টোপাধ্যায়-কে অভিনন্দন জানাই দূরের মুখ, মাকে ভেবে ইত্যাদির মতো কয়েকটি নিটোল সততার কবিতা উপহার দিয়েছেন ব'লে। এবং তাঁর পরিণতির যাত্রায় আমি আগ্রহী শুভেচ্ছা রাখি। বইটির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ প্রশংসিত হবে।

এরপর দুটি বই। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনঝাউ, শচীন দত্তের কুলপিঁড়ি। মানঝাউ-এর কবি সুস্পষ্ট কবিমনের অধিকারী বটে, কিন্তু তাঁর দুর্বলতা সেইখানেই যেখানে তিনি স্ব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান 'জীবনের উত্তোরণে সন্ধ্যা ঘন হয়' প্রভৃতির মাধ্যমে। 'উত্তোরণ' কথাটি মুদ্রণপ্রমাদ নাকি কবির স্বেচ্ছাকল্প? কবিতাগুলির আঙ্গিক সাফল্য নিপুণ নয় আদৌ। ছন্দের মাত্রা বিপর্যয় এবং পুরনো ভঙ্গির ব্যবহার মাঝে-মধ্যে অস্বস্তিকর কটু থাকে। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা প্রস্তুতির পথে। তাই কবিকে বিস্মিত প্রশংসা করতে হয় যখন তিনি লেখেন

কখনো পথের গম্বুজগুলি খাড়া
আবছা আলোয় বৃদ্ধ মূর্তি হয়ে
মনকে শুদ্ধ শান্তিতে দিয়ে সাড়া
অনেক রকম হেঁয়ালির কথা ক'য়ে
ফসলের দিনে করল যে ঘর-ছাড়া। (ক্লান্তি)

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সুস্থ আস্থা রাখছি। বইটি সযত্ন প্রকাশিত। শচীন দত্তের ফুলপিঁড়ি সকল কবিতার সংকলন হতে পারেনি। প্রতিবন্ধক তাঁর অসমীচীন শব্দসন্ধান, বিষয় নির্বাচন এবং আঙ্গিক শৈথিল্য। তথাপি পূর্বসূরীদের আচ্ছন্ন প্রভাব কাটিয়ে উঠে তিনি দু' একটি সুন্দর স্তবক লিখতে পেরেছেন

সে যেন সুমিত ক্ষমা মূর্তিময়ী, রিক্ত যন্ত্রণার
জাগর প্রদীপ তার প্রতীক্ষার চরে : আহা আলে
একুশ চৈত্রের চিত্র বিবর্ণ ধূসর কল্পনার। (সন্ধ্যা বসন্ত)

শচীন দত্ত-র আগামী কোনো সংকলনে নিশ্চয়ই দক্ষতর কবিকর্মের দেখা পাবো। ফুলপিঁড়ি-র অজস্রতা ইত্যাদি খুব সার্থক বলতে পারছি না।

শতভিষা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে 'আধুনিক কাব্য পরিচিতি'র প্রথম গ্রন্থ সুকুমার রায়-এর 'আজ চোখ মেলে' একটি সৃষ্টি, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম হবার যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি বইটিতে বিক্ষিপ্ত আছে। সুকুমার রায় পরীক্ষা করতে ভালবাসেন। যতোটা না বিষয় চেতনার, তার চেয়ে অধিক শব্দের 'ধ্বনিগত প্রতীক' ব্যবহারে, যেমন,— 'মিকালোশিমিমিশ অন্ধকার' অথবা 'কণীনিকা শ্যাম এ্যাফাইট' ইত্যাদি। এবং চিত্রকল্পের সংযমী প্রয়োগ তাঁর কবিতায় লক্ষ্যণীয়

এতোদূরে এসে ঘরে ফিরে চলি ফের
ভ্রূমধ্য-নীল, সেই নীল কেটে কেটে
ক্ষণিকের সাথী, তোমারই প্রতিশয়ের
চিহ্ন দেখেছি কেনায়িত বুদ্‌বুদে! (কূপমণ্ডুকের স্বপ্ন)

কিন্তু আশঙ্কা থাকে, কেবলমাত্র পরীক্ষার এষণায় এবং সেই দুর্বোধ্য কথনভঙ্গির অহেতুক ঝোঁকে যেন তাঁর কবিতা দিকভুল না করে।

একটিমাত্র স্বল্পায়তন কাব্যগ্রন্থেই 'আর্যতা' 'নিঃসঙ্গ' 'আজ চোখ মেলে'-র মতো কবিতা উপস্থিত করতে পারেন, তাঁকে ভবিষ্যতের অনেকগুলো দিন লক্ষ্য করবো। সম্পাদক তরুণ মিত্র-কে ধন্যবাদ, তিনিই 'আধুনিক কাব্য পরিচিতি'র উদ্‌গাতা।

রঞ্জিত সিংহের সমুদ্র-শর্বরী নতুন কোনো শিল্পায়নের প্রতিনিধি নয়। মোটামুটিভাবে লিখিত কিছু কবিতার সংকলন। 'জীবনের অশরণ পথ' জাতীয় স্থূলতা ইদানীং কানে লাগে। চেষ্টিত ছন্দকৃতি ও কিছু অনাবশ্যক শব্দ ততোধিক অস্বস্তির। তা সত্ত্বেও সমুদ্র-শর্বরীতে সার্থকতায় তীর্থমুখী একজন চরিত্রবান কবিকে পাওয়া যায়। ছাপা ও অন্যান্য দিক নিন্দনীয় নয়।

শঙ্করলাল রায়ের 'তিমির কান্না' যান্ত্রিক মিষ্টত্বের পদ্ধতিতে লেখা। ফলে ব্যর্থ। মাঝে মধ্যে কাব্যিক মেজাজ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তা বিচ্ছিন্নতার কয়েকটি পংক্তি মাত্র। 'তিমির কান্না'র কবি এখনো পরিশ্রমী হবেন, আশা করি।

ভ্যান গগ্‌ একবার একটি চিঠিতে লিখেছেন :

We see how art always comes to life again after inevitable periods of decadence and I do not think that anyone is the better for holding artists and their art in contempt.

সমান্তরাল অভিব্যক্তি অনুসরণ করে আমরাও সেই শিল্পায়নের দিকে একদৃষ্টি। ভ্যান গগ্‌ এর অপর সন্দেহ ভেঙে রোদ্দুর আনতে পারি একটি একটি উত্তরে : **We shall see a generation of artists with healthy bones.**

আধুনিক বাঙলা কবিতা দ্বন্দ্ববিভক্ত হলেও, শিকড়ে বৃদ্ধির উত্তাপ রাখে।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

আকাশ মাটি। শান্তি লাহিড়ী। আনন্দ পাবলিশার্স॥

অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি শান্তি লাহিড়ীর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে উৎসাহ জাগে—প্রকৃতি বা প্রেম এই উভয় বিষয়ই তার কবিতার

উপজীব্য হলেও মাঝে মাঝে মধ্যবিত্তের আটপৌরে জীবনের গ্লানির কথা এরই মধ্যে বিধৃত—তার কবিতার উপাদানে সুতরাং বয়সোচিত স্বধর্ম বিদ্যমান। তথাপি উজ্জ্বলচিহ্নিত কোন স্বাক্ষর তার বইটি থেকে পেলুম না—এমন কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করে গেল না যা প্রতিভার স্পর্শে প্রাণবন্ত; অবশ্য সমগ্র বইটিতে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার প্রযত্ন রয়েছে—পরিশ্রমে ও প্রয়োগ নিপুনতার সৌকর্যে হয়ত একদিন যার যথাযথ বিকাশ হবে। এরই মধ্যে 'সেকাল একাল' কবিতাটির প্রারম্ভ ভাল লেগেছে—ছড়ার কান ও মেজাজ উভয়ই কবিতাটিতে বিদ্যমান।

অরুণ ভট্টাচার্য

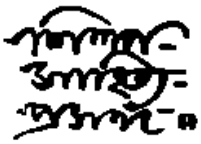

কবিতামেলা

২৮, ৩৯ ও ৩০শে জুন বিশ্বভারতী ভবনে কবিতামেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান নানা দিক দিয়েই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কাব্য জীবনের যাবতীয় লক্ষণে আক্রান্ত, জীবনের নৈকট্যেই তা ফলপ্রসূ, কবিতা জীবনেরই নিগূঢ়তম পরিশ্রুত প্রকাশ। সুতরাং রবীন্দ্রভারতী ভবনে তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের প্রচুর পরিমাণ নিবিড়চিত্ত শ্রোতা ও দর্শকের উপস্থিতি এ সত্যেরই সাক্ষ্য দেয় যে কলকাতা এবং বাংলা দেশের মানুষ এখনও জীবন্মৃত বিস্মৃত জাতিতে পরিণত হয়নি। সন্দেহ নেই, জীবনের উপরিভাগে অনেক মূল্যেরই ভাঙচুর ঘটেছে, ঘটছে, কিন্তু জীবনের গভীরে যে নতুন মূল্যের নির্মাণ চলছে তার বনিয়াদ আর যাই হোক জীবন বিরোধিতা নয়। হয়ত যাঁরা এই নতুন মূল্যায়ণে নিজেদের নিয়োগ করেছেন তাঁরা সংখ্যায় অত্যল্প কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত প্রভাব একদিন এ দেশের মানুষকে তার সুস্থ স্বাভাবিক ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করবে—এ কথাই কবিতামেলায় উপস্থিত থেকে বার বার মনে হচ্ছিল।

গত বৎসরের মত এবারও কবিতাপাঠ অনুষ্ঠান সূচির বিশেষ কার্যক্রম বলে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও উদ্যোক্তারা অমনোযোগী ছিলেন না। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তিনদিনের কর্মসূচির আংশিক উল্লেখ সমিচীন বোধে উদ্ধৃতি করছি।

শনিবার ২৮শে জুন: বেদপাঠ ও সঙ্গীতানুষ্ঠান: বাংলা কবিতাপাঠ (ক) চর্যাপদ (খ) পদাবলী (গ) মধুসূদন (ঘ) রবীন্দ্রনাথ হতে জীবনানন্দ পর্যন্ত বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতির ধারাবাহিক পর্যালোচনা ও আলোচিত কবিদের কবিতাপাঠ (ঙ) আমন্ত্রিত কবিদের স্বরচিত কবিতাপাঠ। প্রথমদিন অনুষ্ঠানে মোট আমন্ত্রিত কবির সংখ্যা ছিল দশজন।—তটিনীর গান (সঙ্গীতালেখ্য)। মেঘনাদবধ কাব্য: কাব্যনাটক (নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে)।

দ্বিতীয় দিন—উদ্বোধনী সঙ্গীত : কনলা বসু ও গীতা রক্ষিতের পরিচালনায় গীতবিতানের শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্র সঙ্গীত : অনুদিত কবিতাপাঠ : আধুনিক বাংলা কবিতা ও বহির্বিশ্ব আলোচনা : শিবনারায়ণ রায়। সমকালীন কবিদের স্বরচিত কবিতাপাঠ। এই দিনের অনুষ্ঠানে মোট আমন্ত্রিত কবির সংখ্যা ছিল তেত্রিশজন।

পূর্ববাংলার কবিতাপাঠ।

তৃতীয় দিন—উদ্বোধনী সঙ্গীত : প্রফুল্ল দাসের পরিচালনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রীঅজিত দত্ত ও বিষ্ণু দে-কে মানপত্র প্রদান : নীহাররঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত কর্তৃক বিভিন্ন কবিদের কবিতা ও স্বরচিত কবিতাপাঠ। এই দিন মোট আটজন কবি স্বরচিত কবিতাপাঠে অংশ গ্রহণ করেন।

ব্রীজ কাব্য নাটকের অভিনয়।

গতবারের মত এবারেও দুটি কাব্য-নাটকের অভিনয় হয়েছে। দেবব্রত সুর চৌধুরীর পরিচালনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের একটি সর্গের নাট্যরূপ দর্শক সাধারণকে বিশেষ তৃপ্তি দিয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। রাম বসু রচিত আধুনিক কাব্য নাটক ব্রীজের অভিনয় দেখে মনে হচ্ছিল কাব্যনাটকের সংজ্ঞা না জানা থাকার দরুণ বাংলা ভাষায় বর্তমান-কালে যে অল্প কয়টি কাব্যনাটক লেখা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই না হয়েছে নাটক না হয়েছে কাব্য। অনেকেরই ধারণা পদ্যে নাটক লেখা হলেই বোধ হয় কাব্য নাটকের আর কিছু বাকী থাকে না। সংস্কৃত নাট্যকারগণ সংলাপ রচনায় গদ্য পদ্য দুইই ব্যবহার করেছেন। পাত্র বিশেষ (কদাচিৎ পাত্রীও) গদ্য বলতে বলতে হঠাৎ কবিতায়ও কথা বলেছেন, আর সে কবিতাও সর্বত্র আর্যা আদি শিথিল ছন্দের কবিতা নয়, হ্রস্ব, দীর্ঘ নানা বিচিত্র ছন্দের কবিতা। কিন্তু কবিতায় লেখা হয়েছে বলেই কি কাব্যনাটক সৃষ্টি হল !

(ইংরেজীতে ফ্রি ভার্স বললে যা বোঝায়)

কবিতামেলা যেমন বাংলা সুধীসমাজের অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও সমর্থন পেয়েছে তেমনি বিরূপ সমালোচনাও যে দু-একটি না হয়েছে তা নয়। একজন আপত্তি করেছেন কবিতামেলার শব্দের উৎপত্তির উৎস এ দেশে নয়, বিদেশে।

উত্তরসূরী

কবিতা এবং মেলা এই দুই খাঁটি দেশী শব্দের সমাসবদ্ধ শব্দটি বিদেশী কী ভাবে হল বোঝা কঠিন ; তবে একটা সঙ্গত আপত্তি যথাযথভাবেই হতে পারে ; কবিতামেলা নাম দিয়ে উদ্যোক্তারা যা করেছেন তাতে আনুষ্ঠানিক দিকটাই প্রধান হয়ে থাকার দরুণ পাঠকের এবং লেখকের মেলার পরিবেশে যে অবাধ মেলামেশা এবং মত বিনিময়ের সুযোগ তা কোথায় ? আশা করি কবিতা-মেলার উদ্যোক্তারা আগামী বারে এসম্বন্ধে অবহিত হবেন ।

আর একজন সমালোচক কবিতামেলা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতার প্রধান ধারাকেই দেশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, নিরালম্ব, একটা উদ্ভট কিছু বলে ধিক্কৃত করেছেন, তার ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তা বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রইল ।

নবেন্দু চক্রবর্তী

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস ২ নং ন্যায়রত্ন লেন,
কলিকাতা ৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।